জনপদবধূ এবং অন্যান্য উপন্যাস

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৭০

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : ইন্দ্রনীল ঘোষ
মুদ্রণ : স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং প্রেস

JANAPADABADHU EBANG ANNYANYA UPANYAS

A collection of novels by Sachindranath Banerjee. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata-700 073

শব্দগ্রন্থন :
পাইকা ফটোসেটার্স, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট, ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০ ০৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

জনপদবধূ

এ যুগের মানুষ আমি, কালও আধুনিক, কিন্তু ও অঞ্চলে সেদিন যখন পা ফেলেছিলাম, মনে হয়েছিল যেন সত্যিই সুপ্রাচীন কোনও জনপদে এসে পড়েছি। এদিককার বাড়িগুলো সাধারণত যেমন হয়, তেমনি নিচু-নিচু আর একতলা, কিন্তু শ্রীর দিক থেকে একটা প্রাচীনত্ব বহন করে চলেছে। সরু সরু থামওয়ালা বারান্দা, জাফরি-কাটা খিলান, মোটা কাঠের দরজায় নানান রকমের ফুল, লতা-পাতা আঁকা। এমন কি, অলিন্দে ভবন-শিখীরও অভাব নেই দেখেছিলাম। পেখম ধরেনি তখন, কিন্তু লম্ববান বিচিত্র পুচ্ছ ধারণ করে মাথার ঝুঁটি দুলিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝরঝর বর্ষণের দিনে মেঘডম্বরুর তালে-তালে ভবন-শিখীকে নাচাবার মতো ঝঙ্কৃত-কঙ্কণ তরুণী পথিক-ললনারও যে অভাব হবে না, জানালার ফাঁকে দুটি-একটি ভাবাকুললোচনার মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম।

বাড়ির দরজায় সিঁদুরে-আঁকা একটি চক্রবন্ধনীর মধ্যে স্বস্তিকা-চিহ্ন মুদ্রিত রয়েছে দেখে আমার সঙ্গী বললে, হ্যাঁ, ঠিকই এসেছি। এই বাড়ি।

বলে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে দরজায় বার-কয়েক ঘা দিল। খুলে গেল দরজা।

ভাগ্য ভাল, লম্বা প্যান্টের ওপরে সাদা-হাফশার্ট-পরা হাই-পাওয়ারের পুরু কাচের চশমা চোখে আমাদের সেই চেনা ছেলেটিই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার সঙ্গীকে বললে, আরে আসুন, আসুন! আপনারা কিন্তু দু'ঘণ্টা লেট। আমরা বসে বসে শেষ পর্যন্ত কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আর কি!

আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে আমার সঙ্গী রসিকতা করে বললে, লেট হই আর যাই হই, শেষ পর্যন্ত এসেছি তো?

হেঁ হেঁ করে হেসে ছেলেটি বললে, তা যা বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে এসেও শেষ পর্যন্ত অনেকে আবার পিছিয়ে যায়।

বছর সাতেক ধরে এসব অঞ্চলে কর্মব্যপদেশে ঘোরাঘুরি করছি, সুতরাং ওদের ভাষা বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছিল না আমার। আমি ততক্ষণে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, যে ঘরখানায় আমরা প্রবেশ করেছি সেই ঘরখানা।

ছোট্ট ঘর। প্রকাণ্ড একটা তক্তপোশ, বলা যায় সারাটা ঘরই জুড়ে রয়েছে সেটা। তক্তপোশের ওপরে সাদা ধবধবে একটা চাদর রয়েছে টান-টান করে পাতা। তার ওপরে এক কোণে একটা কাঠের হাতবাক্স আর জলচৌকি পাশাপাশি সাজানো জলচৌকির ওপরে একটা লাল খেরো-বাঁধানো খাতা, বিচিত্র একটা গোলাকার দোয়াত, আর পাখির পালকের কলম।

ছেলেটি আমাদের তক্তপোশের ওপর বসিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল। ভিতরের দিকে একটিমাত্র দরজা। সেও এমনি মোটা আর কালো কাঠ দিয়ে তৈরি, নানান নকশা-কাটা। নকশার মধ্যে শতদল পদ্মই সাজানো রয়েছে বেশি। দরজার মাথায় ছোট্ট একটা কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি কাঠের মূর্তি—গণেশের। ললাটে কুঙ্কুমের টিপ, দুটি একটি ফুল পড়ে আছে পায়ের কাছে, আর জ্বলছে ক্ষুদ্রাকার শ্বেতপাথরের ধূপদানিতে কয়েকটি ধূপ।

এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম, ভিতরে যাবার দরজাটি ওরা সবসময়ে ভাল করে বন্ধ রাখে। এই যে ছেলেটি ভিতরে গেল, যাবার সময় সন্তর্পণে কপাটটি টেনে ভেজিয়ে দিতে তার ভুল হয়নি। কিন্তু মুহূর্তের সেই ফাঁক দিয়ে কিছু দেখতে না পেলেও শুনতে পেয়েছিলাম একটি সুর। মেয়ে-কণ্ঠেই সুরেলা একটা তান উঠেছে—ভৈরবীর মতোই করুণ আর আবেগবহুল।

আমার সঙ্গীর নাম পান্থলু। মধ্যবয়সী, দোহারা চেহারা, ঘাড়ের কাছটা একটু নুয়ে পড়েছে, দেহের বর্ণ ফরসাই বলা চলে। সুগন্ধি পানের খিলি প্রায় সবসময়ই তার মুখে থাকে, মাঝে মাঝে নির্বাক হয়ে সে ঝিমোনোর মতো ভঙ্গি করে জাবর কাটতে থাকে। এবার সে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু জাবর কাটছিল না, বরং আমার মতোই অবাক হয়ে দেখছিল চারিদিকে তাকিয়ে। ঘরের দেওয়ালগুলোই সব থেকে অদ্ভুত। পুরু পাথরের দেওয়ালের কোনও কোনও জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে কালো পাথরের কয়েকটি দেবমূর্তি, তেল মাখিয়ে উজ্জ্বল করে রাখা। প্রতিটি মূর্তিরই ললাটে কুঙ্কুম, পায়ে দোপাটি ফুলেব পাপড়ি আর শ্বেতপাথরের ধূপদানিতে ধূপ। ফলে, সমস্ত ঘরটি আচ্ছন্ন করে আছে ধূপের গন্ধ। ঘরখানার বাইরের দিকে ছোট্ট একটি জানালা দিয়ে চিকচিক করতে করতে ঘরে এসে ঢুকছে দুটি-একটি চড়াই পাখি, কোনও-কোনও দেবমূর্তির পায়ের কাছে এসে বসেছে, আবার তারপরেই উড়ে যাচ্ছে।

পান্থলু বললে, মনে হচ্ছে বাবু, সত্যি-সত্যিই এক দেবালয়ে এসেছি, না?

বললাম, হ্যাঁ। তাই বটে।

মূর্তি ছিল নটি। সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু আর কেতু—নবগ্রহ।

বললাম, তুমি এখানে আগে কখনও আসোনি?

পান্থলু বললে, এসেছি। সে বেশ কিছুদিন আগে। এ ঘরের সঠিক চেহারাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

তারপরে একটু থেমে অদ্ভুত এক ভয়-ভয়-করা কণ্ঠে বলে উঠল, আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্ছে না। কী বাবু, ফিরে যাবেন?

সংক্ষেপে বললাম, না।

পরমুহূর্তেই ভিতরের দরজা ঠেলে এসে ঢুকল সেই ছেলেটি, তার সঙ্গে একটি লোক। লোকটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আবার শুনলাম সেই অপরূপ সুরবিস্তার, একাকিনী ভৈরবীর সেই সকরুণ মিনতি!

লোকটি মধ্যবয়সী, এবং চেহারা ঈষৎ স্থূল। মাথার চুল বেশ ঘন আর বড় বড় চোখদুটি একটু কোটর-নিবিষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। গায়ে সাদা একটা ধবধবে শার্ট ছিল, কাঁধে তোয়ালে। পরনের ধুতি সাধারণভাবেই পরা। আমাদের নমস্কার জানিয়ে জলচৌকির সামনে এসে বসল।

আজ এর সম্বন্ধে আমার যে ধারণাই হয়ে থাক, সেদিন ওকে দেখে মনে হয়েছিল, ভয়ানক গম্ভীর স্থূলরুচিসম্পন্ন একটি লোক। পরে একদিন হাসতে হাসতে ওকে বলেওছিলাম কথাটা। বলেছিলাম, এই পর্বতপ্রমাণ দেহটির মধ্যে তোমার ওই উজ্জ্বল মণির মতো মনটি লুকিয়ে রেখেছিলে কোথায়?

শুনে মৃদু একটু হেসেছিল, বলেছিল, বাবুজী, আমি সারা হিন্দুস্থান ঘুরে বেড়িয়েছি এক সময়, আমার কী মনে হয় জানো? এত সুন্দর দেশ বোধহয় আর কোথাও নেই।

না, শুধু বাইরের সৌন্দর্যই নয়, আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে যে সুন্দর এক রাজ্য আছে, তা আবিষ্কার করতে পারলে মহান এক ভাবে বিভোর হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সেসব পরের কথা পরে হবে। লোকটি পান্থলুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোক কোথাকার?

পান্থলুকে আগে থাকতে সব শেখানো ছিল, সে আমার পরিচয় না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল, এসব না বললে চলবে না বুঝি?

লোকটি ততক্ষণে তার লাল খেরো-বাঁধানো খাতাখানা খুলে হাতে পাখের কলম তুলে নিয়ে বসে আছে, বললে, কেন চলবে না? কিন্তু বাবুজীকে একবার আমার সামনে আসতে হবে।

নির্দেশমতো ওর সামনে গিয়ে বসলাম। দুই চোখের প্রখর দৃষ্টি মেলে সে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এতে পান্থলু আশ্চর্য বোধ করলেও আমি অবাক হইনি। নানান দেশের নানান ধরনের লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে আমাকে। আমি ওর দৃষ্টি দেখেই বুঝলাম, ও আমার মধ্যে কী দেখতে চায়। আমি ওদের ভাষা ততদিনে খানিকটা শিখে গেছি, মোটামুটি বলতেও পারতাম, বললাম, না, আমার স্বাস্থ্যে কোনও খুঁত নেই।

মৃদু একটু হেসে লোকটি বললে, চোখের কোণ দেখেই আমরা তা বুঝতে পারি বাবুজী। সেটুকু শিক্ষা ভগবানের কৃপায় আমাদের আছে।

তারপরেই হাত বাড়িয়ে বললে, তিরিশটি টাকা লাগবে।

পিছন থেকে হৈ-হৈ করে উঠল পান্থলু, কেন? তিরিশ টাকা কেন? তেমন তো কথা ছিল না। কী হে বিশ্বনাথম?

চোখে-চশমা ছেলেটির নাম বিশ্বনাথম, সে মাথা চুলকে আমতা আমতা করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে লোকটি বললে, পান্থলু, বাবুজীকে দেখেই বুঝেছি উনি বড়ঘরের মানুষ। ওঁকে আমরা বড় আসনেই অভ্যর্থনা করতে চাই।

পান্থলুকে আর কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে লোকটির হাতে আমি গুঁজে দিলাম তিরিশটি টাকা। সে সেটা বাক্সে রেখে তার খেরো-বাঁধানো খাতাটা টেনে নিয়ে কী যেন লিখতে লাগল।

বাইরে থেকে ময়ূরের ক্রেঙ্কার ভেসে এল এই সময়। বারান্দার খোপে-খোপে পায়রাগুলিও বোধহয় ডাকতে লাগল, বকবকম-বকবকম।

পান্থলু বললে, বৃষ্টি এল বলে।

বিশ্বনাথম উত্তর দিল, না। মেঘ করে এসেছে সবে। তবে মেঘ হয়ত উড়ে যাবে না, বর্ষা নামতেও পারে।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই বাইরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল আরেকটি মানুষ, কণ্ঠে গুন গুন করছে একটা গানের কলি, 'গরজে ঘটাঘন, কারে কারে পাবস ঋতু আই, দুলহন মনভায়ে!'

সুর কানে যেতেই মুখ তুলল স্থূলকায় মানুষটি, বললে, আরে এসো, নটরাজন। কবে এলে?

আগন্তুকের বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, গায়ের রং কালো হলেও বেশ

একটা লাবণ্য আছে চেহারায়। চোখ-মুখও বুদ্ধিদীপ্ত। সে তক্তপোশের এককোণে বসে পড়ে বললে, এই তো আজ এলাম।

এদেশীয় লোকের মুখে হিন্দী গানের ভাষা শুনে আমিও একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম লোকটির মুখের দিকে। আমাদের সবার প্রতিই একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল, নিরুৎসুক দুটি বড় বড় আয়ত চক্ষু। বললে, আসছি সেই জয়পুর থেকে। বেশ কাটল কয়েকটা দিন।

স্থূলকায় মানুষটি বললে, উঠেছ কোথায়? সরস্বতী আম্মার ওখানে?

নটরাজন বললে, হ্যাঁ, আমার আর কে আছে বলো?

তারপর চশমা-পরা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললে, কী হে? কেমন আছো তোমরা বিশ্বনাথম? ভামতীর খবর কি?

ছোকরাটি ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখে তর্জনী স্থাপন করে ইঙ্গিতে বোধহয় জানাতে চাইল, চুপ, ওসব কথা এখানে নয়।

স্থূলকায় লোকটি সোজা হয়ে বসেছিল ততক্ষণে, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, আচ্ছা বাবুজী, তাহলে এবার আপনারা আসুন। ঠিক সন্ধ্যার সময় আসবেন।

উঠে দাঁড়ালাম আমরা। পাত্থলু বললে, আমি আসব না সঙ্গে, বাবুজী একাই আসবেন। দেখবেন যেন কোনও অসুবিধা না হয় ওঁর।

হাসল সে, বললে, কিছু ভাববেন না, আপনার বাবুজী জলে পড়বেন না এসে।

কপাট পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে তখনও শুনছি নটরাজনের কণ্ঠস্বর। গুন গুন ছেড়ে এবার সে জোরেই তান ধরেছে, 'গরজে ঘটাঘন—'

যে-বাড়িতে এসে উঠেছিলাম, সেটি ঘনশ্যামদাস বলে এক ব্যবসায়ীর গদির ওপরকার দোতলা। দোতলাবাড়ি এ-অঞ্চলে নেই বললেই চলে, যে দু-তিনটি আছে, তার মধ্যে হলদে, গোলাপী আর সবুজ—পর্যায়ক্রমে এই তিন রঙে রঙ-করা এই বাড়িটি অন্যতম।

যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে এখানে আমি এসেছি, তাদের সঙ্গে ঘনশ্যামদাসজীর ব্যবসায়সূত্রে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্যই আমার পক্ষে এই অভাবিত স্থানলাভ করা সম্ভব হয়েছে, নইলে এ-অঞ্চলে এক দূরবর্তী ডাক-বাংলোটি ছাড়া আর-কোনও বাস করবার উপযুক্ত জায়গা নেই বললেই চলে।

সংকীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বারান্দায় ইজিচেয়ারে ধপ করে এলিয়ে দিলাম নিজেকে। বেশ বেড়ে গেছে বেলা। আমার কাছে কাজের ব্যাপারে লোকজন এইবার আসতে শুরু করল বলে।

আমাদের বাড়িটির সামনেই ছোট্ট একটি ত্রিকোণ পার্ক। নাম দিয়েছে—গান্ধী পার্ক। এক পাশে একটা পেট্রোল-পাম্পের দোকানের সামনে ধূলিধূসরিত সবুজ রঙের একটি বাস অপেক্ষা করছে। যাত্রী ভর্তি হয়ে যাওয়ায় কন্ডাক্টার আর যাত্রী নিচ্ছে না। কিন্তু কতকগুলো লোক বাসে ওঠবার জন্য কলরব করতেও দ্বিধা করছে না। লোকগুলোর মধ্যে কারুর কারুর মাথায় পাগড়ি, আর, সকলের কাঁধেই তোয়ালে।

অদ্ভুত এই জনস্থলীটি। নানা কারণে এর নাম প্রকাশ করা যাবে না। একটি সুবৃহৎ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে এই জনপদ। পার্বত্য ভেষজ, তামাকপাতা এবং আর বহুবিধ দ্রব্যাদির বড় ব্যবসায়কেন্দ্রও একে বলতে পারা

যায়। অথচ, মূল শহরতলি থেকে বহুদূরে এই পল্লী, রেল-লাইন সেই চল্লিশ মাইল বাসের ধূলিধূসরিত পথ পেরিয়ে একেবারে নরশাপুর।

পাছলু ভিতর থেকে ঘুরে এসে বললে, ঘনশ্যামদাসবাবু গদিতে গিয়ে বসেছেন। যাবেন নাকি একবার নিচে?

আমার বাঁদিকে কাঠের পার্টিশন করে বারান্দাটা ভাগ করা, বাড়ির ওই অংশে থাকেন তিনি স্বয়ং। ঘর-সংসার সব ফেলে এসেছেন সেই সুদূর মারোয়াড়ের কোন্ অঞ্চলে কে জানে! দুটি পুত্র, ছোটটি থাকে মায়ের কাছে, বড়টি দিল্লিতে। ঘনশ্যামদাসবাবুর ভাষায়, বড়টি কালেজে পড়ছে, শীগগিরই বি.-এ. পাশ করে বেরবে। বহুৎ এলেমদার নওজোয়ান। তবে এখানে আনছি না, কলকাতায় গদি খুলে তাকে বসাবো। তখন আপনি একটু দেখবেন তাকে বাবুজী। দেখবেন কী যে, আলতু-ফালতু লোক এসে তাকে যেন না ঠকায়। বেশক্ সে-ও পড়িলিখি আদমী, তাকেও ঠকানো মুশকিল হবে।

ঘনশ্যামদাসবাবু এখানেও একটি সংসার করেছেন। সন্তানাদি অবশ্য আসেনি এ-সংসারে, তবে ভদ্রমহিলা যে দক্ষিণী হয়েও নিদারুণ পর্দানসীনা, এটা এ ক'দিনেই বুঝে গেছি।

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাছলুকে বললাম, চলো।

গণেশজীকে প্রণাম করে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে সবেমাত্র গদিতে আসীন হয়েছেন ঘনশ্যামদাসবাবু। আমাকে দেখতে পেয়ে বিশেষভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন বাবুজী, আসুন, বসুন।

নমস্কার জানিয়ে আমি আর পাছলু আসন গ্রহণ করলাম। পাছলু বসল গদিতে, আর আমার পরনে প্যান্ট থাকায়, বসলাম গিয়ে চেয়ারে। ঘনশ্যামদাসবাবুর হাতে কাঁসার ঝকঝকে একটা থালা, তাতে গোটা দুই হাতে-চাপড়ানো প্রকাণ্ড রুটি আর একতাল কিশমিশ দেওয়া হালুয়া। গণেশমূর্তির দিকে থালাটা বাড়িয়ে দিয়ে বারকয়েক আরতির ভঙ্গিতে হাত দুটি আন্দোলিত করলেন। তারপর ডেকে উঠলেন, বাচ্চু! বাচ্চু!

ঘনশ্যামদাসবাবুর প্রাতরাশ সমাপ্ত হয়নি দেখে উঠে যাব কি যাব না একথা ভাবছি, হঠাৎ দেখি ঠুং-ঠুং-ঠুং-ঠুং শব্দ করতে করতে ভিতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল কালোমতন কী একটা জন্তু। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারিনি, পরে ভাল করে তাকিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার বিস্ময় আর সীমারেখা মানল না। গলায় সোনার ছোট ঘণ্টা পরানো প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর। হ্যাঁ, আকারে একটা বেড়ালেরও বড় হবে। ছোট ছোট চারটি পা ফেলে বেজির মতন গোলাপী ঠোঁট মেলে রুটি দুটি একসঙ্গে টেনে নিল মুখের মধ্যে, তারপর আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল অন্তরালে।

পাছলু ঘনশ্যামদাসবাবুরই লোক, এসব দেখতে হয়ত সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই সে ওসব দিকে দৃকপাত না করে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বাজার-দরের পৃষ্ঠাটা খুঁজতে লাগল। আমি সাধারণত এত সকালে কাজে বসি না, তাই দিনকয়েক হল এখানে এসেছি বটে, তবু এসব কিছু আগে লক্ষ্য করতে পারিনি। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বলে উঠলাম, ওটা কী শেঠজী, ইঁদুর?

থালাসুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে শেঠজি বললেন, গণেশজীর বাহন।

পুষেছেন?

আরে রাম-রাম, শেঠজি আবার গণেশজীর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালেন, বললেন,

পুষেছি বলবেন না বাবু, বাচ্চু দয়া করে আমার ঘরে আছে। ও চলে গেলে আমার ব্যবসায়ের পড়তা থাকবে না, লক্ষ্মীমায়ীও থাকবেন না, আমি মরে যাব।

ঠুং ঠুং করতে করতে বাচ্চু আবার ঘরে এল। শেঠজির হাত থেকে হালুয়ার তালটা টুকরো-টুকরো করে ভেঙে খেতে লাগল নির্ভয়ে। আর শেঠজী বার বার অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন এক মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন।

ওর খাওয়া আর শেঠজীর মন্ত্র শেষ হলে বললাম, কোথায় থাকে?

ঠুং ঠুং করতে করতে চলে গেল ইঁদুরটা। সেই দিকে সস্নেহে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর বললেন, থাকে কোথাও বাড়ির আনাচে-কানাচে। ডাকলেই আসে। ওর গলার ঘণ্টি গড়িয়ে দিয়েছি, এবার আমাদের এই কাজটা হাতে এলে বাবুজী, মানত করেছি, ওর কানের মাকড়িভি গড়িয়ে দেব।

যে কাজের এইমাত্র ইঙ্গিত করলেন ঘনশ্যামদাসবাবু, সেই কাজের ব্যাপারেই আমার এখানে আসা। এই জনস্থলীর পাহাড়ের সানুদেশে বেশ কিছু অংশ জুড়ে ম্যাঙ্গানিজ 'ওর'-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এর লীজ নিয়েছেন শেঠজী নিজে, দীর্ঘদিনের মেয়াদী লীজ, আমি এসেছি এই ম্যাঙ্গানিজ-স্তরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে পরীক্ষা করতে। যদি ভাল পারসেন্টেজের 'ওর' পাওয়া যায়, যেটা আশা করছি আমরা পাব, তা হলে শেঠজী আর আমাদের ফার্মের যোগাযোগে একটা লাভজনক ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে।

বললেন, ভাইজাগ থেকে আজকাল বেশি ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি হচ্ছে বাবুজী, আমি দেখে এসেছি। আপনি কি মনে করেন—এ ব্যবসাটা চলবে?

চলবে মানে?

মানে হচ্ছে কী, গভর্নমেন্ট না আবার ঝট করে বন্ধ করে দেয়। আমাদের দেশী গভর্নমেন্টের ব্যাপার তো এখন।

বললাম, উপায় নেই গভর্নমেন্টের। ম্যাঙ্গানিজ বাইরে পাঠাতেই হবে। নইলে ডলার আর্নিং চলবে কী করে?

ডলার আর্নিং ব্যাপারটা কী বাবুজী?

শেঠজিকে সংক্ষেপে বোঝালাম ব্যাপারটা।

ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল কাজের চাপ। স্নানাদি ভোরেই সেরে নিয়েছিলাম, কাজকর্ম সেরে হোটেলে খেতে যেতে হয়ে গেল বেশ দেরি, বেলা দুটো। পান্থলুকে শেঠজি দিয়েছেন আমার দেখাশোনা করতে। সে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেল। তার বাড়ি এখান থেকে বেশ খানিকটা দূর, কী এক নামের অগ্রহারমে যেন। অগ্রহারম বলে ব্রাহ্মণ-পল্লীকে। পান্থলু জাতিতে ব্রাহ্মণ।

হোটেলে আমার খাবার টেবিলের সামনে বসে পান্থলু বলছিল, শেঠজির গদিতে কাজ করি কমিশন হিসাবে, নেহাতই পেটের দায়ে। নইলে বামুন মানুষ, আমারই কি চাকরি করা উচিত?

তুমি তো বেশ লেখাপড়া করেছ ইংরেজি লেখা তো তোমার ভালই দেখলাম।

প্রসন্ন ভঙ্গিতে পান্থলু বললে, তা স্যার, বি.-এ. পর্যন্ত পড়েছিলাম অন্ধ্র য়ুনিভারসিটিতে। পয়সার অভাবে পড়া ছেড়ে চাকরি নিতে হয়েছিল। ঐ বিশাখাপত্তনমেই এক স্টিভেডোরের ফার্মে কাজ নিয়েছিলাম। আমার অফিস-মাস্টারের নাম ছিল

মুখার্জিবাবু। বেশ লোক। আমি বি.-এ. পড়তে পড়তে টাইপ শিখেছিলাম তো! মুখার্জিবাবু আমার ঝড়ের বেগে টাইপ করা দেখে খুব খুশি হতেন। বলতেন, শাবাশ পান্থলু, শাবাশ। কিন্তু স্যার, শেষে ঐ টাইপ করাই আমার কাল হল। শেষ পর্যন্ত চাকরি রাতারাতি ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এলাম।

কেন?

বললে, একটা জাহাজে খাবার-দাবার সাপ্লাই করা হয়েছে। তার বিল টাইপ করে চলেছি। রাইস এক হাজার পাউন্ড, আটা আটশো পাউন্ড, পোট্যাটো দুশো পাউন্ড, কিন্তু তারপরের আইটেমে এসেই টাইপ করা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হল। বললাম, না স্যার, ওটা আমি টাইপ করতে পারব না। আমি হিন্দুর ছেলে, তায় ব্রাহ্মণ।

বলে উঠলাম, কী টাইপ করতে পারলে না পান্থলু? বীফ?

সঙ্গে সঙ্গেই জিভ কেটে কানে আঙুল দিল পান্থলু, বললে, আ ছি-ছি, কথাটা উচ্চারণ করে ফেললেন! দাঁড়ান, হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

ওর অবস্থা লক্ষ্য করে হো হো করে হেসে উঠলাম।

ফেরার পথে পান্থলু এক সময় জিজ্ঞাসা করল, একটা কথা বলব বাবু?

কী?

সন্ধ্যার সময় ওখানে যাবেন?

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরে বললাম, যাবই তো। তোমার কি আপত্তি আছে নাকি পান্থলু?

জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আ, ছি-ছি, তা নয়। গেলে শেঠজি খুশিই হবেন। কিন্তু—

কিন্তু কী?

বললে, যত লোক এ যাবৎ শেঠজীর কাছে এসেছে, তাদের থেকে আপনি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তাই বলেছিলাম, নাই বা গেলেন ওখানে!

একটু হেসে বললাম, শেঠজীর কাছে আর যারা এসেছে, তাদেরও সঙ্গী ছিলে নাকি তুমি পান্থলু?

না বাবুজী—পান্থলু বললে, তারা সন্ধ্যার সময় কী সব যা তা খেত বলে আমি কাছে ঘেঁষতাম না। কী বিশ্রী গন্ধ, যেন ঠেলে বমি আসছে!

হাসি পেল কথাটা শুনে। কিন্তু সে ভাবটা দমন করে প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বলে উঠলাম, আচ্ছা, এই বিশ্বনাথম ছোকরা কি আগেও আসত? এসে ঘুরঘুর করত শেঠজির আশেপাশে?

না। ওকে দেখছি তো হালে। তবে, শেঠজীর অন্দরমহলে ওর আসা-যাওয়া ছিল আগে থাকতেই।

ও!

নিজের পরিচিতি সহজে দেব না বলেই প্যান্ট শার্ট আর টাই পরে গিয়েছিলাম। লোকটির ঘরে সেই নটি মূর্তির পায়ের কাছে জ্বলছে নটি ক্ষুদ্রকায় প্রদীপ, নটি দেবতার গলায় ঝুলছে নটি বেলকুঁড়ির মালা। তেমনি ধূপের গন্ধে সারা ঘর আমোদিত। একটি

কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প শোভা পাচ্ছে জলচৌকির ওপর। সেই স্থূলকায় মানুষটি তন্ত্রসাধকের মতো লাল একটা পট্টবস্ত্র পরে আছে, খালি গায়ে রক্তকরবীর মালা, কপালে কুঙ্কুমের টিপ।

আমি ভেতরে যেতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল সে, বললে, বসুন।

বসলাম। আমার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ভিতরে সেই কাঠের নকশা-কাটা দরজাটা তেমনি বন্ধ করা। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য, এমন একটা থমথমে ভাব আছে যে তার প্রতিক্রিয়া মনের মধ্যে হতে বাধ্য।

বললাম, বাইরের দরজা বন্ধ করলেন কেন?

অল্প একটু হেসে বললে, আপনার সঙ্গে কথা বলব বলে। যারা আসবে তারা বাইরে অপেক্ষা করবে। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হলেই দরজা খুলে দেব। এতে কোনও অসুবিধা নেই। আপনি ছাড়া সবাই পুরানো, সবাই জানে আমাদের নিয়ম-কানুন।

তারপরে একটু থেমে আবার বললে, বাবুজী, আমাদের নিয়ম-কানুন আপনাকেও মানতে হবে। এই ঘরে বসে বলুন, মানবেন?

সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবমূর্তির থেকে রাহু আর কেতুর মূর্তির মধ্যেই যেন একটা তীক্ষ্ণ তিরস্কার লুকিয়ে আছে মনে হল। আমার মতো শক্ত দশ-দেশ-ঘোরা লোকেরও বুকের ভিতর বারকয়েক কেঁপে উঠল। বললাম, কী নিয়ম, বলুন? মানব।

উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল লোকটির মুখ, হাতের কাছের সেই লাল খেরো-বাঁধানো খাতাটা খুলে কী যেন দেখতে লাগল একমনে, দু-একটা পৃষ্ঠাও উলটে গেল, তারপর বললে, বাবুজী, একটা ফুলের নাম করুন।

ফুলের নাম! কেন?

হেসে বললে, আমাদের নিয়ম মানবেন বলেছেন। করুন একটা ফুলের নাম?

গলায় ওর দুলছে রক্তকরবীর মালা, গণেশজীর পায়ের কাছে তখনও শুকিয়ে আছে সকালের সেই দোপাটি ফুল, সেখান থেকে চোখ গেল নবগ্রহের নটি মূর্তির দিকে। নটি বেলকুঁড়ির মালা। তাকালাম ভিতরের সেই পদ্মফুলের-নকশা-কাটা কাঠের দরজাটির দিকে। রক্তকরবী, দোপাটি, বেলকুঁড়ি আর পদ্ম। কিন্তু কী আশ্চর্য ঘটনা, আজও মনে মনে ভেবে অবাক হয়ে যাই, এই চারটে ফুলের নাম করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তা করিনি। কেন করিনি, আর কেন যে বেছে বেছে মনের কোণে চাঁপাফুলের নামটিই ফুটে উঠল, তার সঠিক কারণ আজও আমি নির্ণয় করতে পারিনি।

হ্যাঁ, স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিলাম—চাঁপাফুল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে আমার দিকে তাকিয়ে খেরো-বাঁধানো খাতাটায় কী যেন দেখল লোকটি, তারপর উঠে দাঁড়াল। ভিতরের দরজাটা একটু খুলে কাকে যেন ডাকতে গিয়েও ডাকল না, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল, আসুন বাবুজী, আমার সঙ্গে আসুন।

ব্যাপারটা কী? ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বললে, সেটা পরেই জানতে পারবেন।

দরজা পেরিয়ে যেন এক রহস্যলোকে প্রবেশ করলাম আমরা, চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা, থাম-বসানো, মাঝখানে একটা বাঁধানো উঠোন, চতুষ্কোণ।

বারান্দার দেওয়ালে কিছু দূর অন্তর-অন্তর কেরোসিনের দেয়ালগিরি বসানো। তারই স্বল্পালোকে দুটি একটি হাস্যোজ্জ্বল তরুণী-মুখ চোখে পড়তেই চট করে সরে গেল তারা।

কোনও একটি কক্ষের কপাটের অন্তরাল থেকে ইমনকল্যাণের তানমালা ভেসে আসছে—মেয়েলি গলার সুরেলা তান।

সঙ্গী মানুষটি আমাকে নিয়ে উঠোনে নামলেন। উঠোনের ওপরে বিস্তৃত আকাশের যেটুকু চোখে পড়ে, তাতে দেখলাম, সন্ধ্যাতারা তখনও বিদায় নেয়নি। আধফালি চাঁদ ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল।

উঠোনের একদিকে দুটি প্রোথিত লৌহস্তম্ভের মধ্যে একটি দোলনা খাটানো ছিল, কারা যেন দুলছিলও সেই দোলনায়। আমরা কাছে যেতেই তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল দুটি মেয়ে, পিছন থেকে লোকটি ডেকে উঠল,—চম্পা!

যে মেয়েটি আগে ছুটে গিয়েছিল, বারান্দায় ওঠবার সিঁড়িতে সে থমকে দাঁড়াল। আবছা আলোয় তাকে ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। সঙ্গী দ্রুতপায়ে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কী যেন বলল ফিসফিস করে, সে মাথা হেলিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেল ওখান থেকে।

সঙ্গী আমার কাছে ফিরে এসে আমার হাত ধরে বললে, আসুন।

আমরা সেই বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

দেওয়ালগিরির তেমনি অনুজ্জ্বল আলো শোভা পাচ্ছে ঘরে। একপাশে একটা খাট, অন্যদিকে মেঝের ওপরে একটা লাল পশমের আসন পাতা। একধার থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে সে বলল, আপনি বসুন। ও এখুনি আসছে।

তাকে চলে যেতে দেখে আমি তাড়াতাড়ি কী যেন বলতে গিয়েছিলাম, মুখ ফিরিয়ে হেসে সে বললে, আপনার সব-কিছু প্রশ্নের উত্তর এখুনি পাবেন। আমি যাই, কেমন?

প্রথম দিকে একটু অস্বস্তিকর মনে হতে বাধ্য। একবার মনে হল উঠে যাই, পালাই। তারপরেই মনে হল, না-না, তা কেন? এসেছি যখন, দেখাই যাক না ব্যাপারটা।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে ভাল করে দেখতে লাগলাম ঘরখানা। সব-কিছুই নিপুণ হাতে সাজানো গোছানো। ঝকঝকে তকতকে। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি পাথরের ছোট্ট বিষ্ণুমূর্তি, পিতলের পিলসুজে একটি প্রদীপ জ্বলছে, সেখানে একমুঠো লাল করবী ফুল অঞ্জলির মতো পড়ে আছে মূর্তির পায়ে। আর পুড়ছে ধূপদানিতে ধূপ।

হঠাৎ টের পেলাম, খোলা দরজা দিয়ে, এবং বারান্দায় দিকে যে জানলাটি বিদ্যমান তার ফাঁক দিয়ে, বহু মুখ উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে চায় আমাকে। ফিসফিস করা দুটি-একটি কথা, পায়ের মৃদু ধ্বনি, চুড়ির ঝনৎকার, টুকরো টুকরো চাপা হাসি, বুঝি নতুন কোনও বাসরঘরের বিভ্রম সৃষ্টি করতে চায় ওরা।

আর আশ্চর্য, নববধূর মতোই জড়িত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে ঘরে এসে আবির্ভূতা হল—সে। দুটি মেয়ে তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে এল। হাতে তার একটা ডালা। ডালার নানান দ্রব্যের মধ্যে একটি ছোট্ট মাটির প্রদীপ। মেয়ে দুটি ওকে পৌঁছে দিয়ে আমার দিকে একটু তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে পালিয়ে গেল।

ময়ূরকণ্ঠী রঙের সিল্কের একটা শাড়ি পরনে, অলঙ্কারের মধ্যে নাসিকায় একটি শুভ্র পাথরের ফুল ঝলমল করছে, কর্ণেও ঝলমল করছে দ্যুতিমান দুটি শুভ্র পাথরের দুল। গলায় সরু একটা সোনার হারের উপরে বেলকুঁড়ির মালা, কোমরে আর বাহুতেও বেলকুঁড়ির মালা জড়ানো। হাতে দুগাছি গালা-দিয়ে-তৈরি নকশা-কাটা বালা। কিন্তু সব অলঙ্কার, সব বেশবাস তুচ্ছ হয়ে গেছে তার আপন দেহলাবণ্যের কাছে।

দোদুল্যমান দীর্ঘ বেণীর মূলে ফুলের মালা জড়ানো, জরির কাজ করা ময়ূরকণ্ঠী রঙের চোলির রবিকা বা ব্লাউজের বন্ধনীতে সুশোভিত তার বক্ষসম্পদ। একটু হলদে ধরনের ফরসা ওর দেহের বর্ণ, নাসিকার গঠনও হয়ত খুব তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু কৃষ্ণকলি ফুলের কুঁড়ি সদ্য ফুটলে যেমন দেখতে লাগে, তেমনি স্ফুরিত ওর রক্তিম অধর, আর পরম আশ্চর্য যদি কিছু থাকে তো, সে ওর ঘনপক্ষ্ম টানা-টানা দুটি ভাবময় চোখ।

আমার দিকে ভীরু পাখির মতোই মুহূর্তকাল তাকিয়েছিল সে। তারপরে নিমীলিত চোখে হাতের ডালাটি নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। পায়ের কাছে রাখল সেই ডালা। আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে ডান হাতে তুলে নিল প্রদীপখানি। বাঁ হাত ডান হাতের বাজুতে ছুঁইয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বরণ করতে লাগল আমাকে। প্রথমে প্রদীপ, তারপরে ছোট্ট একটা মাটির ঘট। এর পরে দু-এক বিন্দু জল ছিটিয়ে দিল আমার ওপরে, ছিটিয়ে দিল নিজের ওপরেও।

তারপরে ডালাটি মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াল, হাতের ইশারায় বললে লাল পশমের আসনটিতে বসতে।

নিদারুণ কৌতূহল নিয়েই এতক্ষণ নিশ্চুপে লক্ষ্য করে চলেছিলাম ওর কার্যকলাপ, এবারে আর থাকতে পারলাম না, ভাঙা ভাঙা ওদেরই ভাষায় বলে উঠলাম, যদি না শুনি তোমার কথা?

উল্লাসের দ্যুতিতে ঝলমল করে উঠল দুটি চোখ, বিস্মিত ভঙ্গিমায় একখানা হাত আরক্তিম কপালের ওপর ছুঁইয়ে রেখে বলে উঠল, কী আশ্চর্য! জানেন আপনি আমাদের ভাষা?

কিছু কিছু জানি।

অনেকদিন আছেন বুঝি আমাদের দেশে?

তা আছি।

ভারি কোমল, সরু আর সুরেলা ওর কণ্ঠস্বর, বলার ভঙ্গিও মৃদু, বললে, বসবেন না এসে আসনে?

না।

ধীরে ধীরে একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল, তারপরে প্রায় অস্ফুট স্বরেই বলে উঠল, না বলতে নেই। আমার কথা আজ শুনতে হয়। আমার ঘরে এসেছেন, আমার রাজত্বে এসেছেন, আর আমার-কথা শুনবেন না?

ডালাটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠলাম, কিন্তু এসব কী?

একটু ঝুঁকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসল, বললে, এসব অনুষ্ঠান আমাদের করতে হয়।

কেন?

ধীরে ধীরে তার করপল্লব স্পর্শ করল আমার বাহুমূল, কিন্তু মুহূর্তকাল মাত্র। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বলতে লাগল, মানুষ তো মানুষের অন্তরটা দেখাতে পারে না, তাই কতগুলি প্রতীক দিয়ে তার ভিতরের ভাবটি সে প্রকাশ করে।

মানে!

অল্প একটু হাসল সে, বললে, এই যে ডালার ছোট্ট দীপটি জ্বলছে, যা দিয়ে আপনাকে

আজ বরণ করে নিলাম, যদি বলি, এ আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদীপ-শিখার প্রতীক, তাহলে কি আপনি অবিশ্বাস করবেন?

দূর! উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম, রাখো এসব বানানো কথা, আমি কিন্তু দেরি করতে পারব না, রাত নটার মধ্যেই আমার হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথমটায় অদ্ভুত একটা বেদনার পাণ্ডুর আভা জেগে উঠেছিল তার মুখে, ধীরে ধীরে সেই বেদনার স্পর্শ মুছে গিয়ে ফুটে উঠল প্রচ্ছন্ন কৌতুকের দ্যুতি, হয়ত বা স্নেহেরও। বললে, আমার নাম কী বলুন তো?

বললাম, চম্পা। আচ্ছা, তোমাদের সবারই কি ফুলের নামে নাম?

কৌতুকহাস্যে তখনও ঝলমল করছে ওর মুখ, মাথা নেড়ে নীরবেই জানাল, হ্যাঁ।

এ-রকমটা কী করে হল? সবই পাতানো নাম, না?

হবে।

বললাম, যদি অন্য কোনও ফুলের নাম করতাম তো তোমার কাছে আসা হত না আমার, না?

ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললে, না।

এই নিয়ম কেন?

খুব কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল, আবার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, নিয়মটা ভাল না?

বলে উঠলাম, দূর। বাজে।

উঁহু। বাজে নয়, কাজের।

কী করে? ফুলের নাম নিয়ে তো ভিতরে এলাম, যদি মনে না ধরে, তখন?

তখন? ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি টেনে এনে বললে, টাকা ফেরত নিয়ে চলে যাবেন।

চলে যাব?

হ্যাঁ। বলতে বলতেই খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে, কিন্তু কেউ চলে যায় না।

আবার গিয়ে অন্য ফুলের নাম করে বুঝি?

না। সেটা একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ, মেয়েটি বললে, আসল কথা হচ্ছে কী জানেন? এই বাড়িতে আমরা থাকি নটি মেয়ে, নটি ফুলের নটি নাম, আমাদের দেখে কারুরই অপছন্দ হবার কথা নয়। এ হচ্ছে সবার থেকে সেরা বাড়ি, এর নিয়মকানুনও তাই আলাদা।

তারপরেই মুচকি একটু হেসে বলে উঠল, কেন, অপছন্দ হয়েছে নাকি আমাকে? চোখ দেখে তো তা মনে হয় না।

না না, তা নয়, আমার তোমাকে—

খিলখিল করে হেসে উঠল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, আমার নামটি মনে আছে তো, চম্পা, চাঁপাফুল। একটা হিন্দি কথা শুনুন। 'চম্পামে হৈ তিন গুণ—রূপ, রঙ ঔর বাস।' কেমন, আমার মধ্যে আছে তো?

কী আছে?

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগল রূপ, রঙ ঔর বাস?

মোহাবিষ্টের মতো বলে উঠলাম, আছে।

মগর এক হৈ অবগুণ—কী বলুন তো? কী আছে দোষ চাঁপাফুলের মধ্যে?

জানি না।

বললে, ভ্রমর না আওয়ে পাস। চাঁপার কাছে কখনও ভ্রমর আসে না।

নিশ্চুপে ওব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সেটা লক্ষ্য করে আবার কৌতুকে কেঁপে উঠল দুটি চোখের তারা, বললে, কী, দেখছেন কী? আমি সত্যিকারের চম্পা, না, মিথ্যে চম্পা, তাই?

তারপরই হেসে উঠে বললে, সেসব দেখবেন পরে। আগে আসুন তো?

কোথায়?

হাতটা ধরে বললে, এই আসনে।

নেহাতই একটা কৌতূহল। কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই এগিয়ে গিয়ে বসলাম ওর সেই লাল পশমের আসনটির ওপরে। ও-ও সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে হেঁট হয়ে বসে দুটি হাতে আমার পা থেকে খুলে নিল জুতো, এক পাশে সরিয়ে রেখে বললে, মোজাও খুলতে হবে।

খুলছি।

না না, আপনি নয়, পায়ে হাত দিয়ে বললে, আমাকে খুলতে দিন।

বলেই আমার উত্তরের অপেক্ষা আর না করে ছোট্ট হাফ-মোজায় হাত দিল সে, বলতে লাগল, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা জগৎ আছে, সে জগতের নিময়কানুন অন্তত তাকে মানতে দিন।

তারপরে একটা ভিজে হলদে রঙের গামছা এনে বেশ করে মুছিয়ে দিল আমার পা হাত আর মুখ। গামছাটা শুধু হলদে রঙের নয়, কাঁচা হলুদ বেটে মাখিয়েও রাখা হয়েছিল তাতে। বললাম, এও কি নিয়মের মধ্যে নাকি?

হাসি হাসি মুখেই বললে, হ্যাঁ।

তারপরে একটা ধবধবে সাদা তোয়ালে হাতে এনে দিয়ে বললে, এবার নিজের হাতে মুখটুকু মুছে ফেলুন।

ততক্ষণে ভিতরের জানালা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার কপাট দুটোও টেনে দিয়েছে সে।

আমি উঠে এসে খাটটার ওপরে বালিশ টেনে কাত হয়ে বসে পড়ে বললাম, যাই বলো এসবের কোনও অর্থ হয় না।

কাছে এসে বসেছে ততক্ষণে হাঁটু মুড়ে, বললে, কী সবের অর্থ?

এই সব বরণ-টরণ আর কী!

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, হয় অর্থ। যদি আরও মেশেন আমাদের সঙ্গে, তাহলে নিজেই একদিন বুঝতে পারবেন।

একটু হেসে ওর হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, তুমি বলো না, শুনি।

ও হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দুহাতে ধরল আমার রঙিন টাইটা, বললে, কী বলব। আপনি তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন।

তা হোক, তুমি বলো।

চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললে, আমার আত্মার প্রতীক এই বরণডালার প্রদীপশিখাটি। সে আপনাকে ববণ করে নিল, বললে, হে পথিক, এসো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলাম, দূর! এও অর্থহীন।

সে আমার মন্তব্যে কান না দিয়ে নিজের আবেগেই বলতে লাগল, আর এই যে ঘট দিয়ে বরণ করলাম, ঘট হচ্ছে আধার, দেহলাবণির প্রতীক।

কণ্ঠে বোধহয় একটু শ্লেষই ফুটে উঠল, বললাম, আর এই জল ছিটানো?

বোধহয় বুঝল আমার মনের ভাব, আর বুঝল বলেই একটা বেদনার ম্লানিমা ভেসে গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে। কিন্তু তবু বললে, আমার দেহ-মনের উচ্ছ্বসিত যে প্রীতি, বারিবিন্দু তারই প্রতীক। আমাকে বিশ্বাস করবেন কী করবেন না সে আপনার ওপরে নির্ভর করছে। কিন্তু আমাকে আমার বিশ্বাস থেকে টলাবেন কী করে?

গলার টাইটা খুলে ওর হাতে দিলাম, বললাম, না না, সেকথা বলতে আমি চাই না। আমি শুধু বলতে চাই, ওসব বাহ্যিক অনুষ্ঠান না করেও তা আপন বিশ্বাসকে অটল রাখা যেতে পারে।

পারে না। মেয়েটি উঠে টাইটা আলনায় ঝুলিয়ে রেখে আবার ফিরে এসে কাছ ঘেঁষে বসল তেমনি করে। বললে, ভাবকে প্রকাশ করতে গেলে যেমন ভাষা চাই, অন্তরের স্থির বিশ্বাস বা প্রত্যয়কে প্রকাশ করতে গেলেও তেমনি কতকগুলি বাহ্যিক আচরণ চাই।

কিন্তু নাই বা করলে প্রকাশ? প্রকাশ যে করতেই হবে, এমন কী কথা আছে?

আছে। প্রকাশ না করলে নিজেরই বা বিশ্বাস জন্মাবে কী করে নিজের ওপর? সব থেকে বড় কথা, অভ্যাসেব দাস হলেও যন্ত্র হতে পারিনি, আমরা মানুষই আছি। তাই সবকিছুর জন্যই যেমন একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন, আমাদেরও তেমনি নিজেকে প্রস্তুত করবার একটা অবকাশ দিতে হবে।

পাও নাকি সে অবকাশ?

বোধহয় কোনও অজ্ঞাত ব্যথার তারেই রিন রিন করে বেজে উঠল গিয়ে আমার কথা। মুখ নিচু করে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপরে কেমন যেন কাঁপা বেদনার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, যা পাই সে আর কতটুকু?

চাঁপাকলির মতো আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, থাক এসব কথা।

থাক। বলে আবার তেমনি হাসিহাসি মুখখানা তুলেই তাকাল আমার দিকে।

বললে, এবার আমি যাই?

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললাম, কোথায়?

দুষ্টুমি-ভরা একটা হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ, বললে, যাই। আপনি একটু বিশ্রাম করুন ততক্ষণ। আমি এখুনি ফিরে আসছি, কেমন?

বলেই আর দাঁড়াল না, ছুটে চলে গেল ঘর থেকে।

শুয়ে শুয়ে নিজের কথা ভেবে নিজেই অবাক হচ্ছিলাম মনে মনে। নিরস, নিছক কাজ-পাগল মানুষ আমি একটি। যাকে বলে সোজা কথায়—কাঠখোট্টা। বিবাহিত নই, সংসারীও নই আমি ঠিক, এ ধরনের কোনও অভিজ্ঞতাও ছিল না। পান্থলুর কথায় হঠাৎ রাজী হয়ে খেয়ালের বশে এসেছিলাম। লোভও যে ছিল, একথা অস্বীকার করব না। কিন্তু তা বলে এমনভাবে যে এত সময়ের অর্থহীন অপব্যয় করে যাব, এ আমার নিজেরও ধারণা ছিল না। অথচ, ঠিক এখন, এই মুহূর্তে, চলে যেতেও ইচ্ছে করছে না। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস বইছে শিয়রের জানালাটি দিয়ে, উত্তপ্ত শিরে এসে লাগছে সেই বিহ্বল বাতাস, প্রচুর যেন আরাম ওর মধ্যে, প্রচুর যেন শ্রান্তির অপনোদন।

বোধহয় মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যেই ফিরে এল সে। সঙ্গে ঝিয়ের মতো একটি বুড়ি, তার হাতে একটা ঝকঝকে পিতলের থালা, শালপাতায় ঢাকা। আমার বিমূঢ় বিস্মিত

দৃষ্টির সামনে থালাটা নামিয়ে রাখল সেই লাল পশমের আসনের সামনে। ওর নিজের হাতে ছিল ঝকঝকে একটা জলের গ্লাস। যথাস্থানে সেটি রেখে ঝিটিকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল আবার, বলল, আসুন।

আমি ব্যাপারটা ততক্ষণে বুঝতে পেরে উঠে বসেছি একেবারে, বললাম, এ আবার কী!

সস্মিত মুখে হাতদুটো ঈষৎ আন্দোলিত করতে করতে বলে উঠল, খাবার।

ওর বেশবাসেও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ময়ূরকণ্ঠীটা বদলে লাল একটা সাধারণ শাড়ি পরে এসেছে, বাহু কটিদেশ আর কণ্ঠে ফুলের মালাও নেই, লম্বমান বেণীটা বুকের পাশ দিয়ে সামনে টেনে আনা।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, খাব কী! হোটেলে ফিরে যাব যে!

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে উঠল, না।

না কী!

আমার হাত দুটো ধরে বলতে লাগল, না, খেতে হবে আজ আমার কাছে।

কেন?

কৌতুকে উজ্জ্বল তখনও দুটি চোখের তারা, বললে, নিয়ম।

আর বাক্যব্যয় করে লাভ নেই বুঝে বসলাম গিয়ে খাবারের সামনে। পিতলের থালায় শুভ্র ভাত, আর ছোট ছোট বহু বাটি রয়েছে সাজানো চারপাশে। একটা পাখা হাতে নিয়ে বসল আমার কাছ ঘেঁষে। বললে, খাওয়া কিন্তু একেবারে নিরামিষ। কারণ আমরা আমিষ খাই না।

তারপরই মুচকি একটু হাসল। বললে, তবে মনে হয়, আপনারও নিরামিষে কোনও অসুবিধা হবে না।

তখনও চলছে আমার উত্তরোত্তর অবাক হবার পালা। বললাম, অসুবিধা হবে না মানে! কী করে তুমি জানলে?

মিটিমিটি তখনও হাসছে, বললে, জেনেছি।

কিন্তু কেমন করে? তুমি জানো আমি কোথাকার লোক?

তখনও বিদ্যুতের ঝিলিমিলি ওর চোখে, বললে, ভারতবর্ষের লোক তো বটে!

একটু থেমে তারপর বললাম, তাতে কী বোঝায়?

যেটুকু বোঝায় তাতে অন্তত এটুকু জানি, অসুবিধা হবার কথা নয়।

মনে মনে যে চমৎকৃত হইনি—একথা বলতে পারি না। আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বাস্তবিকই কোনও ঝামেলা নেই, যে কোনও সাধারণ খাদ্যই আমি তৃপ্তির সঙ্গে খাই, আমিষ বা নিরামিষ—কোনও কিছুর প্রতিই বিশেষ কোন আসক্তি নেই। কিন্তু সে সংবাদ জানতে পারল কী করে এই মেয়েটি?

কই! খান।

হ্যাঁ, খাচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমার দিকে যে ওর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তা আমি বুঝতে পারছিলাম।

একসময় বললে, অবাক হচ্ছেন, না?

মুখ তুলে বললাম, হ্যাঁ, তা একটু হচ্ছি।

বললে, আপনার চোখের গভীর দৃষ্টি, মুখের গড়ন, ললাটের উন্নতি, ভ্রূভঙ্গির সরলতা—এসব দেখে অনুমান করা যায়, ভিতরে ভিতরে আপনি কোন্ প্রকৃতির লোক।

ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি টেনে এনে বললাম, শুনি?

মুখখানা তার উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, বললে, আমার মা হলে আরও ভাল বলতে পারত।

তবু শুনিই না তোমার মতামতটা?

এক মুহূর্ত আমার চোখের ওপর তার দৃষ্টি স্থাপিত করে বললে, সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক আপনি।

অন্নের গ্রাসসুদ্ধ হাতটা আমার কেঁপে গেল, ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বলে উঠলাম, মানে?

খাওয়া শেষ করুন। বলছি সব। আর কিছু এনে দেব?

না!

কর্মব্যপদেশে নানান জায়গায় ঘুরেছি, নানান পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু ঠিক এ ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে আমার কখনও হয়নি।

বাথরুমটা ছিল কাছেই, বারান্দার কোণে। ঘুরে আসতে আসতে লক্ষ্য করছিলাম, দু-তিনটে মেয়ে উঠোনটার সেই দোলনার কাছে বসে তখনও গল্প করছে। একটা বন্ধ ঘর থেকে নাচের শব্দ ভেসে আসছে। অন্য কোনও বন্ধ দরজার অন্তরাল থেকে—গান।

ঘরে ফিরে এসে বসতেই দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিল মেয়েটি। ততক্ষণে সেই লাল আসনের সামনের জায়গাটা আগের মতোই আবার পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে সম্ভবত সেই বুড়ি ঝিটি। আলোটা আরও একটু কমিয়ে দিয়ে ও এসে বসল বিছানায়। বললে, গরম হচ্ছে, না?

না। বেশ হাওয়া দিয়েছে তো।

তা বটে। ভিজে-ভিজে হাওয়া। বৃষ্টি নামবে। কিন্তু তা হোক, শার্টটা আপনি খুলে ফেলুন।

একটু হেসে শার্টটা খুলে ওর হাতে দিতেই আলনায় রেখে এল সেটা, আর হাতের ঘড়িটি খুলে রেখে দিল তাকের ওপরে। বললাম, সর্বনাশ, সাড়ে আটটা বেজে গেছে!

বাজুক।

বেশি দেরি করা হবে না, বড় জোর সাড়ে নটা।

মুখ টিপে একটু হেসে চুপ করে রইল, কিছু বললে না।

আমি ততক্ষণে বিছানায় এলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। ও ঠিক আগের মতোই কাছে এসে বসেছে হাঁটু মুড়ে। আমার হাতের ওপর হাতখানা রেখে বলে উঠল, রাত্রে আপনার ফিরে যাওয়া হবে না।

হেসে বললাম, এটাও নিয়ম নাকি?

তেমনি হেসেই বললে, তা বলে সন্ধ্যারাত্রেই যে ফিরে যাবেন, এও নিয়ম নয়।

ওর হাতখানা টেনে নিলাম বুকের ওপর, বললাম, দু-তিনটে মেয়ে দেখলাম এখনও উঠোনে বসে। ওদের কোনও বন্ধু নেই নাকি?

বন্ধু! আমারও কি বন্ধু আছে নাকি?

হাতখানা বুকের ওপর চেপে ধরে বলে উঠলাম, আমি কী?

খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে, ও, তাই বলুন। ওদের বন্ধু হয়ত এখনও আসেনি।

হয়ত আসবেও না কেউ।

না। আসবে নিশ্চয়ই। সকালেই আমাদের সব শুনিয়ে দেওয়া হয় কিনা।

বললাম, একটু রাত হলেও আসা চলে তাহলে?

ওমা, তা কেন চলবে না?

বলে উঠলাম, তবে আমার বেলায় এটা কী হল? আমাকে বলা হয়েছিল কেন, গোধূলি-লগ্নে আসবেন আপনি! ঠিক যেন বিয়ে করতে আসছি।

হেসে উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে, বললে, বিয়ে ছাড়া আর কী! অন্তত আমাদের জীবনে তো বটেই।

বোধহয় মেয়েটি একটু ভাবপ্রবণ, বলতে বলতে হঠাৎই আমার বুকের ওপর রাখল ওর মুখ, অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, আমাদের বাড়িতে প্রথম কিনা আপনি আজ, তাই গোধূলি-লগ্নে আপনার আবাহন।

তাই নিয়ম বুঝি?

মাথা তুলে আমার মুখের কাছে নিয়ে এল মুখ, দু হাতে আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, বিয়েই আমার কাজ।

কৃষ্ণকলির মতো সেই স্ফুরিত অধরের আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। আমার প্রমত্ততায় ও বোধহয় বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল প্রথমে, তারপরে শিথিল হয়ে গেল ওর বাহুলতা, আমার বুকের ওপরে মুখখানা রেখে সেইভাবেই পড়ে রইল বহুক্ষণ। কৌতুকের স্বরেই বলে উঠলাম, কী? বলছিলে না চম্পা, ভ্রমর না আওয়ে পাস? ভ্রমর তো এল।

আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, আমি তো আর সত্যিকারের চম্পা নই, ওরা রেখেছে এই নাম, তার আমি কী করব?

কী নাম তোমার সত্যিকারের?

মুখ তুলে তাকাল, বললে, বলা বারণ।

তবে থাক। আমারও অত শিরঃপীড়া নেই নাম নিয়ে।

আবার দু হাতে আমার কণ্ঠদেশ সেইভাবে আকর্ষণ করে বললে, নেই বুঝি?

না, নেই। তুমি—তুমি। এই-ই যথেষ্ট।

এবার বুঝি প্রমত্ততা জাগল ওর নিজের মধ্যে, প্রথমে মৃদু, তারপরে প্রতিদানের লীলা গভীরভাবেই মুদ্রিত করে দিল আমার অধরপ্রান্তে। অস্ফুট কণ্ঠে বারবার বলতে লাগল, তুমি—তুমি—তুমি।

বাইরে তখন মেঘের গুরুগর্জন শোনা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। কোনও এক ঘর থেকে উদাত্ত পুরুষকণ্ঠের সঙ্গীত আসছে ভেসে, দক্ষিণী গীত নয়, প্রমত্ত মল্লার-রাগের বিস্তার হিন্দি বর্ণ-বিন্যাসকে কেন্দ্র করে—পাবস-ঋতু আঈ দুলহন মনভায়ে।

একবার চকিত হয়ে সেই উদার কণ্ঠস্বর যেন কান পেতে শুনল চম্পা, তারপরে আবার এলিয়ে দিল নিজেকে আমার বাহু-উপাধানে।

ক্রমে ক্রমে সত্যিই নামল একসময় বৃষ্টি, পাহাড়-থেকে-নেমে-আসা নিবিড় মেঘপুঞ্জ আর ঝরঝর বর্ষণ। বললাম, বৃষ্টির ছাট আসছে। ওঠো। জানলা বন্ধ করে দাও।

আবেশজড়িত কণ্ঠে বললে, না।

না কী! দেখছ না মুখে-চোখে লাগছে বৃষ্টির ছাট!

মুখখানা আরও এগিয়ে দিল জানলার দিকে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির কণা জমতে লাগল ওর মুখমণ্ডলে। ওরই শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম ওর মুখ। তারপরে নিজেই উঠে হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলাম আমাদের শিয়রের জানালাটা।

বললাম, ওঠো। ওদিককার জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো। বৃষ্টির জল এসে তোমার ঘরের মেঝে ভাসিয়ে দিল যে!

দিক।

দমকা হাওয়ায় দেবমূর্তির সামনেকার দীপটা যে নিবে গেছে তা জানো?

যাক।

এবার দেওয়ালের আলোটাও বাতাস লেগে নিবু নিবু করছে যে!

করুক।

একমুহূর্ত থেমে তারপরে বললাম, তাহলে আমাকেই উঠতে হল দেখছি।

না না, চম্পা তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা আচ্ছা, আমিই বন্ধ করছি।

বলে উঠতে গিয়েও সম্পূর্ণ উঠে দাঁড়াল না, হাত বাড়িয়ে আমার চোখ দুটো চাপা দিল করপল্লবে। তিরস্কারের সুরে বলে উঠল, দুষ্টু!

তারপরেই জোর করে আমাকে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে বললে, দেওয়ালের দিকে মুখ করে পড়ে থাকো, খবরদার এদিকে ফেরাবে না মুখ।

বলে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সবার আগে নিভিয়ে দিল দেওয়ালের আলোটা। অন্ধকারের অবগাহনে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেও জানালার কাছে গিয়ে যখন বন্ধ করছিল ও জানালার পাল্লা দুটো, তখন সেই জানালা-দিয়ে-ঠিকরে-আসা আবছা আলোর মায়াকে ও অস্বীকার করবে কী করে?

তারপর? বাইরে চলতে লাগল উন্মত্ত ঝঞ্ঝা আর প্রবল বারি-বর্ষণ। তারই শব্দে ডুবে গেল সেই পুরুষকণ্ঠের উদার স্বর, হারিয়ে গেল কোনও নৃত্যরতা রূপসীর নূপুর নিক্কণ। আর হারিয়ে গেলাম আমরা—অন্ধকারের অবগুণ্ঠনতলে দুটি ভীরু প্রাণী।

অনেক—অনেক পরে যখন বৃষ্টির ধারা বাইরে হয়ে গেছে সরল, সেই প্রবল বারিপাতের শব্দও গেছে কমে, ও ধীরে ধীরে উঠে বসল। লক্ষ্য করলাম, বেশবাস বিন্যস্ত করে সেই অন্ধকারেই দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই কয়েকটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম বারান্দায়, কয়েকটি মেয়েকণ্ঠের সঙ্গে মিলিয়ে দুটো একটা পুরুষকণ্ঠও। কয়েকটা নামও যেন কানে এল, একজন যখন আরেকজনকে ডেকে কথা বলছিল সেই অবকাশে। চাপা ঈষৎ একটা উত্তেজনার আভাস প্রত্যেকেরই কণ্ঠে।

একটা নাম পেলাম জয়ালক্ষ্মী, আর-একটা নাম ভামতী, অন্য নাম ভারাহালু। সবই মেয়েলি নাম, এটুকু জানতাম। কিন্তু এসব নাম থাকতে ফুলের নামে নাম রেখেছে কেন এভাবে!

একটু পরেই ও এল ঘরে ফিরে। আস্তে আস্তে বন্ধ করল দরজা। তারপরে কুলুঙ্গির গিয়ে আবার জ্বেলে দিল প্রদীপটা, তারপরে ফিরে এল আমার কাছে। বললে, ঘুম না?

না।

বললে, আমারও না। জানো, আমাদের বাগানের বড় একটা গাছ ঝড়ে পড়ে গেছে। নারায়ণ ছাতামাথায় লোক নিয়ে দেখতে গেল।

নারায়ণ! নারায়ণ কে?

ও একটু অবাক হল, বললে, বারে, আলাপ হল না? কার হাতে টাকা দিলে তবে? ওই তো আমাদের সবার দেখাশোনা করে। আমাদের ভালোমন্দ সবই ওর হাতে।

বললাম, বুঝেছি। ঐ মোটামতন কালো লোকটি তো?

বললে, হ্যাঁ। এ-বাড়ি আর বাগানের প্রতিটি তুচ্ছ জিনিসের ওপরেই ওর সমান মায়া। সবই যে ওর নিজের হাতের। অন্য বাড়িগুলির অনেক-কিছু ও সহ্য করে, কিন্তু এ-বাড়ির একটু এদিক-ওদিক কিছু হলে ও সইবে না।

আরও বাড়ি আছে নাকি?

আছে বই কি! তবে সেগুলো অন্যরকম।

কী রকম?

দুটি চোখ তিরস্কারে হয়ে উঠল গভীর, বললে, হ্যাঁ, এখন আমি ওঁকে সব ব্যাখ্যা কবতে বসি আর কী।

করলেই বা!

দৃষ্টি আরও কঠোর করতে গিয়েও হেসে ফেলল, বললে, অতশত বুঝি না, তবে অন্য বাড়িতে এই ফুলের নামে নাম রাখার ব্যাপার নেই।

বললাম, যাকগে। তুমি ঘুমোবে না?

না, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, এমন বর্ষা নামলে আমার চোখে কিছুতেই ঘুম নামতে চায় না।

তারপবেই মুখখানা আমার মুখেব কাছে এনে বললে, আর জন্মে বোধহয় ময়ূরী ছিলাম।

চুপ করে রইলাম। ঘুম আমারও আসছে না বটে, কিন্তু সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী জুড়ে একটা তন্দ্রার ঘোর যেন অবশ করে রেখেছে আমাকে।

হঠাৎই অদ্ভুত এক দৃষ্টি দেখতে পেলাম ওর চোখে, ভারি স্নিগ্ধ আর কোমল সেই দৃষ্টিভঙ্গি।

বলে উঠলাম, কী দেখছ?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে ও হঠাৎ বলে উঠল, এসব শখ তোমার দুদিনের! আসলে কৌতূহলটাই তোমার কাছে বড়, কী আছে রহস্য, সব ভেদ করব, সব জানব, সব দেখব, তাই না?

একটু হেসেই উঠলাম এবারে, বললাম, আমাকে এরই মধ্যে খুব চিনে ফেলেছ বুঝি?

যদি বলি, হ্যাঁ?

বাজে কথা।

না, দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, সাত্ত্বিকতা তোমার মজ্জায় মজ্জায়। রাজসিক আর তামসিক ভাব যেটা তোমার মধ্যে মাঝে মাঝে আসে, সেটা সাময়িক।

ঈষৎ শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলাম, একথা কজনকে বলছ এভাবে?

যেন মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখ, কিছুক্ষণ একটি কথাও বলতে পারল না।

বাঁকা একটু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

মনের মতন কথা কইতে শেখাটাকে ওরা বোধহয় আর্টের মতো রপ্ত করে নিয়েছে। বৃষ্টি যদি না নামত, তাহলে যত রাত্রিই হয়ে থাকুক, ঠিক বাড়ি ফিরে যেতাম।

কিছুক্ষণ পরে আবার ওর করস্পর্শ অনুভব করলাম আমার কপোলদেশে।

বললে, শোনো!

কী?

এদিকে ফেরো।

ফিরলাম। বললে, তুমি ঠিকই বলেছ, অনেক কিছুই শিখে রাখতে হয় আমাদের। মনোরঞ্জনের সবরকম উপায়ই আমাদের করায়ত্ত থাকা চাই। মনোরঞ্জন তোমার করতে পেরেছি নিশ্চয়ই?

ওর হাতখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, তা পেরেছ। ঘুমোও দেখি।

না।

বলে হঠাৎই দু হাতের মধ্যে টেনে নিল আমার মুখ, বললে, আশ্চর্য দুটি চোখের দৃষ্টি তোমার। পুরুষের দৃষ্টি এ নয়।

হেসে উঠলাম, তবে কি মেয়ের!

হেসো না। সত্যি বলছি, এক এক সময় অদ্ভুত এক ধরনের দৃষ্টি ফুটে ওঠে তোমার চোখে, বা মেয়ের তো নয়ই, পুরুষের স্বাভাবিক দৃষ্টি, যা সচরাচর আমরা দেখি, এ তাও নয়।

আশ্চর্য হয়েই মুখের দিকে তাকালাম ওর, বললাম, কী বলতে চাও কী, তুমি?

স্বপ্নভরা মোহময় যেন ওর কণ্ঠস্বর, যেন নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছে ও, বললে, সাত্ত্বিক ধরনের পুরুষ জীবনে আমার এই প্রথম।

বিরক্ত হয়ে গেলাম এবারে, বললাম, আচ্ছা পাগল তো তুমি? আমি এবার কিন্তু ঘুমোব।

হঠাৎই আবার মুখ নিচু করে কী যেন গভীরভাবে দেখতে লাগল আমার মুখে।

বললাম, আরে, দেখছ কী, অমন করে?

কী অদ্ভুত! হঠাৎই ওর দু চোখের কোণে টলমল করে উঠল দুটি মুক্তোবিন্দুর মতো দুটি ফোঁটা অশ্রু। আঙুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে গিয়েও পারলাম না, আয়ত চোখের কোণের অশ্রুবিন্দুও যে কত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে পারে, এর আগে কখনও তা জানতাম না, অস্ফুটস্বরে বলে উঠলাম, বাঃ!

মুক্তোদুটি ভেঙে দুটি ধারা নেমে এল কজ্জলরেখা ভেদ করে দুটি কোমল কপোলতলে।

ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে, আমার দিকে চাইতে চাইতে কী এক আশ্চর্য অব্যক্ত ভরে গেল মুখ। দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের মতোই হঠাৎ ওর স্ফুরিত উত্তপ্ত অধররেখা স্পর্শ করল আমার ওষ্ঠদেশ।

বললে, আর লুকোতে পারবে না নিজেকে আমার কাছ থেকে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, এ আবার কী কথা!

তেমনি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত কণ্ঠেই বলে উঠল, তুমি কবি—কবি তুমি।

ততক্ষণে উঠে বসেছি বিছানায়। মনে মনে ভাবছি, মেয়েটার মাথারও গোলমাল আছে নাকি একটু?

ও আমার দুটি হাত ধরে বলে উঠল, বলো, ঠিক বলেছি কিনা?

অসীম বিরক্তিতে প্রায় চিৎকারই করে উঠলাম, তা আর বলবে না! অপূর্ব তোমার আবিষ্কার! সারাজীবন ল্যাবরেটরি, ফেরিক অক্সাইড আর কার্বন ডায়ক্সাইড,—এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরলাম! আর—

আমি একটু থেমে যেতেই ও বলে উঠল, ওসব কী ইংরেজি কথা বলে গেলে তুমি!

এবার বিরক্তি পরিণত হয়েছে প্রায় দুর্দান্ত ক্রোধে, সব ভুলে একেবারে খাঁটি মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলায় বলে উঠলাম, তোমার গুষ্টির মাথা! একজন কাটখোট্টা লোক, তামা পিতল লোহা এই সব নিয়ে যার কারবার, তার মধ্যে উনি আবিষ্কার করে ফেললেন একেবারে কবিকে! আমার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কবি নেই, তা জানো?

ও অবাক হয়ে শুনছিল এ অপরূপ ভাষাবিন্যাস, একসময় বলে উঠল, তুমি বাঙালী, না?

সর্বনাশ! থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি ওর ভাষাতেই বলে উঠলাম, দূর! কে বললে তোমাকে?

বললে, একবার মাসখানেক সীমাচলমের মন্দিরে গিয়ে থেকেছিলাম। সেখানে এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। তাঁরা তিনদিন ছিলেন, আমাদেরই বাসার এক দিকের অংশে থাকতেন। বৈষ্ণব। ঠিক তাদেরই মতো ভাষা বললে কিনা তুমি।

বললাম, তুমি বুঝতে পারোনি। আসলে আমি উৎকল দেশের লোক।

যাঃ! অবিশ্বাসীর সুরে বললে, তাদের ভাষা কিছু কিছু জানি। বাজে কথা বোলো না, তুমি নিশ্চয়ই বাঙালী।

কণ্ঠ একটু উচ্চে তুলে বললাম, বাঙালী তো বাঙালী, তাতে হয়েছে কী?

কিছুই হয়নি, কিন্তু তুমি কবি নও?

না।

কী ভেবে যেন আর-কিছু বলল না, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল বিছানার একধারে।

রাত বোধহয় তখন শেষ প্রান্তে, ঘুমটা হঠাৎ গেল ভেঙে। শিয়রের কাছে জানালাটা বুঝি এক সময় খুলে দিয়েছিল। তাকিয়ে দেখি, বৃষ্টি কখন থেমে গেছে, মেঘ কখন কেটে গেছে। আকাশ পরিষ্কার, দিগন্তের তীরে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে একমনে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে খেলা করছে ওর আঁচলপ্রান্ত নিয়ে।

ঘুমিয়ে পড়েছে খাটের একটা ধার ঘেঁষে, কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে দেখি দুটি চোখের কোণ বেয়ে দুটি অশ্রুধারা শুকিয়ে আছে। বড় মায়া লাগল দেখতে দেখতে।

উঠে বসলাম। জানালার কাছে বসে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। শুকতারা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল, একটা অস্ফুট আলোর ছটা বিস্ফুরিত হয়ে গেল পূর্ব দিগন্ত জুড়ে। সেই আলো ক্রমশ ফুটে উঠতে লাগল, থমথমে বৃক্ষশাখায় পাখিদের ঘুম ভাঙল, উড়ে-যাওয়া টিয়া-চন্দনার ঝাঁকই বেশি। কে আমি, কোথায় বসে আছি, সব ভুলে গিয়ে মনটা অদ্ভুত এক আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। এই দেহযন্ত্রটা যেন বীণাযন্ত্র, কোন্ অদৃশ্য বীণকার এসে মুহূর্তে আমাকে বাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ও-ও কখন জেগে উঠেছিল কে জানে! এক সময় কী মনে হতেই চমকে তাকিয়ে দেখি, আমার পাশটিতে বসে বিস্ময়-বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। প্রস্তুত হতে কতক্ষণই বা লাগল। ততক্ষণে ভোরের

আলো ফুটে উঠেছে চারিদিকে। মুখচোখ ধুতে বাইরে যখন এসেছিলাম দেখেছিলাম সব দরজাই বন্ধ, শুধু বাইরে যাবার সেই পদ্মফুল-আঁকা দরজাটা খোলা। দূর থেকেই সেই স্থূলকায় মানুষটিকে দেখা যায়। ধূপ জ্বালিয়ে নটি মূর্তির পায়ে রাখছে নটি ধূপ। টাইটা গলায় লাগিয়ে ওর কাছে এলাম, বললাম, যাই।

তেমনি প্রস্তরমূর্তির মতোই বসে আছে। একবারও ওঠেনি বা আলনা থেকে নিয়ে আমার শার্ট-টাইটাও এগিয়ে দেয়নি। বললাম, এই পাঁচটা টাকা রাখো। তোমাকেই দিলাম।

শুধু অবাক হওয়াই নয়, বড় ব্যথাতুর মনে হল সেই দৃষ্টি। বললে, এ কেন?

রাখো।

কেন?

এমনি। কিছু কিনে নিয়ো আমার নাম করে।

বললে, আর আসবে না, না?

একটু হাসলাম শুধু উত্তরে, কিছু বললাম না, তাড়াতাড়ি চলে এলাম বাইরে।

স্থূলকায় মানুষটির পরনে সেই পট্টবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। এরই মধ্যে তার স্নান সারা হয়ে গেছে মনে হল। সূর্যমূর্তির পায়ে একটি রক্তকরবী ফুল রাখতে রাখতে বলে উঠল, চললেন বাবুজী?

হ্যাঁ।

আজ আসছেন তো রাত্রে?

না।

দ্রুত সরে এলাম, সদর দরজা খুলে পড়লাম গিয়ে একেবারে পথে। একটি জানালা যে খোলা থাকবেই তা আমার জানা। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করাও কর্তব্য মনে করলাম না। করেই বা লাভ হত কী, ম্যাঙ্গানিজ 'ওর' খোঁড়া হয়েছে যেখানে, সেখানে যেতে হবে আমাকে একটু পরেই। প্রচুর কাজ আজ হাতে।

বোধহয় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম দুটো দিন কাজ নিয়ে। হেড অফিসে চিঠি লেখা, ম্যাঙ্গানিজের নতুন স্যাম্পেল নিয়ে পার্সেল করে পাঠানো, ম্যাঙ্গানিজের খনির মধ্যে নেমে নিজের চোখে স্তর পরীক্ষা করা।

পান্থলু বললে, কী ব্যাপার বাবু, আপনি কি এক মাসের কাজ একদিনে শেষ করতে চান?

তা করতে পারলে খুবই খুশি হতাম পান্থলু, কিন্তু পারছি কই?

ঘনশ্যামদাসবাবু হেসে হেসে বললেন, এখানে কি আর মন টিকছে না বাবুজীর?

তা নয়, তবে কাজটাও তো করতে হবে।

জরুর জরুর, ঘনশ্যামদাসজী বললেন, আমি বলছি কী, আপনাকে আরও কিছুদিন আমার কাছে আটকে রাখব। ম্যাঙ্গানিজের দুটো 'কোয়ারি' তো আপনি দেখেছেন আমার। আমি বলি কী, আপনি আরও থোড়া বহুৎ 'প্রস্‌পেক্টিং' করুন। ভাল পারসেন্টের ম্যাঙ্গানিজ যদি পাওয়া যায় তো, বাস, আপনার ওই ভাইজাগ পোর্ট আমাদের।

হেসে বললাম, এ তো মহৎ প্রস্তাব। আপনি আমাদের এজেন্ট, আমাদের হেড অফিসে এই মর্মে একখানা চিঠি দিন, তার কপিটা দিন আমাকে, বাস, প্রস্‌পেক্টিং শুরু করি।

বহুৎ আচ্ছা, ঘনশ্যামদাসজী বললেন, অনেক খাটতে হবে আপনাকে বাবুজী, জঙ্গলে

জঙ্গলে ঘুরতে হবে, পাহাড়ে পাহাড়ে ফিরতে হবে।

তাতে আমার খুবই উৎসাহ। বলুন না, আজই বেরিয়ে পড়ি।

খুশি হয়ে হাসতে লাগলেন ঘনশ্যামদাসজী, বললেন, আপনাকে যতদিন আটকে রাখতে পারি, ততই আমার লাভ বাবুজী। আপনাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেব।

তা নিন।

হাসলেন ঘনশ্যামদাসজী, তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠলেন, বাবুজী, দেবীপল্লী কেমন লাগল?

দেবীপল্লী! মানে?

সে-সন্ধ্যায় যেখানে গিয়েছিলেন ওটাকে আমরা দেবীপল্লী বলি।

হঠাৎই এই বিষয়ের কথা ওঠায় একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, বলাই বাহুল্য। ঘনশ্যামদাসজী কিন্তু রসিক লোক, বললেন, নওজোয়ান আপনারা, তাঁর ওপর বিয়ে-সাদি করেননি, একটু ফুর্তিটুর্তি না করলে চলে! তাছাড়া, এই বন জঙ্গল, পাহাড়-পর্বতে ওটাই হচ্ছে এখানকার একমাত্র রোশনাই।

বললাম, কিন্তু দেবীপল্লী নাম কেন?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন ঘনশ্যামদাসজী, তারপরে গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, ওটাই সেরা বাড়ি। ওখানেই দেবীরা থাকেন।

দেবী কেন?

বললেন, সেই ছেলেবেলায় ওদের দেবতার সঙ্গে বিয়ে হয় কিনা, সেইজন্য দেবী বলে ওদের।

কোনক্রমে উচ্ছ্বসিত হাসিকে রোধ করে সংক্ষেপে বললাম, ও।

তারপরে কয়েকটা দিন ধরে সত্যি-সত্যিই চলল প্রস্‌পেক্টিং। সারাটা দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা, ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়ে খেটে খুটে এসে শুয়ে পড়তাম একেবারে মৃতের মতো। ঘুম আর ঘুম।

এক একদিন মনটা যেন হঠাৎ বিবশ হয়ে যেত। আয়নায় নিজেই নিজের চোখ দেখতাম ভাল করে। আমার চোখে কবির দৃষ্টি? হো-হো করে হেসে উঠতাম আপন মনে। কবি কাকে বলে? দুটি চরণ মিলিয়ে ছন্দ কস্মিনকালেও রচনা করেছি বলে মনে পড়ে না।

প্রস্‌পেক্টিং করতে যেতাম সেই বিরাট হুমড়ি-খাওয়া পাহাড়টা পেরিয়ে। পাহাড়টির সানুদেশে, যেখান থেকে উঠেছে বিশাল অরণ্যানী বুকে করে আর-একটি পাহাড়। এই সানুদেশের শোভা জীবনে কখনও ভুলব না। দু দিকের দুই পর্বতশীর্ষ বেয়ে শুভ্র মেঘপুঞ্জ নেমে আসে, কোথা থেকে যেন স্ফটিকের মতো ধারায় ধারায় নেমে আসে উপলমুখরা ছোট একটি ঝরনা। বিরাটকায় খয়েরি একটা পাথরের ওপরে একা ঝাঁক পরীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্ছ্বসিত কল্লোলে সেই ঝরনার একটি ধারা, দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

কুলিরা এসে ডাকে, বাবু!

পান্থলু আপন উৎসাহেই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, সে বলে, বাবুজী, যাবেন না? এগুবেন না আর?

না। আর-একটু বিশ্রাম করতে দাও ওদের।

ওরা সবাই মিলে জটলা করে একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছের তলায়, আর আমি বসে

থাকি চুপচাপ একটা পাথরের ওপরে ওই অপরূপ ঝরনাটির দিকে তাকিয়ে। এ কী অপূর্ব প্রাণ-কলরোল! বিপুল এক আনন্দের উচ্ছ্বাসে বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, চোখের কোণ ওঠে ভিজে।

কাজের ক্ষতি হয় বইকি। যা আমার জীবনে কখনও হয়নি, তাই হতে থাকে। এক-একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় ওই ঝরনার ধারে বসে।

পান্থলু এসে হয়ত পিছন থেকে ডাকে, বাবুজী, যেখানে শাবল চালাতে বলেছিলেন, সেখানকার কাজ শেষ হয়েছে, এসে দেখবেন কি একটু?

আঃ! বলে উঠি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে, তুমিই দেখে নাও না। আর উঠতে পারি না আমি।

আমার এ অভাবিত বিরক্তিতে অবাক হয়েই পান্থলু চলে যেতে থাকে।

হঠাৎ মনে হয়, আরে, তাই তো। হয়েছে কী আমার!

সঙ্গে সঙ্গেই উঠে হাঁকডাক শুরু করে বলি, পান্থলু, দাঁড়াও। আমি নিজে না দেখলে হবে না।

হয়ত কুলিদের হাত থেকে প্রচণ্ড উৎসাহে নিজেই টেনে নিই শাবলটা, একদমে বেশ খানিকটা খুঁড়ে ফেলে তারপরে শ্রান্তিতে হাঁপাতে থাকি।

ঘনশ্যামদাসবাবুর দুটো 'কোয়ারি'র 'ওর্' থেকে পাঠানো স্যাম্পলের বিবরণ এসেছে। খুবই আশাপ্রদ। অতএব তাঁর খুশির আর সীমা নেই।

রাত্রে হোটেলে আহার্য-গ্রহণের সময় পান্থলু বলে ওঠে, আপনার কী হয়েছে বাবুজী?

কী?

আমাদের মতো নিরামিষাশী হয়ে উঠলেন যে!

মানে?

হাসল পান্থলু, বললে, এই যে হোটেলে খাচ্ছেন, কদিন ধরেই তো দেখছি, মাছ-মাংস একেবারেই অর্ডার দিচ্ছেন না!

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, আরে দূর। দাঁড়াও, আজ একটু মাছ খাব। এই বয়!

কিন্তু বয় এসে জানাল, অর্ডার নেই বলে মাছ তো সে বাবুজীর জন্য রাখেনি, মাংসও না।

মনের মধ্যে কিন্তু একটা খুশির অন্তঃস্রোতই বয়ে গেল, অথচ বাইরে কপট বিরক্তি প্রকাশ করেই চেঁচিয়ে উঠলাম, রাবিশ! কালই ছেড়ে দেব এ হোটেলে খাওয়া।

অথচ রাত্রে একাকী বিছানায় শুয়ে কী এক অব্যক্ত বেদনার আবেগে যেন ছটফট করতে থাকি। নিশুতি রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন চুপিচুপি চোরের মতন উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে আয়নাটা টেনে নিই, আশ্চর্য, কী দৃষ্টি আমার মধ্যে দেখেছিল ওই মেয়েটি?

চিন্তাটা যেন তীরের মতন গেঁথে গেল আমার মনের মধ্যে। টেনেও ফেলতে পারছি না, থেকেও যন্ত্রণার অবধি নেই! আমি কবি! অর্থ কী কবি শব্দের?

হঠাৎ দপ করে আলোর মতো জ্বলে উঠল মনে একটা কথা। যারা চরণ মিলিয়ে ছন্দ রচনা করে, তারাই কি মাত্র কবি? না, অন্য কোনও অর্থ করেছে ওই মেয়েটি কবি শব্দটির?

পরদিন সকালে পান্থলুকে পাঠালাম ডেকে, নিচের ঘর থেকে উপরে। বললাম, আজ ছুটি নিচ্ছি।

বেশ তো। আমি কুলিদের বলে দিই অন্য কাজে যাক ওরা।

যাক।

আবার পান্থলু ফিরে এসে কাছে দাঁড়াতেই বললাম তাকে মনের ইচ্ছাটা খুলে। রীতিমত খুশি দেখাল পান্থলুকে, বললে, এতে এত কিন্তু কেন বাবুজী? আপনি সেই একদিন গিয়ে আর তো—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, ছেড়ে দাও সেসব কথা। আজ হঠাৎ ইচ্ছা হল।

পান্থলু বললে, বেশ তো। আপনাকে যেতে হবে না, আমিই ওখানে গিয়ে সব বলে আসছি।

টাকাটা?

দিন।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরে এল পান্থলু। বললে, সব বন্দোবস্ত করে এলাম বাবুজী।

আচ্ছা।

সন্ধ্যার পরই গিয়েছিলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল, কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই খুলে গেল। নারায়ণ হাসিমুখে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললে, আসুন বাবুজী, অনেকদিন আসেননি, আমি ভাবলাম, চলেই বা গেলেন বুঝি।

না। কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর?

হেসে বললে, ভালই আছি বাবুজী। খবর সব ভাল।

তেমনি নটি মূর্তির পায়ের কাছে নটি ধূপ জ্বলছে, চারিদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে হাসিমুখেই বললাম, আজও কি ফুলের নাম বলতে হবে?

বিনীত ভঙ্গিতে বললে, সেটাই তো নিয়ম।

বললাম, ফুলের নাম যা বলব তা তো আপনার জানাই। চাঁপা ফুল।

ও, আচ্ছা। বলে আমাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠল, চম্পা!

দেখা গেল মেয়েটিকে। বারান্দার একটা থামের কাছে এসে সে দাঁড়িয়েছে, আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে না তাকে ভাল করে। নারায়ণ সেই দিকে নির্দেশ করে বললে, যান বাবুজী! আপনি তো আর নতুন নন।

ঘরটা কি ও বদল করেছে? ঘরে ঢুকে একটু অবাকই হয়ে গেলাম। সেই খাট, সেই রকমই আসন একখানা পাতা। সেই রকমই বিষ্ণুমূর্তি একটি কুলুঙ্গিতে। কিন্তু সব সেই রকম হয়েও যেন ঠিক সেই রকমটি নয়।

আমার দিকে একবারও তাকায়নি চম্পা, আমিও দেখতে পাইনি ওর মুখ, আমার দিকে পিছন ফিরে ঘরখানা দেখিয়ে দিয়েই ও চলে গিয়েছিল। আবার সেই রকম জানালার বাইরে দুটি একটি মুখ, একটু চুড়ির রিনিঝিনি। আবার সেই রকম দুটি মেয়ের ওকে নববধূর মতন দু দিকে ধরে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাওয়া।

মুখ নিচু করে একটি মোড়ার ওপর বসে ছিলাম। সঙ্গের মেয়ে দুটি অপসৃত হতেই মনে হল এইবার বুঝি হবে সেই রকম বরণের পালা।

কিন্তু, তা কিছু হল না, বরণের ডালাও নামিয়ে রাখল না আমার পায়ের কাছে। মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই হতবাক হয়ে গেলাম সুকঠিন বিস্ময়ে।

কোনও ডালা নেই ওর হাতে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমার সামনে নীলাম্বরী একটি

শাড়ি পরে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে চম্পা নয়, অন্য একটি মেয়ে।

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে। মেয়েটির গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুঠাম দেহভঙ্গি, সুশ্রী মুখ, সম্ভবত সুন্দরীর পর্যায়েই ফেলা চলে।

বললাম, তুমি কে? চম্পা কোথায়?

মেয়েটি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, আমিই চম্পা।

না না, তুমি কেন হবে? চম্পা, মানে, সে—মানে—

একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলাম, কজন চম্পা আছে এখানে?

কেন। একজন। আমিই তো।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলাম. না, না, তোমাকে আমি চাই না। আমি চাই—

কথা শেষ না করেই বলে উঠলাম, যাচ্ছি আমি নারায়ণের কাছে।

মেয়েটিকে অবাক করে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। কোনদিকে না তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেলাম নারায়ণের ঘরের দিকে।

আর-কেউ ছিল না অবশ্য ঘরে সৌভাগ্যবশত। সোজা হয়ে সে বসে ছিল চুপচাপ দুটি চোখ বন্ধ করে। ডাকলাম, নারায়ণজী।

উঁ? কে?

আমি।

ও, বাবুজী। আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, কী ব্যাপার?

রুদ্ধনিশ্বাসে বললাম, যাকে খুঁজছিলাম ও তো সে নয়।

আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে খুঁজছিলেন?

বললাম, সেদিনকাব সেই মেয়েটি—চম্পা।

একটু যেন ভেবে কী মনে করতে চেষ্টা করল, বললে, আপনি যেন সেই কবে এসেছিলেন? তারিখটা মনে আছে বাবুজী?

আছে।

বললাম তারিখটা। সেই খেরো-বাঁধানো খাতাখানা খুলে কী যেন দেখতে লাগল সে। একটা পৃষ্ঠা দেখে পাতা উলটে অপর এক পৃষ্ঠায় এল সে, কী দেখে বলে উঠল, বাবুজী, তাকে তো আজ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আমি এসে তো তাকেই খুঁজেছিলাম প্রথমে।

আমার দিকে তাকিয়ে ভারি স্নিগ্ধ ভঙ্গিমায় হাসল লোকটি, বললে, আপনি বসুন বাবুজী।

বসলাম।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, তার নাম তো চম্পা নয়।

সে কী। তবে যে সেদিন—

বাধা দিয়ে বলে উঠল, আপনি এখানকার কিছু শোনেননি দেখছি। ওর নাম আজ হচ্ছে রজনীগন্ধা।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল ওর বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে, তারপরে বলে উঠলাম, ফুলের নামে বুঝি নাম রাখা হয় মেয়েদের?

হ্যাঁ বাবুজী, দেবতা সাক্ষী করে এই নামকরণ।

রোজই রাখা হয়?

হ্যাঁ, রোজই। সে আমাদের একটা প্রক্রিয়া আছে। যে যে ফুল পাওয়া যায় বাগান থেকে, সেই সেই ফুলে নাম রাখা হয় মেয়েদের এবং এ নিয়মটা ওরা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে থাকে।

একটুক্ষণ থেমে তারপর বললাম, ধরুন, আমি এসে এমন ফুলের নাম করলাম, যে নাম সেদিন কোনও মেয়েরই রাখা হয়নি, তখন?

হ্যাঁ, সে বকমটাও ঘটে। তখন আপনাকে বলব আর-একটা ফুলের নাম করতে!

উত্তেজিত ভঙ্গিমায় বলে উঠলাম, কিন্তু কেন এ নিয়ম?

একটু হাসল সে ধীর গলায়, বললে, আমাদের কথা আপনি জানতে চান বাবুজী?

হ্যাঁ, তা চাই।

কী লাভ?

এমনি। কৌতূহল।

বেশ। আপনার কৌতূহল একদিন মিটবেই বাবুজী। তবে কিছু দিন অপেক্ষা করুন।

কেন?

একটু হেসে বললে তেমনি ধীর কণ্ঠে, অধৈর্য হবেন না। ওটা কোনও কাজের কথা নয়।

নিশ্চুপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপরে বললাম, আচ্ছা, সেই মেয়েটির দেখা কি আর পাওয়া যাবে না?

তেমনি টুকরো হাসি ওর মুখে, বললে, সেটা খানিকটা আপনার ভাগ্য, আমরা কিছু বলতে পারব না বা নির্দেশ দিতে পারব না, এই নবগ্রহমূর্তির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পর পর নটি মূর্তির পায়ের কাছেই পড়ে আছে ফুল, পুড়ছে ধূপ। বললাম, আচ্ছা নারায়ণজী?

বলুন?

আমি যদি আজকের চম্পার কাছে না যাই?

একটা কালো ছায়া গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে, যাবেন না?

না।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বললে, তাহলে মেয়েটির একটু ক্ষতি হবে বাবুজী।

ক্ষতি কেন? না না, ও-টাকা আমি ফেরত চাই না।

সে বলে উঠল, না বাবুজী, ধর্মত ও-টাকা তাহলে আমরা নিতে পারি না। বললাম তো আমরা ভয়ানক নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ।

কিন্তু কে করেছে এ নিয়ম?

একটু হেসে বললে, ধরুন আমরা।

তাহলে নিয়মের ব্যতিক্রম করতেই বা দোষ কী?

না, গম্ভীর স্বরে সে বললে, এখানকার সব-কিছুই এই নবগ্রহকে সাক্ষী করে, এর ব্যতিক্রম কিছু করতে কেউ পারবে না।

শুনতে শুনতে হঠাৎই আমার একটি কথা জেগে উঠল মনে। মনে হল, আমাকেই বা এত ভাবালুতায় পেয়ে বসেছে কেন? না হয় আজকের এই চম্পার সঙ্গেই আলাপ করে আসি। কে সেই একদিনের মেয়েটি, যার জন্য এত ব্যাকুলতা! নারায়ণই বা মনে করছে কী!

বললাম, ঠিক আছে। এই চম্পার কাছেই যাব। সত্যি কথা বলতে কী, যে কোনও চম্পাই আমাদের কাছে সমান।

যেন একটা পাষাণের ভার নেমে গেল নারায়ণের বুক থেকে, বলে উঠল, এইবারই ঠিক কথা বলেছেন বাবুজী। এসব জায়গায় একজনের মনের সঙ্গে মন বাঁধলে দুঃখ পেতে হয়। আপনি দেখুন গিয়ে, আমাদের সব মেয়েই সমান। সবাইকে সমান শিক্ষা দিই আমরা। লক্ষণ দেখে, অনেক বেছেই আমরা ওদের রাখি এই বাড়িতে।

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণ। মনে হল, ঠিকই হয়েছে। একটা পরীক্ষা করতে হবে। সেদিনকার চম্পা যা যা করেছিল, এও তাই করবে, হয়ত একই কথার পুনরাবৃত্তি করবে। হয়ত এও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলবে, তুমি কবি। সঙ্গে সঙ্গেই চেনা হয়ে যাবে এই নিপুণিকাদের।

এক পা এগিয়েও ফিরে এলাম, বললাম, আচ্ছা সেদিন সেই মেয়েটি বরণডালা হাতে আমাকে বরণ করেছিল, এ তা করল না কেন?

বলল, এ বাড়িতে সে যে ছিল আপনার প্রথম দিন। প্রথম দিনে প্রথম যে মেয়েটি আপনার কাছে আসবে, সে-ই সবার হয়ে বরণ করে নেবে আপনাকে।

এর অর্থ কি নারায়ণজী?

সব কিছুর অর্থই হচ্ছে এক। কিন্তু সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে আপনার একটু দেরি হবে বাবুজী। আপনাকে অনেক দেখতে হবে, অনেক কিছু বুঝে নিতে হবে।

আর কোনও কথা না বলে সেই পদ্মফুল আঁকা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই লক্ষ্য করলাম অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটি থামের গায়ে হেলান দিয়ে সেই মেয়েটি, সে-ই নতুন চম্পা।

তার কাছে আসতেই চলতে আরম্ভ করল সে।

তার ঘরে এসে প্রথমে বসতে গিয়েছিলাম খাটের ওপর। কিন্তু পরক্ষণে সেই পূর্বেকার আচরণ মনে পড়তেই এগিয়ে গিয়ে বসলাম মেঝেতে, পাতা আসনটিব ওপরে।

সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সব কিছু। বললে, আসনে গিয়ে বসলেন কেন?

বাঃ রে! তোমাদের সেই নিয়ম। আজ অবশ্য মোজা জুতো নেই, তবে সেই হলুদ-বাটা দিয়ে—

কথা শেষ হতে না হতেই খিল খিল করে হেসে উঠল সে, মুখে আঁচল দিয়ে বলে উঠল, পেল্লি?

পেল্লি মানে, বিয়ে। বললাম, বিয়ে! বিয়ে কেন?

বললে, নারায়ণ যে বললে, আপনি নতুন নন। আমাদের হয়ে একজন তো আপনাকে বরণ করে নিয়েছে। তবে আবার কেন? আসুন, খাটের ওপর ওঠে আসুন।

বলে উঠলাম, সর্বনাশ! সেদিন ছিল তবে আমার বিয়ে। খাবার দাবারও আজ হবে না বুঝি?

এবার আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এল কাছে, বললে, খিদে পেয়েছে বুঝি? খাবেন? রান্নাঘরে গিয়ে বলে আসব?

বুঝলাম ব্যাপাবটা। উঠে দাঁড়িয়ে খাটের দিকে যেতে যেতে বললাম, না। হোটেলে গিয়েই খাব। সেদিন সে মেয়েটি খাইয়েছিল কিনা, তাই ভেবেছিলাম, ওটাও নিয়ম বুঝি।

একটু হেসে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এসে বসল মেয়েটি, দুটি চোখ আমার চোখে

স্থাপিত করে বললে, গান শুনবে?

গান? জানো তুমি?

জানি। হিন্দি গানও শিখছি, দুটি-একটি গাইতে পারি। শুনবে?

না। আচ্ছা, নাচতে পারো?

হ্যাঁ। বলতে বলতে সোৎসাহে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, বললে, শুধু একবার নারায়ণকে বলতে হবে। বাজনা চাই তো?

না।

তবে?

বললাম, তুমি বোসো। তোমার সঙ্গে শুধু গল্প করব।

মেয়েটি বুঝি একটু ক্ষুণ্ণ হল, ধীরে ধীরে বসল এসে কাছে। তেমনি হাঁটু মুড়ে, আমার কোলের কাছটিতে।

বললাম, আচ্ছা, তোমরা কি সবাই নাচ গান জানো?

হ্যাঁ।

সেই মেয়েটিও জানত কি?

কোন্ মেয়েটি?

সেই যে আমার প্রথম রাত্রির মেয়েটি?

একটু থেমে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, বললে, কে সে জানি না। তবে জানে সে নিশ্চয়ই।

বললাম, কেমন লাগছে আমাকে?

একটু থেমে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, ভাল।

আমি বালিশে ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছি তখন। খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল মিটিমিটি, তারপর এক সময়ে বললে, জামাটা খুলে রাখবেন না?

রাখছি।

জামাটা খুলে ওর হাতে দিতেই সে আগের চম্পার মতোই জামাটি রেখে এল আলনায়। তারপর আবার আমার কাছে এসে হাতের ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগল, আমাকে কেমন লাগল বললে না তো?

ভাল, খুব ভাল।

বলতে বলতে হাত দুটি ধরে তাকে টেনে নিলাম আরও কাছে, সে কী ভেবে আমার মুখের দিকে তাকাল, বললে, ছাড়ো। আমি এখুনি আসছি।

চলে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে এল শাড়িটা বদলে অন্য একটা সাধারণ শাড়ি পরে। ঠিক সেই আগের চম্পার মতোই। তবে এর মুখে বোধহয় পান। আমার হাতেও একটি পান দিল এনে। বললে, খাও।

তারপরে আবার তেমনি করেই কাছ ঘেঁষে এসে বসল। আমার একখানি হাত কোলের ওপর টেনে নিয়ে বললে, কোন্ দেশের লোক গো তুমি?

নাই বা শুনলে?

মুখ টিপে একটু হাসল, বললে, আচ্ছা।

যতই লাস্যভাব থাক এর মধ্যে, যতই নিপুণা হোক ও কথাবার্তায়, আমার কিন্তু সব মিলিয়ে একটা বিতৃষ্ণাই জাগছে ওর প্রতি। অথচ স্বাস্থ্যসম্পদের দিক থেকে আগেরটির

থেকে এ চম্পাই হয়ত আকর্ষণীয়া বেশি। বলছি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত একটা বেদনার রাগিণী রিন রিন করে বেজে চলেছে অনুক্ষণ।

বললাম, কী দেখছ অমন করে?

ঠোঁটের কোণে চটুল হাসি টেনে এনে বললে, তোমাকে।

বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ ঢিপ ঢিপ করে উঠল এই সময়, বললাম, আচ্ছা চম্পা, বল তো আমার চোখ দুটো কেমন?

ভাল।

কী রকম ভাল?

কী রকম আবার? ভাল!

আমি কী, বল তো? আমি কী রকম লোক? কী প্রকৃতির?

আমার দিকে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে রইল, তারপরে একটু ভেবে বললে, ভাল লোক।

আর কিছু বলতে পারলে না তো?

আর কী বলব? আর কী শুনতে চাও?

বলে উঠলাম, আচ্ছা, আমার চোখ দেখে কী মনে হয়? আমি কি কবি?

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ, বললে তাই নাকি! তুমি কবি?

তুমি বলতে পারলে না তো?

বাঃ রে, আমি কী করে বলব?

উঠে বসেছি ততক্ষণে। বললাম, আমি সত্যিই কবি। ছন্দ মিলিয়ে কাব্য লিখি।

ওসব অঞ্চলে কবির সম্মান বোধহয় বেশি, নইলে 'কবি কথাটা শোনামাত্রই আনন্দে এরকম হাততালি দিয়ে উঠত না অন্য কেউ। বললাম, জামাটা দাও তো?

ও মা, কেন?

কবিদের অত কথা জিজ্ঞাসা করতে নেই।

উঠে গিয়ে জামাটা এনে দিল, ওটা পরে নিয়ে বললাম, লক্ষ্মী মেয়েটি, কবির কোনও কাজে বাধা দিয়ো না, এখন যদি তুমি বাধা দাও, আমি একটি লাইনও লিখতে পারব না।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম।

ও বললে, এ কী, চললে নাকি?

ওর হাত দুটি ধরে বলে উঠলাম, মাথায় কবিতা এসে গেছে একটা, না লিখলে যাবে।

বললে, আমি কাগজ-কলম এনে দিচ্ছি, এখানে বসে লেখো না?

তা কী হয়? বলে উঠলাম, বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার নিজের সেই খাতাটায় লিখতে হবে। নইলে—। সে তুমি বুঝবে না। কবিদের ব্যাপারই আলাদা।

বিস্মিত বিমূঢ় মেয়েটিকে পিছনে ফেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সেদিনও হিন্দি গানের তাল তুলেছে কোনও এক পুরুষকণ্ঠ—পিয়া গয়ো পরদেশ।

আর অন্য ঘরে ধ্বনিত হচ্ছে নূপুরের ঝঙ্কার, ঠিক সেই সেদিনকার মতো।

নারায়ণ বলে উঠল আমাকে দেখে, এরই মধ্যে চললেন বাবুজী?

সেই বিশ্বনাথম ছেলেটি বসে আছে ওর কাছে, দুটি-একটি বই এদিক ওদিক ছড়ানো। একবার তার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলে উঠলাম, হ্যাঁ। আপনি কালকের টাকাটা রাখুন। কালও আসব।

বিনীত ভঙ্গিমাতেই বলে উঠল, আসছেন যখন, কাল রাত্রে ওটা দিলেই হত।

না, নিন। আছে যখন কাছে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাড়িটা পার হয়ে যেতে যেতে আপনিই আজ চোখ পড়ল সেই জানালাটির দিকে। সেই প্রথম দিনকার ঘর। জানালাটি কিন্তু খোলা ছিল না, ছিল বন্ধ করা।

পরদিন ভোরে হেঁটে-হেঁটে একাই গিয়েছিলাম পর্বতের ওপরে। ওদের শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের পাশ দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে ধরে পার হলাম পর্বত, ধীরে ধীরে নেমে গেলাম সেই অপরূপ ঝরনাটির কাছে। বসলাম গিয়ে আমার সেই প্রিয় পাথরটির ওপরে।

বহুক্ষণ কেটে গেল। কত কী এলোমেলো চিন্তার ঝড় উঠতে লাগল মনে। এক সময় উঠে বসলাম, হাঁটতে হাঁটতে গেলাম ঘনশ্যামদাসবাবুর কোয়ারিতে। কিছুক্ষণ কাজকর্ম করে ফিরে এলাম বাড়ি।

হায় রে মিথ্যার তোরণ, আমার জীবনেব একটা কোণেও কাব্য-রচনার ইতিকথা লুকিয়ে নেই।

রাত্রে সকাল-সকাল খাওয়া শেষ করেই গেলাম নারায়ণদের ওখানে। দেখি, সেই বিশ্বনাথম ছেলেটি এসে বসেছে সবে, হাতে তার ইকনমিক্সের বই, বললাম, পড়ো নাকি?

একটু অপ্রতিভ হয়ে হেসে বললে, হ্যাঁ, প্রাইভেটে।

তারপরেই আমাদের কথা বলবার অবকাশ দিয়ে চলে গেল বাইরে। বললাম, বলব ফুলের নাম?

বলুন।

জুঁইফুল।

একটু হেসে বললে, আজ ও-নাম কারুরই রাখা হয়নি।

তাহলে গোলাপ।

তেমনি হেসেই বললেন, অন্য নাম করুন বাবুজী।

বললাম, পদ্ম।

এবারও অন্য নাম করতে হল।

বেলকুঁড়ি।

হয়েছে। আসুন।

গেলাম।

না, সে নয়। এও অন্য এক মেয়ে। যে-দুটি মেয়ে একে ঘরে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল, তাদের মধ্যে একজন কি—সে? একবার যেন মনে হল তার মুখের হাসি দেখে। কিন্তু মুহূর্তের দেখাতেই সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হওয়া গেল না।

মেয়েটিকে যখন এটা-ওটা কথা বলতে দিয়ে ওর হাতটা টেনে আকর্ষণ করলাম নিজের দিকে, তখন সেই আগের দুটির মতোই উঠে দাঁড়াল, বললে, আসছি।

এল আগের মেয়েদের মতো শাড়ি বদলে। তেমনি খাটের ওপর এসে বসা, তেমনি জামা খুলে আলনায় রাখবার অনুরোধ, তেমনি হাতের ওপর হাত রাখা, তেমনি পান খাওয়ানো। দেখলাম মেয়েটিকে ভাল করে। এর কেশরাশি বেণীবদ্ধ নয়, খোলা কোঁকড়ানো চুলের রাশি মেঘের মতো পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। একটু ছিপছিপে গড়নের

মেয়েটি, কিন্তু ধবধবে ফরসা গায়ের রং, বয়স অপেক্ষাকৃত কম, মুখ চোখ বুদ্ধিদীপ্ত, রীতিমত সুন্দরী বলা চলে মেয়েটিকে। এরও দুটি হাত ধরে প্রশ্ন করলাম, আমার চোখ-দুটো দেখতে কেমন?

কেন? ভাল।

আমাকে কি দেখে মনে হয়, আমি কবি?

শোনামাত্র হেসে উঠল খিলখিল করে, বললে, ও বুঝেছি।

কী?

কাল একটি মেয়ের ঘরে আপনি কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন না?

কে বললে তোমাকে?

আমি শুনেছি।

তোমাদের মধ্যে এসব আলোচনা হয়, না?

ও মা, হবে না?

বেশ, এবারে বলো তো, আমাকে কবি বলে মনে হয়?

একটু অবাক হয়েই আমাব দিকে তাকাল, তারপরে বললে, বাঃ রে। দেখে কি তা বলা যায় না কি? আর তাছাড়া, এর মধ্যে মনে হওয়া-হওয়ির কী আছে? আপনি কবি, নিজেই তো বলেছেন।

না। তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলাম, মিথ্যে কথা বলেছি মেয়েটিকে।

অবাক হয়ে বললে, কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

বুঝব না কেন?

সবাই সব কথা বুঝতে পারে না।

বলতে না বলতেই উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, চলি।

সে কী! চললেন কেন?

একটু হেসে বললাম, রাত হয়ে গেল না?

ওমা, তাতে কী? না হয় ভোরেই যাবেন।

না। এই তো অনেকক্ষণ গল্প করলাম।

বললে, শুধু কি গল্প করতেই এসেছিলেন? না হয় গানই শুনে যান।

না।

আমি তখনও দরজার দিকে চলেছি দেখে বলে উঠল, শুনুন।

ফিরে দাঁড়ালাম, কী?

নাচ দেখবেন? নাচতেও পারি।

অল্প একটু হেসে বললাম, না।

মেয়েটি অবাক হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

নারায়ণের ঘরে আসতেই ও যথারীতি বললে, চললেন বাবুজী?

হ্যাঁ। এই নিন টাকা, কালকের।

পিছনের দরজা বন্ধ করে বাইরের পথে নেমে দেখি, আবার বর্ষণের আয়োজন চলেছে দিগন্তে। আবার সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘের আনাগোনা। যেতে যেতে আজও ফিরে তাকালাম সেই জানালার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রক্ত যেন সঞ্চালিত হল হৃদ্‌পিণ্ডে। ভাল

করে লক্ষ্য করে দেখি জানালায় দাঁড়িয়ে একটি ছায়ামূর্তি। ভাল করে দেখা যায় না মুখ অন্ধকারে। কিন্তু আমি কাছাকাছি আসতেই তার একটি বাহু আন্দোলিত হয়ে উঠল। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি ডাকছে আমাকে।

কিন্তু না। কী একটা যেন ছুঁড়ে দিল আমার পায়ের কাছে। পরক্ষণেই জানালা থেকে অদৃশ্য হল ছায়ামূর্তি।

মুখ নিচু করে পায়ের কাছে তাকিয়ে দেখলাম, একটা দোমড়ানো কাগজ। তাড়াতাড়ি সেটা হাতে তুলে নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে এলাম বাড়ি।

আলোর সামনে কাগজটা ভাল করে মেলে পড়ে দেখলাম, খুব তাড়াতাড়িতে জড়ানো অক্ষরে লিখেছে। নিজেদের ভাষায় নয়। হিন্দিতে। তা-ও দেবনাগরী অক্ষরে নয়, রোমান অক্ষরে। জড়ানো জড়ানো আঁকাবাঁকা—ছোট ছেলেমেয়েদের মতো কাঁচা হাতের লেখায়। সবটা ঠিক না বুঝলেও, বারকতক পড়বার পর ভাবটা বুঝলাম। 'শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা বেজে উঠবে, সেই ঘণ্টার শব্দ শোনবার পর মন্দিরের পাশে যে ঝিলটা আছে, সেখানে যেয়ো। আমার সঙ্গে দেখা হবে না, হওয়া উচিত নয়, দেখবে ঝিলের সংলগ্ন যে বাগানটা আছে, তার কোণে আছে বুড়ো একটা বেলগাছ। সেই বেলগাছের পায়ের কাছে থাকবে একরাশ ফুল। সেই ফুল চিনে নিয়ো। তার এদেশী নাম না জানলে কারুর কাছ থেকে জেনে নিয়ো সেই নাম। সন্ধ্যায় সেই নামই হবে আমার। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলো।'

যেন সেতারের তারের মতো বেজে উঠল বুকের ভিতরটা। চিঠিটা পাগলের মতো চেপে ধরলাম ঠোঁটের ওপরে। তারপর, অনেক রাত্রে টুকরো টুকরো করে ফেললাম সেই লিপি। মনে মনে ভাবলাম, এ আবার কী প্রমত্ততায় পেয়ে বসল আমাকে?

সকালে আবার হাঁকডাক করে শুরু করলাম কাজ।

মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা হয় এগারোটায়! আর কী হবে ওই ঘণ্টার শব্দ শুনেই বা! আজ তো যাবই নারায়ণদের ওখানে। নাম করব যে-কোনও একটা ফুলের। যে কোনও মেয়েই হোক না বক্ষলগ্ন, আসে-যাবে না তাতে কিছুই। নিজের মনে মনেই বলতে লাগলাম,

'হাত পেতে নাও সামনে যা পাও
বাকির খাতা থাক বাকি,
লাভ কী শুনে দূরের বীণা
মাঝখানে তার সব ফাঁকি।'

নিজের কানে কথাগুলি যেতেই চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। লোহা-তামার যে ব্যাপারী, তার মুখে আবার কাব্য কেন? আর কারই বা রচনা এই ছন্দোবদ্ধ বাক্যের? নিজের মনকেই যেন উত্তর দিল আমার আর-একটি মন, 'ওমর খৈয়াম'। বুকের পাষাণ ভার যেন নেমে গেল। নিজে যদি কোনক্রমে কিছু রচনা করে ফেলি, তাহলে সত্যি হবে সেই মেয়েটির কথা, কিন্তু মিথ্যা হবে আমার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধ্যানধারণা সব-কিছু। তাহলে নিজেকেই আমি আর ক্ষমা করতে পারব না।

পর্বতের সানুদেশে প্রস্‌পেক্টিং করতে করতে হঠাৎ একসময় কানে এল দূরাগত মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। শোনামাত্র কী হল আমার মধ্যে কে জানে? পাত্থলুকে বললাম, ব্যস, আজ আর নয়, ছুটি।

বলে দ্রুতপায়ে প্রায় ছুটতেই শুরু করলাম মন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করে। ঢং—ঢং—ঢং। বেজে চলেছে ঘণ্টা, আর মনের মধ্যে যেন অশ্রুত এক সঙ্গীত বাজতে লাগল, 'আসি—আসি—আসি'। পথ-বিপথ কিছুই ছিল না লক্ষ্যে, শুধু মনে একটিমাত্র কথা, আমাকে পৌঁছতেই হবে গিয়ে।

ঝিলের কাছে পৌঁছলাম যখন, মনে হল পড়েই বুঝি যাব মাথা ঘুরে। কিন্তু না, দম হারালে চলবে না, কোথায় সে বুড়ো বেলগাছটি?

বেশি খুঁজতে হল না, মন্দিরের চতুঃসীমা-নির্দেশক ভাঙা প্রাচীরের প্রায় গা ঘেঁষেই একটি কোণে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন বেলগাছটি। ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই তখন, শুধু দূরে ঝিলের বাঁধানো ঘাটে দু-তিনটি মেয়ে স্নান করছে।

সত্যিই পড়ে আছে বৃক্ষমূলে একমুঠো ফুল, ডালসুদ্ধ কয়েকগুচ্ছ রক্তকরবী। তুলে নিলাম হাতে কিছু ফুল। বাসায় ফিরে আসছি, আর পথ হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে এগুলো মাত্র ফুল নয়, যেন কার বুক-নিংড়ানো কয়েক ফোঁটা রক্ত।

ঘনশ্যামদাসজী গদিতেই ছিলেন, আমার সাড়া পেয়ে বাইবে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কী বাবুজী, কাম হয়ে গেল?

হ্যাঁ, আজকের মতো শেষ।

বাস, বাস। এবার দুপুরটা লম্বা বিশ্রাম নিন।

দেখা যাক।

ঘনশ্যামদাসজী ততক্ষণে আমার পিছনে পিছনে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হয়েছেন, নিম্নকণ্ঠে বললেন, বাবুজী, বড় বিপদ হয়েছে।

বিপদ!

হ্যাঁ, আমার ছেলে, মানে সেই কালেজে-পড়া নওজোয়ান আর কী, একখানা খত লিখেছে কী, ও এখানে আসবে। কিন্তু কী করে আসবে বলুন তো বাবুজী?

কেন?

বললেন, আমার এখানে যে বউ আছে, ওরা তো তা জানে না।

বেশ তো, না হয় জেনেই গেল, তাতে হয়েছে কী?

না, তাতে কিছু হয়নি। কিন্তু এখানকার কথা তো ওকে জানানো চলবে না বাবুজী।

কেন চলবে না?

ঘনশ্যামদাসবাবু প্রায় ফিসফিস করেই বললেন, আমার এখানকার বউ এদেশী আছে জানেন তো? জওয়ানী ভী আছে। পঢ়িলিখি নওজোয়ান ছেলের সামনে তাকে কী করে বার করি বলুন তো? লজ্জাটা হচ্ছে সেইখানেই!

হেসে বললাম, সত্যি করে বলুন তো, আপনার ভয় হচ্ছে কী নিয়ে?

আরে রাম রাম! ঘনশ্যামদাসবাবু বললেন, ভয়ের কথা হচ্ছে না। কথাটা হচ্ছে মনের শরম নিয়ে। এই কথাই ভাবছি। আচ্ছা, আপনি যান, একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন, আমি ভেবে দেখি, কী করা যায়!

ওপরে উঠে এলাম তাড়াতাড়ি। কতক্ষণে ঘড়ির কাঁটাটা সরে যাবে, কতক্ষণে বিকেল হয়ে আসবে?

পরনে আজ ধুতি-পাঞ্জাবি, সন্ধ্যে হতে না হতেই বেরিয়ে পড়লাম নারায়ণজীর

উদ্দেশে। মনে একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ও আছে, যদি আমার আগে কেউ গিয়ে ভিক্ষা চেয়ে বসে রক্তকরবী ফুল!

নারায়ণজী ফুলের নাম শুনে, খেরো-বাঁধানো খাতাটির সঙ্গে কী যেন মিলিয়ে নিলেন। তারপরে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললেন, যান বাবুজী ভিতরে।

গেলাম। ওর দরজার সামনে বারান্দার যে থামটা, সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল ও। সিল্কের গোলাপি শাড়ি পরেছে, বেণীমূলে রক্তকরবী গাঁথা একটা মালা জড়ানো। আমাকে যেন পথ দেখিয়েই নিয়ে গেল ওর ঘরে। ভিতরে যেতেই কপাট দিল বন্ধ করে, তারপর দুটি চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে কয়েকটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে, তারপরে সেই অস্ফুট বীণা-ঝঙ্কারের মতোই বলে উঠল, সাম্প্রত্যয়াত্মিকা প্রীতি কাকে বলে জানো?

মাথা নেড়ে জানালাম, না।

বললে, এই হচ্ছে সেই লোক যাকে আমি চাই—দেখামাত্রই যখন এই কথা মনে হয়, তখনই তা হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রত্যয়াত্মিকা প্রীতি।

এগিয়ে এসে দুটি হাতে লতার মতো বেষ্টন করে ধরল আমাকে। বললে, ওদের কথা শুনেই বুঝেছিলাম, এ তুমি ছাড়া আর-কেউ নয়। হ্যাঁগো, ওদের বুঝি তোমার ভাল লাগেনি?

কণ্ঠে জোর এনে বললাম, দূর! কে বললে ভাল লাগেনি?

তবে, পালিয়ে যেতে কেন?

কী মুশকিল, পালালাম কোথায়?

পালাওনি? ওদের কাছে সব শুনেছি।

বললাম, তোমাদের জীবনকে জানবার জন্য একটা কৌতূহল। যতটা জেনেছি, তাতেই তৃপ্ত হয়ে চলে গেছি।

মুখ টিপে একটু হেসে বললে, আমাকে খুঁজে বেড়াওনি?

না। কে বললে তোমাকে?

কে আবার বলবে? আমি বলছি। যেভাবে আগ্রহভরে আমার চিঠি কুড়িয়ে নিলে পথ থেকে, তা যে দেখেছে, তার কী বুঝতে কিছু বাকি থাকে! আর ব্যাকুল হয়ে আমার এই জানালাটার দিকে তাকানো?

কে দেখেছে তা?

বললে, এই পোড়া চোখ।

বললাম, এক হিসেবে কথাটা সত্যি, তোমাকে খুঁজছিলাম বটে।

কথাটা শুনে আনন্দের শিহরণ লেগে যেন কেঁপে উঠল ওর সর্বশরীর, বললে, এসো, বসবে এসো স্থির হয়ে।

সেদিনের মতোই জামাটা খুলিয়ে নিয়ে রেখে এল আলনায়। সেদিনের মতোই আমাকে বিছানায় এলিয়ে পড়তে দেখে খুব কাছ ঘেঁষে এসে বসল হাঁটু মুড়ে, বুকে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, আমার জন্য কষ্ট হত?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় বললাম, দূর। কষ্ট আবার কী? তবে, তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল।

কী রকম?

একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপরে গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলাম, আমি কবি নাকি?

দুটি করপল্লবের মধ্যে টেনে নিল আমার মুখখানা, বললে, সন্দেহ আছে নাকি?

বললাম, একটা প্রশ্ন করব। কবি বলতে তুমি কী বোঝো? যিনি ছন্দ মিলিয়ে কাব্য রচনা করেন?

যিনি কাব্য রচনা করেন না, তিনিও কবি হতে পারেন।

যথা?

বললে, অপরূপ এই বিশ্বজগতের ভিতরকার সৌন্দর্য দেখবার মতো যাঁর চোখ আছে—আমার মতে, তিনিই কবি। রচনা করুন আর নাই করুন, মনটা তাঁর কবি-মন।

অত্যন্ত অবাক হয়েই উঠে বসেছি ততক্ষণে, বললাম, অবাক কাণ্ড! এমন করে বোঝবার মতো চোখই বা তুমি কোথায় পেলে, মনই বা তুমি কোথায় পেলে?

সঙ্গে সঙ্গে ওর দুটি চোখ ভরে উঠল জলে, বললে, ওসব জানি না, তুমি শুধু বলো, আমার অনুমান মিথ্যা নয়?

কিন্তু এর উত্তর দেওয়া যে আমার পক্ষে কত কঠিন, তা কি ও জানত? ছোট থেকেই প্রকৃতি আমায় টানে, পশু-পক্ষীর জীবনলীলার বৈচিত্র্য আমার কৌতূহল উদ্রেক করে, ভাব-পাগল বিচিত্র এক ব্যক্তি ছিলাম আমি শৈশবে। এই সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হওয়া, অনুভূতি ও ভাবের ঘোরে বিহ্বল হয়ে যাওয়া—এর জন্য যে কত নির্যাতন সহ্য করেছি অভিভাবকমণ্ডলীর কাছ থেকে, তা বলবার নয়। তাই সে মনকে একদিন টুঁটি টিপে মেরে ফেলে কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিনতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি নিজেকে।

বললাম, আজকের দিনে ভাবুক মন নিয়ে জন্মালে অশেষ দুঃখ আর অবিচার যে শিরোভূষণ হয়ে দাঁড়ায়, তা জানো?

বললে, শুধু আজকের দিনে কেন, চিরদিনই এটা হয়। কোন্ ভাবুক না অত্যাচারিত হয়েছেন, তুমি তা বলো।

বালিশে মাথা হেলিয়ে দিয়ে কাছে টেনে নিলাম ওকে, বললাম, আচ্ছা, এত সব তুমি জানলে কেমন করে?

ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে বললে, শিখে রেখেছি তোমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য, বুঝলে?

বলতে না বলতেই উঠে দাঁড়াল, বললে, আসছি।

সেই ওদের নিয়মবাঁধা রীতি। প্রায় মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল। তেমনি খাবারের থালা আর গেলাস হাতে। বললাম, যতদূর জেনেছি, তাতে বুঝেছি, খাওয়ানোর ব্যাপারটা শুধু প্রথম দিনটির জন্য। তবে আবার এ ব্যবস্থা হল কেন?

বললে, খেয়ে যে আসোনি, এটা বোঝা কি খুবই কঠিন?

না, তা হয়ত কঠিন নয়, কিন্তু হোটেলে গিয়েও খেতে পারতাম তো।

না। এখানে যে একটি শত্রু আছে, সেটি সে হতে দেবে না। নাও, এসো।

আসনে গিয়ে বসতে বসতে বললাম, শত্রুপক্ষীয় এ অত্যাচার অমানুষিকতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না কি?

তা অত্যাচারই যদি বলো, সীমা একটু ছাড়াবে বই কি। এই, দাঁড়াও—

কী?

কাছে এসে বসল মেঝের ওপরে, বললে, একটা সাধ আমার মেটাবে?

কী সাধ?

অদ্ভুত স্নেহমণ্ডিত দুটি চোখের দৃষ্টি। বললে, রাগ করবে না?

না। বলোই না তুমি।

মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি খাইয়ে দেব?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। এ কী অদ্ভুত ওর প্রস্তাব!

ও কিন্তু এগিয়ে এল আরও কাছে, খাবারের থালায় হাত রেখে কেমন যেন এক আবদার ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, কোনও বারণ শুনব না কিন্তু।

বললাম, বারণ করব না একটি শর্তে।

কী?

বললাম, তোমাকেও সঙ্গে খেতে হবে কিন্তু।

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল, বললে, যাঃ!

যাঃ কী!

বললে, বিশ্বাস করো, আমি খেয়ে এসেছি।

বলে, আর আমায় কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে, তাড়াতাড়ি খাবারের গ্রাস হাতে তুলে নিয়ে বলে উঠল, নাও এসো। আর দেরি কোরো না।

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ভরে গেল মন।

খাওয়ার পর্ব চলতে চলতে মনে হল এ মাধুর্যের আস্বাদ এ জীবনে কখনও পেয়েছি কি? আর এত মধুরই বা মনে হচ্ছে কেন এই সামান্য ব্যাপারটা! আমাকে এমনভাবে খাইয়ে ও-ই বা কিসের তৃপ্তি পাচ্ছে?

তৃপ্তি যে পাচ্ছে, সে তো মুখখানা দেখেই বোঝা যায়। যেন ছোট ছেলেকে হাতে করে খাওয়াচ্ছে স্নেহময়ী কেউ।

কিন্তু আমি কি ছোট ছেলে?

নই। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন ছোটই হয়ে গেছি, ফিরে গেছি শৈশবে। মাকে হারিয়েছি ছেলেবেলায়, আবছা মনে পড়ে মায়ের মুখ। মা সেই ছেলেবেলায় ডেকে কাছে বসিয়ে নিজের হাতে করে খাইয়ে দিত। ঠিক এমনটিই ছিল না কি সেই খাওয়ানোর ভঙ্গি?

বললে, ভাবছ কী অত?

না, কিছু না।

তারপরের অধ্যায় এসে শুয়ে শুয়ে বলতে লাগলাম, এত সব খুশি করার মন্ত্র তুমি শিখলে কেমন করে?

কপট গাম্ভীর্যে বললে, ঐ যে বললাম, তোমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য।

বললাম, কই, অন্য মেয়েদের মধ্যে তো ঠিক এমনটি দেখলাম না!

বললে, তা আমার হয়ত শিখে নেবার ক্ষমতাটা বেশি।

তাই কি?

হেসে ফেলল, বললে, এসব জিনিস মেয়েরা আপনা-আপনি শেখে। তবে শেখাই তো সব কিছু নয়, চর্চা করতে হয়। আমার মা কী বলে জানো? মা বলে, স্ত্রী-ভাবের আরাধনা করতে হয়। স্ত্রী হয়ে জন্মালেই হয় না, স্ত্রী-ভাবের পরিস্ফুটনও হওয়া চাই।

কী বোঝো তোমরা স্ত্রী-ভাব বলতে?

এই যাকে বলে—সেবা, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া, উদারতা আর ভালবাসা। মা বলে, এসব গুণের আবার চর্চা করতেও হয়। কিন্তু কাকে আমরা করব সেবা? কে চাইছে আমাদের কাছে সেবা, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া আর উদারতা? অথচ এইসব বৃত্তিকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে স্ত্রী-ভাব। মা বলেন, এই স্ত্রী-ভাবের আবার পরিণতি হচ্ছে আত্ম-বিলোপে।

সে আবার কী?

যা হয়েছিল কৃষ্ণের জন্য গোপিকাদের। পুরুষোত্তম ছাড়া তারা আর কিছু জানত না। তাঁর মধ্যেই বিলীন করে দিয়েছিল তারা আপন গুণ, আপন প্রীতি, আপন লজ্জাও। মনের সে এক অতি উন্নত অবস্থা অবশ্য। কিন্তু যাক এসব কথা।

আমার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ভাল ছিলে এ কদিন?

ছিলাম।

মনে তো হচ্ছে না?

কেন?

চোখের ভাবে অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য। কোথায় গেল সেই প্রশান্তি?

প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপে কেটে যাবার পর বললাম, আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি কেমন ছিলে বলো?

আমাদের আবার থাকাথাকি কী?

আমার বাহু-উপাধানে সেদিনের মতো মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, বললে, দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে-থা করো, বুঝলে?

সেকথার উত্তর না দিয়ে অন্য প্রশ্ন তুললাম, আচ্ছা, তোমরা কী বিবাহিত?

হ্যাঁ। গলায় এই যে মঙ্গলসূত্রম্ রয়েছে!

আচ্ছা, তোমরা কি দেবদাসী? মানে, দেবতার সঙ্গে কি তোমাদের বিয়ে হয়েছে?

উত্তরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, দেবদাসী-প্রথা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু আমরা আছি। সংস্কার কি মানুষের মন থেকে সহজে যায়? শ্রীকৃষ্ণের ওই বড় মন্দিরের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আমরা ছেড়েছি, তবে নিজেদের মন্দির গড়ে নিয়েছি আমরা, যা শুধুমাত্র আমাদেরই।

কোথায় সেটা?

আমাদের বাগানে। পুরুষোত্তমের মন্দির। তিনিই আমাদের স্বামী। নানান লক্ষণ দেখে আমাদের নিয়ে আসা হয় নানান গাঁ থেকে বেছে বেছে। অর্থের বিনিময়ে গরীব বাবা-মা রাজীও হয়। অনেক সময় মানত করেও দেবতার সঙ্গে দেওয়া হয় বিয়ে। অবশ্য এসব আজকাল হয় খুব গোপনে, লুকিয়ে-চুরিয়ে। তাহলে দেখতে পাচ্ছ, আমরা দেবদাসী বটে, আবার না-ও বটে। আমরা 'দেববধূ' বলতে পারো।

কিন্তু এ তোমাদের কী জীবন?

সেটা ভাগ্য।

বললাম, আচ্ছা, বিয়ে করে সংসারী হতে সাধ যায় না?

একটু হেসে বললে, ক'বার বিয়ে করব? এই যা নিয়ে আছি, এ-ও কি বিরাট সংসার নয়?

আর একটা কথা বলব?

বলো?

কেমন করে সহ্য করো এত লোককে?

মানে? আমার প্রশ্নের তাৎপর্য ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করল, কিছুক্ষণ থেমে থেকে কী যেন ভাবল, তারপর মৃদু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললে, যদি বলি ভুল কথা বলছ।

ভুল?

হ্যাঁ। এত লোক কোথায় দেখছ? যদি বলি, একই লোক এক এক রাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে আমাদের কাছে আসে?

একটু অবাক হয়েই বললাম, এই তোমাদের বিশ্বাস নাকি?

হ্যাঁ। বিশ্বাসও বটে, শিক্ষাও বটে।

মানো?

মানতে পারলে জীবনের পথে সহজ হওয়া যায়। না মানলেই দুঃখ। তা অনর্থক দুঃখ সইতে যাই কেন?

চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। ও ধীরে ধীরে 'লতাবেষ্টিতক' ভঙ্গিতে আমাকে এক সময় টেনে নিল নিজের কাছে, মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর ফিসফিস করে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, যতদিন যাবে, জগৎ এক নতুন দৃষ্টিতে ধরা দেবে তোমার কাছে।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ও এক আশ্চর্য কণ্ঠে বলে চলেছে, তোমার তখন কি মনে হবে জানো? মনে হবে, এ জগতের সব মানুষই ভাল, সব মানুষই পবিত্র। স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই, একই আত্মা পুরুষ আর স্ত্রী-শরীর ধারণ করে পুরুষ ও স্ত্রী-ভাবে বিভোর হয়ে আছে। কবির দৃষ্টি বলে একেই, একেই বলে দিব্যদৃষ্টি।

বাধা দিইনি, চুপচাপ ওরই চিন্তাধারাকে মনে মনে অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলাম। ওদের ভাষাতেই ও কথা বলছিল, আর সে ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারই ছিল বেশি। বরাবরই দেখেছি, ওর বলার ভঙ্গিতে ভাষার একটা সৌষ্ঠব প্রকাশ পেত। এইসব 'আত্মা', 'পুরুষ', 'দিব্যদৃষ্টি' ইত্যাদি ওরই ব্যবহৃত শব্দসম্ভার।

বললে, কী, কথা কইছ না যে?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, বলবে একটা সত্যি কথা?

কী?

তোমার আসল নামটা কী?

বললে, বলা পাপ। তবু তোমাকে বলব। তোমার জন্য সমস্ত পুণ্যই জলাঞ্জলি দিয়েছি।

সেদিন মনে হয়েছিল, এটা বুঝি কথার কথা। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, একথার গুরুত্ব ওর কাছে কতখানি হতে পারে।

বললে, আমার আসল নাম ভামতী।

ভামতী? নামটা যেন ইতিমধ্যে কোথায় শুনেছি শুনেছি বলে মনে হচ্ছে!

ভাবতে ভাবতে মনে হল, প্রথম দিনই কানে গিয়েছিল এই নাম। সেই নটরাজন লোকটি ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করেছিল, কেমন আছে ভামতী?

নারায়ণরা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, চুপ চুপ।

বলে উঠলাম, নটরাজন বলে কাউকে চেনো?

মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, বললে, বা রে, ও যে আমাদের গান শেখায়, নাচ

শেখায়। মাঝখানে কিছুদিন ছিল না, আবার এসেছে।

গুরু বুঝি নাচের?

তা বলতে পারো, তবে গুরু বলে মানি না ওকে।

কেন?

এমনি।

কথা বলতে বলতে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসে।

একসময় বলে উঠি, কাল কী করব? আসব কী করে এঘরে?

যেমন করে আজ এসেছ।

উৎসাহিত হয়ে বলে ফেললাম, আবার সেই বৃদ্ধ বেলগাছের পায়ে বসে সাধনা?

ঠিক তাই।

বেশ, তাই হবে।

পরদিন বৃদ্ধ বৃক্ষের পায়ে পেলাম একটি পদ্মফুল। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে পদ্মর নাম করতেই ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল নারায়ণের। কিন্তু মুহূর্তমাত্র, তারপরেই তেমনি স্মিতহাস্যে ভরে গেল তার মুখ, বললে, যান বাবুজী। ভিতরে গেলেই পদ্ম খুঁজে পাবেন।

বিপুল কেশরাশি আজ বেণীর শাসন থেকে মুক্ত করে এল খাওয়া-দাওয়ার পর। বললে, খুব কাছে এসো, ভাল করে মুখখানা দেখে রাখি।

কেন?

কেমন যেন কান্নাভরা কণ্ঠস্বরে বললে, ভয় হয়, তোমাকে হারিয়ে ফেলব।

বলতে বলতে দু চোখ ভরে এল জলে, বললে, আমার শাস্তি নেমে আসছে। আমি যে পাপ করেছি!

কী পাপ?

বললে, তোমাকে যে গোপনে জানিয়ে দিয়েছি ফুলের নাম।

দিয়েছ তো হয়েছে কী তাতে?

না গো, নবগ্রহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা, এর ফল ভাল হবে না।

অবিশ্বাসীর সুরে বলে উঠলাম, হ্যাঁ, হবে না ওঁকে বলেছে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

বললাম, এই দেখ, এ কী করছ ভামতী?

শিউরে উঠে বললে, নামটাও বলে দিয়েছি তোমাকে।

কেঁদো না, কাঁদে না, ছিঃ!

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ভারী গলায় ডেকে উঠল, কবি!

ওর ডাকে বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুমরে উঠল, গাঢ়কণ্ঠে বললাম, কবি শব্দটার অর্থ তো তুমিই বুঝিয়ে দিয়েছ, যদি পারি তো সত্যি সত্যিই তোমার 'কবি' হয়ে উঠব।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখের জ্যোতি, বললে, একটা জিনিস তোমায় দিতে চাই, নেবে?

কী?

উঠে বাক্স খুলে কী একটা নিয়ে এল যেন। কাছে আসতেই বুঝলাম একটা আংটি। সেটি নিজের হাতে আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললে, পোখরাজমণি, কখনও খুলো না যেন। সব সময়ে পরে থেকো।

কী হয় পরলে?

একটু হাসল, স্নেহস্নিগ্ধ অপূর্ব সে হাসি, বললে, কী আবার হয়? আমায় মনে পড়বে।

ওকে দুহাতে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে, বললাম, যাবে কোথায় তুমি?

কোথাও না। এখানেই।

তবে? হারাবই বা কেন তোমাকে?

বললে, পাগলামি কোরো না। তুমি চলে যাও।

একটু থেমে, ওর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়মথিত কণ্ঠে বলে উঠলাম, চলে যাব!

আবার কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর, বললে, না, আর তুমি এসো না এখানে।

আসব না! কেন?

জলভরা চোখদুটি মেলে আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিষ্পলক, তারপরে বললে, এমন করে মায়ায় জড়িয়ো না তুমি।

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললাম, মায়ায় কী সত্যিই জড়িয়েছি?

জড়াওনি!

কে জানে!

বললে, আমি জানি। আমি সব বুঝতে পেরেছি তোমার। তুমি নিজেকে যতটা বুঝেছ, তার থেকেও বেশি বুঝেছি আমি তোমাকে। তুমি মুক্তপুরুষ হও।

আর তুমি?

আমি? হু হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল আবার, বললে, তুমি তো জানো, আমি কী! তুমি চলে যাবে, আবার অন্যদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলব, হয়ত গানও গাইব, নাচবও।

অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে উঠলাম, তুমি নাচতে পারো, না?

হ্যাঁ, শেখায় যে নটরাজন আমাদের। চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিতে নিতে বললে, জানো, কেউ এলে নাচ দেখানোটা আমি পছন্দ করি।

বললাম, আমাকে তো দেখালে না একদিনও।

বড় ম্লান, বড় অদ্ভুত সে হাসি। বললে, না। তোমাকে দেখিয়ে সময় নষ্ট করব কেন?

সময় নষ্ট কেন?

কান্না আর হাসি যেন দুই-ই মিশিয়ে আছে! বললে, নাচের শেষে পথিক যে ফিরে যাবে, সারারাত আর বিরক্ত করবে না।

একটু অবাক হয়েই বললাম, তাই নিয়ম বুঝি!

হ্যাঁ। শাস্ত্রকার বলেছেন জানো না? নৃত্যশ্রমক্লান্তা স্ত্রী-শরীরকে আর ছুঁতে নেই।

তাই নাকি!

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে লঘুকণ্ঠে বলে উঠলাম, কিন্তু বাক্যশ্রমক্লান্তাকে নিয়ে এখন আমি কী করি?

ছুঁয়ো না।

ভোরের দিকে চলে যাবার সময় বললাম, কাল কী করব?

এসো না। কাল আমার ছুটি। বিরাম।

তা-ও পাও বুঝি?

একটু হেসে বললে, তা পাই বই কি।

বললাম, বেশ। পরশু?

পরশু? একটু ভেবে বললে, আবার সেই বৃদ্ধ বৃক্ষের পদসেবা কোরো।

সুফল মিললে তাতে আর দ্বিধা কী?

হেসে উঠল, বললে, সুফল মিলবে গো মিলবে।

নারায়ণ ততক্ষণে দেববিগ্রহগুলির পায়ের কাছে ধূপবর্তিকা জ্বালিয়ে দিয়ে আসনে বসেছে, সেই বিশ্বনাথম ছেলেটির বই ইতস্তত ছড়ানো, হয়ত বাইরে গেছে, এখুনি ফিরে আসবে।

যথারীতি বললে, চললেন বাবুজী?

হ্যাঁ। বইগুলো কিসের? বিশ্বনাথমের বুঝি?

আসন ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল নারায়ণ, বললে, হ্যাঁ। ছেলেটি আমাদের এজেন্টের কাজ করে তো। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রাইভেটে কলেজের পড়াও তৈরি করছে।

সেই পুরু-কাচের-চশমা-চোখে পাজামাব ওপরে হাতগোটানো শার্ট পরা রোগা কালো ছেলেটির মুখ মনে পড়ল একবাব। নারায়ণ বললে, বাবুজী, কেমন লাগল আমাদের?

খুব ভাল।

না বাবুজী, সে বললে, ভাল থাকা আর গেল না। সব বুঝি ভেঙে-চুরে যাবে।

কেন?

বসুন না বাবুজী, সব বলছি আপনাকে। চা খাবেন? দাঁড়ান, চা আনিয়ে দিচ্ছি।

বসে পড়ে বললাম, ব্যস্ত হবেন না।

নারায়ণ বললে, ঘনশ্যামদাসজীর ছেলে আসছে, তাই তাঁর স্ত্রীকে তিনি কিছুদিন এখানে রাখতে চান। কিন্তু আমরা কী করে রাখি বলুন তো?

তা তো বটেই। আর তাছাড়া, আপনাদের এখানে রাখার উদ্দেশ্য কী?

নারায়ণ বললে, উদ্দেশ্য একটা আছে। স্ত্রীকে উনি বোধহয় ত্যাগই করতে চান।

সে কী!

হ্যাঁ, বাবুজী। ওঁর এই স্ত্রী ছিল যে এখানকারই মেয়ে।

বলেন কী?

ম্লান একটু হাসল নারায়ণ, বললে, ঘমশ্যামদাসজী ছিলেন আপনারই মতো এক আগন্তুক, আপনারই মতো রোজ আসতেন, ফুলের নাম বলতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটি মেয়ের মায়ায় এমন করে জড়িয়ে পড়লেন যে বলবার নয়। আমাদের সাবধানতা সত্ত্বেও ফুলের নাম গোপনে জানাজানি হতে লাগল, ঘনশ্যামদাসজী ক্রমাগত বাঁধনে জড়াতে লাগলেন। আব তার পরিণতি কী জানেন? জোর করে টেনে গিয়ে নিয়ে কাছে রাখা। অর্থাৎ একরকম বিবাহই বলতে পারেন।

বললাম, এরকমটা হতে পারে তাহলে?

তেমনি ম্লান হাসিই ওর মুখে, বললে, হ্যাঁ, তা হয়ে গেল। সরোজাকে ধরে রাখা গেল না।

সরোজা?

ঘনশ্যামদাসজীর স্ত্রীর নাম।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললাম, আপনারা নিশ্চয়ই বাধা দিয়েছিলেন এতে?

কাকে বাধা দেব? নারায়ণ বললে, এই যে ঘরবাড়ি, এই যে জমি আর বাগান, এ সবই

তো ঘনশ্যামদাসজীর। তাঁরই টাকায় চলছে এ প্রতিষ্ঠান।

সে কী!

হ্যাঁ, বাবুজী।

বললাম, কিন্তু কেমন করে হল এটা?

টাকায় কী না হয় বাবুজী! নারায়ণ বললে, কিন্তু সে অনেক কথা। সেসব শুনতে কি ভাল লাগবে আপনার?

কেন লাগবে না! আপনি বলুন।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নারায়ণ, তারপরে বললে, এই ঘর-বাড়ি আর বাগান, এ ছিল আমারই এক কাকার সম্পত্তি। কাকা ব্যবসায়ী লোক, আমার কাছ থেকে যথেষ্ট বাধা পাওয়া সত্ত্বেও মোটা লাভের লোভে ঘনশ্যামদাসজীকে বিক্রি করে দিলেন। কিন্তু এ হল গিয়ে বাইরের ঘটনা, ভিতরে-ভিতরে যা ঘটেছিল, সে অন্য কাহিনী।

আবার চুপ হয়ে গেল নারায়ণ, সুগোপন কোন্ এক বেদনার তারে যেন বেজে উঠেছে অশ্রুত এক রাগিণী, তার আলাপন শোনাতে গিয়েও যেন শোনাতে পারছে না সে।

পর মুহূর্তে হঠাৎই চমক ভেঙে উঠে দাঁড়াল নারায়ণ, বললে, এই যা, আপনাকে চা এনে দেওয়া হল না! দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি।

না না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

তা কি হয়! নারায়ণ ভিতরের দিকে দরজাটা খুলতে খুলতে বললে, মেয়েদের মধ্যে কেউ চা করেছে কি না দেখছি। এক মিনিট।

দ্রুত অপসৃত হল সে ভিতর-মহলে। মনে হল, আসবার সময় সমস্ত দরজাই তো দেখে এসেছি বন্ধ। এত ভোরে কে উঠেছে এক ভামতী ছাড়া?

পরক্ষণেই ফিরে এল নারায়ণ, দরজাটা ভাল করে ভেজিয়ে দিতে দিতে বললে, আসছে চা।

মুখে কেমন যেন মিটিমিটি হাসি। যদি সত্যি সত্যি সে-ই চা নিয়ে আসে ঘরে?

কিন্তু ওরকম হাসি কেন নারায়ণের মুখে? সে কী মনে মনে সবকিছুই বুঝতে পেরেছে?

নিজের আসনে ধীরে-সুস্থে এসে বসল নারায়ণ, মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে, আবার ম্লান স্তিমিত মনে হতে লাগল ওর মুখের ভাব, বললে, তখন আমার জোয়ান বয়স, বাবুজী। কাকা ছিলেন নিঃসন্তান, আমাকে ভালবাসতেন ছেলের মতো। কাকার তখন এক গদি ছিল এখানে, সেই গদিতেই বসতাম। পয়সার অভাব ছিল না, বন্ধুবান্ধবও জুটেছিল প্রচুর, ফলে যা হয়। তখন এসব অঞ্চলের চেহারা ছিল বীভৎস, হৈ-হল্লা-মারামারি-মাতলামি লেগেই ছিল, খুন-জখমও হত দুটো-একটা। সবান্ধবে রাত্রের অভিসারে আমিও আসতাম বাবুজী, হৈ-হল্লা আমিও করেছি কত। মারামারিও করেছি। এক কথায়, সে আমার এক অমানুষিকতার যুগ গেছে বলা যায়। ক্রমে ক্রমে কাকার কানে উঠল সব। আমাকে শাসন করার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। কারও ওপর যে কোনও আকর্ষণ ছিল তা নয়, কেমন যেন একটা অদ্ভুত খেয়াল। প্রাচীনেরা 'বয়সের দোষ' বলে যে একটা কথা বলে থাকেন, এ বোধহয় ছিল তা-ই।

এই পর্যন্ত বলেছে নারায়ণ, ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল ভিতরের দরজাটা, হাতে দু কাপ ধূমায়িত চা, ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল, আর কেউ নয়, সত্যি সত্যিই ভামতী।

জরি-পাড় সাদা একটা শাড়ি, জরি-হাতা সাদা ব্লাউজের ওপর আঁট করে পরা, আঁচলটা কোমরে জড়ানো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমাদের কাছে চায়ের কাপ ঠক করে রেখে এক মুহূর্তের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াল। বোধহয় ইচ্ছে ছিল নারায়ণের সামনে মুখের ভাব কোনক্রমেই প্রকাশ করবে না, কিংবা তাকাবে না আমার দিকে চোখ তুলে। কিন্তু পারল না শেষ পর্যন্ত। দুটি আয়ত চোখের তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি আমার উপর মুহূর্তকালের জন্য স্থাপিত করে, তারপর দ্রুতপায়ে চলে গেল ভিতরে।

সম্ভবত সব-কিছুই লক্ষ্য করেছিল নারায়ণ, মৃদু একটু হাসি যেন খেলে গেল তার ঠোঁটের ওপর দিয়ে। বললে, দেহপ্রীতি বলে একটা কথা আছে। ভাষান্তরে, এক ধরনের মোহও বলা যায়, নারীর প্রতি নরের সেই আদিম মোহ। কিন্তু যখন লোকে দেহ-বিলাসীদের ওপর মন অর্পণ করে ফেলে, তখনই গড়ে ওঠে সংঘাত, গড়ে ওঠে নানান সমস্যা।

কী হল মনের মধ্যে, হঠাৎ বলে ফেললাম, ইঙ্গিতটা কি আমাকেই লক্ষ্য করে?

একটু যেন অপ্রতিভ হল নারায়ণ, তারপরে একটু হেসে বললে, না বাবুজী, ঠিক আপনাকে লক্ষ্য করে নয়, আমি সবাইকেই একথা বলতে চাই। অবশ্য, কিছু মনে করবেন না বাবুজী, আমি আপনার বিষয়টাও ভেবে দেখেছি।

কী ভেবেছেন?

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে, এখানে যারা আসে, হৈ-হল্লা করতে দেওয়া হয় না তাদের, তবে অল্প-বিস্তর একটু যে সবাই নেশা করে না আসে এমন নয়, সেটা বাধ্য হয়েই আমাদের অনুমতি দিতে হয়েছে। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না বলেই আপনার কথা বিশেষ করে ভাবতে হয়েছে।

হেসে বললাম, কী রকম!

বললে, আপনাকে আমার ভাল লেগেছে বাবুজী, তাই বন্ধুভাবেই কথাগুলি খোলাখুলি বলছি, অপরাধ নেবেন না যেন। যে-মেয়েটি এইমাত্র এসে চা দিয়ে গেল, একে আপনার ভাল লেগেছে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একে পর পর কয়েকটা দিন আপনি পেলেন কী করে, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললাম, আপনিই বলুন তো কী করে?

বললে, ভাগ্য। ভাগ্যের জোরে পেয়েছেন। নইলে, ও মেয়েকে আমি জানি, ফুলের নাম জানাজানি হওয়া ও মেয়ের কাছ থেকে সম্ভব নয়।

সত্যি কথা বলতে কী, নারায়ণেব প্রশ্নের ধরন দেখে একটা আশঙ্কা ঘনিয়ে আসছিল মনে, এতক্ষণে বুকের ভিতর থেকে যেন পাষাণ-ভার নেমে গেল।

নারায়ণ বলে যেতে লাগল, ধর্মভীরু মায়ের মেয়ে ও। নিজেও ধর্মভীরু অত্যন্ত। এই যে নরগ্রহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা, এ খুব সাধারণ কথা নয়, এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে আজও প্রতিটি হিন্দুর বুক কাঁপবে, এসব ভাগ্যাহত মেয়েদের তো সবার আগে।

বলে উঠলাম, আমি মশাই ওসব মানি-টানি না।

বললে, জানি। অর্থাৎ ভাবপ্রবণতা আপনার মধ্যে একটু কম। খাঁটি কর্মী মানুষ আপনি। সেইজন্যই আপনাকে নিয়ে আমার তত ভয় নেই।

একটু অবাক হয়েই মুখের দিকে তাকালাম ওর। বহুদর্শী লোক এই নারায়ণ। আমার সম্বন্ধে এ যা ধারণা করেছে, ভামতীর ধারণা থেকে তা একেবারে বিপরীত। বস্তুত, আমার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাও নারায়ণের মতো। ভাবপ্রবণতা আদৌ নেই আমার

মধ্যে। একটি মেয়েকে নিয়ে কল্পনার জাল বোনা বা তাকে নিয়ে মত্ত হওয়া, এ চিন্তাটাই আমার কাছে হাস্যকর। কিন্তু ভামতী বললে, আমি ভাবপ্রবণ। আমি কবি। আমি সাত্ত্বিক প্রকৃতির।

কথাটা মনে করে হো-হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছা হল। আর সঙ্গে সঙ্গে, নিজেকে খুব স্বচ্ছন্দ আর উল্লসিত মনে হতে লাগল। নারায়ণের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাল লেগে গেল লোকটিকে। ওর সান্নিধ্যে বসে ওর সঙ্গে কথা বলে, যেন নিজের স্ব-ভাবটাকে ফিরে পেলাম, ফিরে পেলাম স্বাভাবিক 'আমি'কে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা কাঁটার মতো মনে বিঁধতে লাগল। তাকে ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে, তাকে ছাড়া অবসর-মুহূর্তে অন্য কাউকেও তো ভাল লাগল না। এটাই বা কেন?

পর-মুহূর্তে মনে হল, নারায়ণের অনুমানই ঠিক, ওকে আমার ভাল লেগেছে মাত্র। একটি মানুষকে কি আর একটি মানুষের ভাল লাগে না! নিজের মনের মধ্যেই দুটি মন বিপরীত স্রোতে সেদিন প্রবাহিত হচ্ছিল। তার দেওয়া হাতের আংটিটির দিকে তাকিয়ে সেদিন এক মন ভাবছিল—সে আমার মোহ, নারায়ণের ভাষায় দেহপ্রীতি। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিল অন্য মন—সত্যিই কি তাই? অন্য কিছু নয়?

এই চিন্তায় অবতরণ করেই নারায়ণের একটা কথা ধ্বক করে জ্বলে উঠল মনে। সে বললে, মেয়েটি অত্যন্ত ধর্মভীরু, নবগ্রহ ছুঁয়ে ফুলের নাম নেওয়া, এ নাম সে কখনও জানাজানি হতে দিতে পারে না।

কিন্তু অবাকই হচ্ছিলাম মনে মনে, তাহলে সে সত্যিই জানাজানি হতে দিল কী করে তার নাম? খ্যাপার মতো তাকে আমার খুঁজে ফেরা লক্ষ্য করে? না, সত্যিকার ভালবাসারই টানে?

পরক্ষণেই সচেতন হয়ে যেন জেগে উঠে বসলাম। কী এসব ভাবছি বসে বসে! একটা মেয়েকে কেন্দ্র করেই অলস চিন্তার জাল বুনে চলেছি এতক্ষণ? ভাবালুতা আর কাকে বলে!

নারায়ণও আপন ভাবনার গভীরে আপনিই ডুবে ছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে এতক্ষণে কথা কয়ে উঠল, বললে, কাকা শেষ পর্যন্ত আমাকে সামলাতে না পেরে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। কত জায়গায় যে ঘুরেছি, তার ইয়ত্তা নেই। অধিকাংশ ঘোরাই আমার হয়েছিল তীর্থকে কেন্দ্র করে। শেষ পর্যন্ত, সোমনাথ মন্দিরে বসে আমার যেন দিব্যদৃষ্টি ফিরে এল। দিব্যদৃষ্টি বলা ভুল, মনে হল, দেশে ফিরে যাই, কাজে লাগাই আমার অভিজ্ঞতা। এলাম। সত্যিই একদিন অবশেষে দেশে ফিরে এলাম। বাবুজী, নানান দেশ ঘুরে এসে নানান লোক দেখে এটুকু বুঝেছি, প্রস্‌টিটিউশনকে একেবারে উচ্ছেদ করা যাবে না, তবে শোভন একটা রূপ দেওয়া যেতে পারে অবশ্য। আমার সাধ আর সাধনা হচ্ছে এই শোভনতাকে নিয়ে। প্রাচীন যুগে, শুনেছি, এ ধরনের দেবীপল্লী ছিল শিল্প, কাব্য ও সংস্কৃতির লীলা-ক্ষেত্র। এ যুগেই বা তা না গড়ে উঠবে কেন? 'মৃচ্ছকটিকে'র বসন্তসেনার মতো চারুদত্তকে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার সাধ এদের অনেকেরই থাকে, কিন্তু সাধ আর সাধনা তো এক জিনিস নয়। তাই, সে জিনিস গড়ে ওঠে না, ক্রমশই ভেঙে পড়ে।

থেমে গেল নারায়ণ।

বললাম, তাহলে, এখানকার নিয়মকানুন সব আপনারই সৃষ্টি?

নারায়ণ মুখখানা নিচু করে একমুহূর্তে কী যেন ভাবল, তারপরে মুখ তুলল, বলল,

না, ঠিক আমার সৃষ্টি নয়। এসবই প্রাচীন নিয়ম, আমি নতুন করে প্রচলন করেছি মাত্র কিন্তু যা-ই বলুন বাবুজী, এ নিয়ম চালু করে ভাল ফলই পেয়েছি। কোনও হৈ-হল্লা, খুন-খারাপি, মাতলামি—এসব এ অঞ্চলে আর নেই। অনেকটা সুসংহত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন। নয় কী?

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

বললে, কিন্তু এসেছিল সংঘাত। যেদিন এসব বিষয়সম্পত্তি কিনে নেন ঘনশ্যামদাসজী, আমি চলেই যাব ঠিক করেছিলাম! কিন্তু উনি যেতে দিলেন না। আর তাছাড়া, আমারও কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল এর ওপর। নিজেরই তো সৃষ্টি, নিজে কেমন করে ভেঙে-চুরে দিয়ে চলে যাই বলুন? তাই রয়ে গেলাম।

বললাম, একটা কথা বলব?

বলুন বাবুজী।

এই ফুলের নামে নাম-রাখার নিয়মটা বোধহয় না রাখলেই ভাল করতেন।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল নারায়ণ, আমি জানি বাবুজী, এ প্রশ্ন আপনি করবেন। বহু লোকেই করেছে। আপনাকে আগেও বলেছি, এসব মেয়েদের সঙ্গে নিবিড় করে নিজের মনকে জড়াতে নেই। এদের বিয়ে করে ঘরে তুলে জীবন কাটানো যায় না। এরা ঘরণী হবার জন্য নয়। শুনলেন তো আপনি, ঘনশ্যামবাবু যে সরোজাকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন, তাকে কিছুদিনের জন্যে আবার এখানে রাখতে চাইছেন। ছেলের সামনে তাকে বার করতে লজ্জা হল। দেখবেন বাবুজী, আমি বলে রাখছি, সরোজাকে উনি শেষ পর্যন্ত ত্যাগই করবেন।

তাই কি আপনার ধারণা?

হ্যাঁ। আপনি দেখে নেবেন। আমি স-ব বুঝতে পারি। এটাই হয় বাবুজী, এদের নিয়ে পুরুষের নেশা চিরকাল থাকে না।

তর্কের খাতিরে আমি এর উপযুক্ত উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম অবশ্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সরোজার প্রসঙ্গটা ওঠায় আমাকে বাধ্য হয়ে চুপ করে যেতে হল। জাজ্বল্যমান এই উদাহরণ চোখের সামনে থাকতে এর বিপরীত প্রসঙ্গ কেমন করে তুলতে পারি আমি?

আমরা কথা বলছি, এরই মধ্যে একটা হিন্দি গানের তানমালা বিস্তার করতে করতে সেই প্রথম দিনটির মতোই ঘরে এসে ঢুকল নটরাজন,—'চল মন, গঙ্গা-যমুনাকে তীর!'

নারায়ণ বলে উঠল, এসো নটরাজন, এসো, খবর কী ওখানকার?

নটরাজনের মুখখানা বিরস হয়ে উঠল, বললে, খবর ভাল নয় নারায়ণ, ডাক্তার একরকম জবাবই দিয়ে গেল।

সে কী!

হ্যাঁ। একে বৃদ্ধ বয়স, তার ওপরে খুব খারাপ ধরনের নিউমোনিয়া, বুকে প্যাচও হয়েছে, অর্থাৎ প্লুরিসির আক্রমণ বলতে পারো।

এখন কেমন?

আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। বোধহয় শেষ অবস্থা। তুমি এক কাজ করো। ওর মেয়েকে এইবার ওর কাছে পাঠিয়ে দাও।

ভামতীকে?

নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ চমকে কেঁপে উঠল বুকের ভিতরটা। মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, ভামতী!

ওরা দুজনেই ফিরে তাকাল আমার দিকে।

এক মুহূর্তের বিরতি। নারায়ণ বললে, হ্যাঁ বাবুজী, ভামতীর মায়ের কথাই আমরা বলাবলি করছি, সরস্বতী আম্মা। কিন্তু, আপনি কী করে জানলেন এ নাম? চেনেন মেয়েটিকে? আসল নাম ধরে কোনও মেয়েকে তো আপনার জানবার কথা নয়!

ভয়ানক অপ্রতিভ হয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে, কী বলা উচিত কী করা উচিত স্থির না করতে পেরে অবশেষে বলে উঠলাম, মানে, যে মেয়েটি চা দিয়ে গেল, ওকে যেন একবার ভিতরে মনে হল ডেকে উঠেছিলেন ওই নাম ধরে!

ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, সেই মুহূর্তে বিশেষ আর কথা না বাড়িয়ে শুধু বললে, তা হবে। কিন্তু খুব সজাগ কান তো আপনার!

তারপরেই আর দ্বিধা দ্বিরুক্তি না করে চট করে ভিতরে চলে গেল নারায়ণ। চুপচাপ কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত।

নটরাজন আমার দিকে তাকিয়েছিল, তারপরে ধপ করে বসে পড়ল খাটের ওপর, কপালে হাত দিয়ে নীরব নিস্পন্দ বসে রইল সে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরেই এল নারায়ণ। তার পিছনে এল ভামতী। আমার কাছে একটু দাঁড়াল, একবার ব্যথাতুর দুটি চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে, ঠোঁটদুটি কেঁপেও উঠল, তারপরে দ্রুত পায়ে চলে গেল বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে।

নারায়ণ নির্বাপিত-প্রায় ধূপকাঠিগুলিকে সরিয়ে ধূপদানিতে নতুন ধূপ সাজাতে লাগল এক মনে, সেই দিকে তাকিয়ে, তারপরে আমার দিকে তাকাল নটরাজন, নারায়ণকে উদ্দেশ করেই বলে উঠল, ইনিই সেই বাঙালী বাবুটি, না?

হ্যাঁ।

সস্মিত মুখে নটরাজন বললে, নমস্কার মশায়। অনেক শুনেছি আপনার নাম।

কার কাছে?

এই আমাদেরই মধ্যে আলোচনা হয় তো, তাই।

পরে নারায়ণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, ও কোথায় গেল? আমাদের বিশ্বনাথম?

ঘনশ্যামদাসজীর বাড়ি। এই এত ভোরেই ডেকে পাঠিয়েছে।

বলে উঠলাম, আচ্ছা নারায়ণজী, উনি এ প্রতিষ্ঠান চালান কেন আজও? সরোজাকে তো উনি পেয়েই গেছেন, আর এটা তারপরে চালিয়ে লাভ? কী স্বার্থ ওঁর?

স্বার্থ! বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল নারায়ণের মুখে, বললে, আমাদের সবারই স্বার্থ রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি জুড়ে। আমার তো বটেই, এমন কি নটরাজনেরও। বিশ্বনাথমেরও।

তারপরে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, ঘনশ্যামদাসজী হচ্ছেন ব্যবসায়ী লোক, ব্যবসার খাতিরে বহু লোককে ওঁর হাতে রাখতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সেদিক থেকে ওঁর বিশেষ কাজে লাগে। যেমন করে আপনি সহজেই প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন এখানে। আর আমার স্বার্থ? আমার স্বার্থ হচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানেরই মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আবার পুনরাবিষ্কৃত করা। নটরাজনের স্বার্থ হচ্ছে অবশ্য অন্যরকম। এদের মধ্য থেকে সে বড় গায়িকা আর নৃত্যশিল্পী গড়ে তুলতে চায়। আর, বিশ্বনাথমের স্বার্থ? তার গ্রাসাচ্ছাদন চলে এই প্রতিষ্ঠানের এজেন্সি-স্বরূপ তার যা আয় হয়, তা থেকে।

নটরাজন বলে উঠল, তাঞ্জোরের মেয়েরা এইভাবেই 'ভরতনাট্যম'কে রক্ষা করেছিল।

আমার কথা হচ্ছে, এরাই বা পারবে না কেন? এখানকার এক একজনের এমন ছন্দোময় শরীর, এই ধরুন না কেন, যে মেয়েটির কথা হচ্ছিল, সেই ভামতী বলে একটি মেয়ে—

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল নটরাজন, তারপরে কী মনে করে বলে উঠল, কিন্তু কি হল নারায়ণ? যাবে না সরস্বতী আম্মার কাছে?

হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। আমি বিশ্বনাথমের জন্য অপেক্ষা করছি।

ও, হ্যাঁ, তাও তো বটে, নটরাজন বললে, সরোজাকে নিয়ে কী একটা গোলমাল হয়েছে শুনলাম। ঘনশ্যামদাসজী তাকে আর কাছে রাখতে চান না, এইখানেই ফেরত পাঠিয়ে দিতে চান নাকি!

সরোজার কথায় গম্ভীর হয়ে নারায়ণ বললে, সংঘাত যে শেষে এভাবে একদিন নেমে আসবে, তা ভাবিনি। আমি স্থির জানি নটরাজন, এখানে এসে থাকবার ফন্দি ওর নিজের, নইলে ঠিক এ চিন্তা মাথায় আসত না ঘনশ্যামদাসবাবুর।

একটু হাসল নটরাজন, বললে, কিন্তু কেন সরোজার এ চিন্তা? ওর থাকবার জায়গার অভাব হবে ঘনশ্যামদাসজীর কল্যাণে, এ আমি বিশ্বাস করি না।

মুহূর্তে চোখ দুটি ধ্বক করে জ্বলে উঠল নারায়ণের, বললে, কিন্তু আমিও নারায়ণ শর্মা। এখানকার বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায় আমার নামে। আমিও দেখব আমার বিরুদ্ধে যায় কে এখানে!

নটরাজন বললে, কেউ যাবে না। যেতে সাহসও করবে না। আমি এখানকার লোক নই, তামিলনাদের লোক, অথচ এখানে পড়ে আছি অদ্ভুত এক মায়ার শিকল পায়ে জড়িয়ে। বুঝলেন বাবুজী, বাইরে ঘুরতে বেরোই, আবার ফিরে ফিরে ঠিক আসি এখানে। 'আলারিপ্পু', 'পদম' এইসব শেখাই 'ভরতনাট্যমে'র, আমাদের জিনিস আমরা না বাঁচিয়ে রাখলে কে রাখবে? কিন্তু দম চাই, স্বাস্থ্য চাই, পরিশ্রম করার শক্তি চাই, নইলে কী করে হবে? এই নারাণ-ভাইয়ার কঠোর নিয়ম-নীতির জন্য তবু অনেক কাজ করা যাচ্ছে, নইলে সব ভেঙে-চুরে যাবে।

বাইরের দরজায় ঠিক এই সময় বেজে উঠল একটা করাঘাত। নারায়ণ প্রশ্ন করলে, কে?

আমি। বিশ্বনাথম।

মুহূর্তে ওদের ভঙ্গিমায় দেখা গেল নিদারুণ ঔৎসুক্য। নারায়ণ বললে, দরজা খোলাই আছে। ভেতরে এসো।

কিন্তু ভেজানো কপাট ঠেলে প্রথমেই যে ঘরে এল, সে বিশ্বনাথম নয়, একটি মেয়ে। হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলি। তার পিছনে ছিল বিশ্বনাথম ছোট একটা চামড়ার সুটকেস হাতে।

যারা এ-বাড়িতে থাকে, তাদেরই বয়সী হবে এ-মেয়েটি, রূপের দিক থেকে নয়টি মেয়ের মধ্যেই মিশে যাবার যোগ্য। শুধু মিশে কেন, নজনের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। এটা একনজর দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু, এই কি সরোজা, ঘনশ্যামদাসবাবুর স্ত্রী?

বিশ্বনাথম হাতের সুটকেসটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে বললে, ভীষণ ব্যাপার। ঘনশ্যামদাসবাবুর ছেলে টেলিগ্রাম করেছে আসছে বলে, আবার ওদিকে ওঁর সেই ইঁদুর—বাচ্চু, সে মারা গেছে হঠাৎ। উনি তো পাগলের মতো হয়ে গেছেন।

সোনার ঘণ্টি-পরা বাচ্চু! ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং করতে করতে এগিয়ে এসে ঘনশ্যামদাসজীর হাত থেকে হালুয়া খাওয়ার ছবিটি মুহূর্তে ভেসে উঠল চোখের সামনে।

মেয়েটি ততক্ষণে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নারায়ণের দিকে। কেমন যেন বিব্রত বোধ করছে নারায়ণ সেই তীব্র তীক্ষ্ণ ঋজু দৃষ্টিপাতের সামনে। সে কোনক্রমে শুধু বলে উঠল, সরোজা?

হ্যাঁ। থাকতে এলাম আমার পুরনো জায়গায়।

কিন্তু তা কী করে হয়! তুমি হচ্ছ ঘনশ্যামদাসবাবুর—

গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠল মেয়েটি, উনি আমাকে জন্মের মতন ত্যাগ করেছেন।

মনে হচ্ছিল, কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেছে নারায়ণ ওর সামনে। বললে, ও, আচ্ছা, বেশ।

আর কোনও দিকে দৃকপাত না করে দৃঢ় পদক্ষেপে ভিতরে চলে গেল মেয়েটি!

ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়ে নারায়ণ বললে, ও যে ভেতরে গেল, থাকবে কোন্ ঘরে? তুমি এক কাজ করো বিশ্বনাথম—সব থেকে ছোট মেয়েটার নাম যেন কী! ভারাহালু। তাকে তুমি রেখে এসো অন্য বাড়িতে। এখানে তো নজনের বেশি থাকবার নিয়ম নেই।

ভারাহালু!

হ্যাঁ, নারায়ণ বললে, এতে এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন বিশ্বনাথম! শুধু রূপ নয়, গুণের কথাটাও ধরতে হবে। সেদিক থেকে ভারাহালুকে অন্যত্র রাখার অপরাধ হবে না আশা করি।

বলেই দু হাত জোড় করে দেওয়ালে আকীর্ণ দেবমূর্তির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে নারায়ণ বলে উঠল, যাও বিশ্বনাথম, যা বললাম করো গিয়ে। সব জেনে শুনে দ্বিধা করা তোমার পক্ষে উচিত নয়।

যাচ্ছি।

বিশ্বনাথম ভিতরে যেতেই উঠে দাঁড়াল নটরাজন, যাবে না ভাইয়া, সরস্বতীর আম্মাকে দেখতে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, চলো।

বললাম, যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?

নটরাজন বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন না—

বাধা দিয়ে বলে উঠল নারায়ণ, কেন বাবুজী, আপনি যেতে চান কেন?

একটু হেসে বললাম, এমনি। মানে—সব শুনে-টুনে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে নারায়ণ বললে, অযথা কৌতূহল কি ভাল? মন শান্ত করে বাড়ি যান বাবুজী। আপনি মানী লোক, আমাদের এসব তুচ্ছ ব্যাপারে আপনার মাথা না ঘামানোই ভাল।

একটু অপ্রস্তুতের মতোই বলে উঠলাম, না না, অন্য কিছু নয়, মানে, যদি কোনও উপকারে লাগতে পারি—

বাধা দিয়ে নারায়ণ তাড়াতাড়ি বললে, ধন্যবাদ বাবুজী। সেরকম বুঝলে নিশ্চয়ই খবর দেব। আজ আসুন। নমস্কার।

পথে আসতে আসতে নারায়ণের আচরণটা অনাবশ্যক রূঢ় মনে হচ্ছিল। আমি গেলে হয়ত ভাল হত, হয়ত সে একটা ভরসা পেত, হয়ত আমি নিজে কাছে থেকে উপযুক্ত শুশ্রূষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতাম।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এতটা চিন্তা আমার পক্ষে না করলেও চলবে। সত্যিই তো, ওদের দুঃখ-কষ্ট-সমস্যার জন্য কত লোক রয়েছে, নারায়ণ নিজে একাই একশো, আমি তার মধ্যে মিছিমিছি অনুপ্রবেশ করি কেন?

একথাটা মনে হতেই অনেকটা হালকা হয়ে গেল মনের ভাব। সহজ স্বাভাবিক গতিতে পা ফেলতে ফেলতেই বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।

কিন্তু, এ কী হয়েছে বাড়ির পরিবেশ! ঘনশ্যামদাসজীর কর্মচারীর দল এধারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু-একজন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক। বাড়ির বাইরে কিছু জনতার ভিড়। তাদের সরিয়ে দিতে দিতে আমার দিকে চোখ পড়ল পাম্বলুর। বললে, এসেছেন বাবুজী! উনি যে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জানেন কী হয়েছে?

সংক্ষেপেই বললাম, জানি পাম্বলু।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর পাম্বলু আমার কাঁধের কাছে হাতটা রেখে আমাকে চুপিচুপি সরিয়ে নিয়ে এল বারান্দার এক ধারে, তারপরে ফিসফিস করে নিম্নকণ্ঠে বললে, দেখলেন সরোজাকে? এমন মেয়ে দেখিনি। উনি টাকাকড়ি দিতে চাইলেন, কিছুই সে নিল না, মাথা উঁচু করে নিজের সামান্য টুকিটাকি জিনিস নিয়ে সোজা ঘর থেকে পথে নেমে পড়ল।

তুমি কি চিনতে আগে থাকতে?

পাম্বলু একটু আমতা-আমতা করে বললে, না, তা ঠিক চিনতাম না, তবে পরিচয়টা সবই জানতাম। কিন্তু আসল কথাটা তা নয়।

তবে?

ঘনশ্যামদাসবাবু ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অন্য কারণে।

কী? তাঁর ছেলে আসছে বলে তার করেছে, সেইজন্যে?

একটু অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকাল পাম্বলু, বললে, অনেক খবরই দেখছি ওখান থেকে পেয়ে গেছেন বাবুজী। হ্যাঁ, ওঁর ছেলে রামদাসবাবু এসে পৌঁছচ্ছেন কাল সকালে। সেইজন্যই তো সরোজাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু, ব্যাপারটা এও নয়।

তবে? এক মুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে পাম্বলু কিছু বলবার আগেই বলে উঠলাম, জানি। বাচ্চু মারা গেছে, সেই শোকটাই ওঁর বড্ড লেগেছে, তাই না?

ঠিক তাই, পাম্বলু বললে, সব ছাপিয়ে বাচ্চুকে হারানোর দুঃখটাই ওঁর কাছে মর্মান্তিক হয়েছে। বুড়ো একটা ইঁদুর মরে গেছে তাইতে এত শোক, এ এক দেখবার জিনিস বাবুজী! চলুন না ওর ঘরে। নিচে গদিতেই বসে আছেন। আপনাকে দেখলে, আপনার সঙ্গে কথা বলে হয়ত কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন।

বললাম, বেশ চলো।

আসুন বাবুজী।

লাল কাপড়ের ঝালর দেওয়া অতিকায় একটা তালপাখা হাতে নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটা চাকর, ঘনশ্যামদাসবাবু গদির উপরে বসে আছেন, একটা গেঞ্জি মাত্র গায়ে, চোখের নিচে কালি, মুখখানা দেখাচ্ছে বিশীর্ণ পাণ্ডুর, মাথার চুল এলোমেলো, মূর্তিমান শোকেরই প্রতিচ্ছবি বলা যায়।

আমাকে দেখামাত্রই ভগ্নকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন ঘনশ্যামদাসবাবু, বাচ্চু নেই বাবুজী, বাচ্চু নেই!

সবই শুনেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা চোখে দেখে আমার একটু অদ্ভুতই লাগছিল। একটা ইঁদুরের জন্য মানুষ যে সত্যিই এত শোকাকুল হতে পারে, এ আমার ধারণার অতীত ছিল।

অথচ উপস্থিত ক্ষেত্রে ছদ্ম গাম্ভীর্য ধারণ করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই, বললাম, কোথায় বাচ্চু?

দেরিতে এলেন বাবুজী, নইলে শেষ দেখাটা দেখতে পেতেন।

বলতে বলতে সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেললেন ঘনশ্যামবাবু, এই একটু আগে ওকে শ্মশানে নিয়ে গেল।

শ্মশানে!

পান্থলু এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বললে, হ্যাঁ বাবুজী। বহু লোক সঙ্গে গেছে। সানাই-টানাই বাজিয়ে—রীতিমতো শোভাযাত্রা। আমিও যেতাম, কিন্তু আমার হাতে একটা কবচ আছে, শ্মশানে যাওয়া মানা।

উত্তরোত্তর আমার অবাক হবার পালা। নিম্নকণ্ঠে পান্থলুকে বললাম, ঘনশ্যামদাসজী গেলেন না কেন?

পান্থলু বললে, শেঠজীকে আমরাই যেতে দিলাম না।

কথাটা বোধহয় শুনতে পেয়েছিলেন ঘনশ্যামদাসজী, বললেন, না বাবুজী, গেলাম না, ওরা ওকে পোড়াবে, এ দৃশ্য আমি চোখে দেখতে পারব না।

ওঁর আকুলতা আর শোক-দুঃখ অনুভব করতে করতে আমার হঠাৎ অন্য একটা কথা মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল। মনে হল যিনি এই বিচিত্র বিশ্ব আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের মনোরাজ্যেও তাঁর কি বৈচিত্র্যের লীলা! এই যে বাচ্চুর জন্য শেঠজীর এত কান্না, এ হয়ত নিছক বাচ্চু, নামক ইঁদুরটির জন্য একেবারেই নয়, যার নাম ওঁর মুখে একবারও উচ্চারিত হচ্ছে না, সেই সরোজাকে হারানোর তীব্র বেদনারই এ হয়ত এক বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ, কে বলতে পারে!

চিন্তাটা জাগবার সঙ্গে সঙ্গে, যত না সমবেদনায় মথিত হতে লাগল মন, তার থেকেও আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজেই নিজের চিন্তাধারাকে অনুধাবন করে। শেঠজীর মনের ব্যথা বুঝতে গিয়ে, যিনি মন-জীবন-বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তার কথা এমন করে হঠাৎই আমার মধ্যে জেগে উঠল কেমন করে! এভাবে কখনও তো চিন্তা করিনি আগে? মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খনিজ পাথর বার করে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈচিত্র্য নিয়েই ছিল আমার নিজস্ব চিন্তার জগৎ, তার মধ্যে কী-ভাবে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্পর্শ এসে পড়ছে আজ বারংবার!

তুমি কবি।

একটি মেয়ের মুখের কথা মানুষের মনকে এমন করে নাড়া দিতে পারে, নিজের কাছে এও যেমন এক আবিষ্কার, আর, এখন, এই মুহূর্তে, শেঠজীর মনোরাজ্যের এক বিশেষ

পরিচিতির কথা, আমার মনের দিগন্তে অভাবিতরূপে ভেসে ওঠা, এ আবিষ্কারও কম মূল্যবান নয়।

এরই প্রচ্ছন্ন আনন্দে বিভোর হয়ে ওঁর একেবারে পাশে গিয়ে বসলাম আমি। বললাম, শেঠজী, একজনের চলে যাওয়াটা সহজ, কিন্তু সে যা দাগ রেখে চলে যায়, তা মুছে যাওয়াটা সহজ নয়।

একটু যেন অবাক হয়েই তাড়াতাড়ি আমার মুখের দিকে তাকালেন ঘনশ্যামদাসজী, তারপরে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকবার পর বললেন, বাবুজী, বাচ্চু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স-ব চলে গেল।

এই 'স-ব' চলে যাওয়ার কথাটা উল্লেখ করে ঘনশ্যামদাসজী কী ইঙ্গিত করলেন কে জানে, আমি সরোজার কথাটা পাছলু আর চাকরটা থাকায় বলি-বলি করেও বলতে পারলাম না। নইলে আমি যে সরোজার ব্যাপারটা সব জেনে গেছি, তা ওঁকে বুঝিয়ে দেবার এ-ই ছিল সুযোগ।

অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গেলাম। বললাম, কী হয়েছিল?

শেঠজীর চোখ আবার এল ছলছল করে, বললেন, ভোরে উঠে যেমন ওকে ডাকি, তেমনি ডাকছি, কিন্তু এল না। ভিতরে গিয়ে দেখি, নর্দমার ধারে বাচ্চু মরে পড়ে আছে, গলার কাছে প্রকাণ্ড ক্ষত, কোন বড় জন্তু, ভাম-টাম হবে হয়ত—টুঁটি কামড়ে ওকে মেরে ফেলে থাকবে।

হ্যাঁ, তা হতে পারে। কিন্তু—

হ্যাঁ বাবুজী, এই 'কিন্তু'র কথাটাই ভাবছি। এত বছর ও আমার কাছে আছে, কোনদিন কিছু হল না, আজ হঠাৎ ওকে মেরে ফেলল কেন?

বললাম, আচ্ছা শেঠজী, অন্য কিছু নয় তো? মানে, ওর গলায় গয়না ছিল, তার লোভে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, জয় সীয়ারাম! না না, সেসব নয়, ওই দেখুন ওর গলার সেই সোনার ঘণ্টিটা আমার সামনেই পড়ে আছে খবরের কাগজটার ওপরে।

এতক্ষণে চোখে পড়া উচিত ছিল। ওঁর সামনেই খবরের কাগজের ভাঁজে জ্বলজ্বল করছে বাচ্চুর ঘণ্টি। বললেন, এটা ওরা খুলে রেখে গেছে। কিন্তু, আমি ওটা কী করে সিন্দুকে তুলি বলুন তো বাবুজী? পাছলু, এটা তুমি দান-খয়রাতের কাজেই লাগিয়ো।

আচ্ছা, শেঠজী।

রামদাস এসে পড়ার আগেই এর গতি করতে হবে। সে হচ্ছে এ যুগের পড়িলিখি আদমি, বাচ্চু যে আমার গণেশজীর বাহন একথা হয়ত সে বিশোয়াসই করবে না।

তাই হবে, শেঠজী।

নিয়ে যাও ওটা, এখুনি নিয়ে যাও।

পাছলু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না, শেঠজী, সে আমি কেমন করে পারব! আপনি ছুঁতে পারছেন না, আমিও বা ছুঁই কী করে।

কেন, তুমি ছোঁবে না কেন?

আজ্ঞে, মৃত জীবের ধারণ করা বস্তু ব্রাহ্মণ হয়ে আমার কী ছোঁয়া উচিত?

শেঠজী বললেন, তাও তো বটে। কিন্তু ওটা যে বিক্রি করতে হবে, বাচ্চুর শ্মশান-

বন্ধুদের মধ্যে সে টাকা ভাগ করে দিতে হবে। সে ওরা এসে পড়ুক, ওরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

বেশ। তাই হোক।

আমি বরং বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, ওরা কেউ এল কিনা।

যাও। এ চাকরটাকেও নিয়ে যাও, পাখার বাতাসে আমার দরকার নেই। বাবুজীর সঙ্গে নিরিবিলি একটু কথা বলব।

পাখাটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে চাকরটা চলে গেল, পান্থলুও গেল বাইরে।

শেঠজী বললেন, আমার লক্ষ্মী চলে গেল বাবু, আমার এখানকার কাজকর্ম সব যাবে।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে উঠলাম, আচ্ছা ঘনশ্যামদাসজী, আপনারা সবাই এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কেন? একটা বুড়ো ইঁদুর মারা গেছে, তাতে হয়েছে কী?

যেন শিউরে উঠলেন আতঙ্কে, বললেন, মামুলি ইঁদুর নয় বাবুজী, গণেশজীর বাহন।

বললাম, ঘনশ্যামদাসজী!

বলুন।

শুধু কি বাচ্চুর জন্যই আপনার মনটা হু-হু করছে? আর কারুর জন্য না?

না, বাবুজী, আর কারুর জন্য না। বাচ্চুর চেয়ে বড় আর আমার কাছে কেউ না।

বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেললেন তিনি। ওঁর কান্না আর অকপট উক্তিতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই, আগে হলে এ উত্তরেই কৌতূহল আমার মিটে যেত, কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, ওঁর অবচেতন মনে বইছে অন্য এক হাহাকারের স্রোত। হয়ত সেকথা ওঁর নিজেরও স্পষ্ট জানা নেই।

তুলতে পারতাম সরোজার কথা। কিন্তু মনে হল, ঠিক সেই মুহূর্তটি এখনও আসেনি। উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, আজ্ঞা দিন, আমি ঘরে যাই শেঠজী। সেই সকাল থেকে—

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন শেঠজী, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বিশ্রাম করুন বাবুজী, কাল সকালে আমার ছেলে আসবে, তার সঙ্গে আলাপ করবেন, আমার পড়ি-লিখি ছেলে, আপনার সঙ্গে মিলবে ভাল।

অবশ্যই আলাপ করব।

চলে এলাম উপরে, নিজের ঘরে।

তারপরে কাটতে লাগল সময়, অফিসের জমানো কিছু কাগজপত্র দেখাশোনার কাজ সেরে স্নান খাওয়া-দাওয়ার পর চুপচাপ শুয়ে রইলাম সারা দুপুরটা। ইতিমধ্যে বাচ্চুর সৎকার শেষ করে ফিরে এল শ্মশানবন্ধুরা, সে এক রীতিমত কোলাহল। আমি আর নিচে নামিনি। শ্মশানবন্ধুরা আবার একসময় চলে গেল, আবার চুপচাপ হয়ে গেল বাড়িটা।

বিকেল হয়ে আসছে, শুয়ে শুয়ে হাতের আঙুলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভামতীর দেওয়া সোনার আংটিটাই দেখছিলাম। হরিদ্রাভ জ্বলজ্বলে প্রায় চৌকো একটা পাথর পড়ে আছে সোনার বেষ্টনীতে।

আংটিটা সামান্য একটু বড় হয়েছে আমার আঙুলে। নিঃসন্দেহে এটি পুরুষেরই হাতের আংটি, এটা ও পেলই বা কোথা থেকে! আর পাওয়া জিনিসই যদি, এমন করে আমাকে উপহার দিলই বা কেন?

শুয়ে শুয়ে এই সব চিন্তা করতে করতে কখন যে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল কে জানে,

চাকরটার ডাকে যখন জেগে উঠলাম, তাকিয়ে দেখি, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি। এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে রওনা হলাম নারায়ণের উদ্দেশে। বেরোবার সময় শেঠজীর গদির দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য লক্ষ্য করেছিলাম, গদিতে তিনি নেই, একা পান্থলু বসে কী সব কাগজপত্র নিয়ে যেন লেখাপড়ায় ব্যস্ত, ওপরতলাটা অন্ধকার। হয়ত সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে একা ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন ঘনশ্যামদাসজী।

দরজা বন্ধ ছিল। টোকা দিতেই নারায়ণের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ভিতরে আসুন।

আমি প্রবেশ করতেই একটু অবাক হল সে, বললে, বাবুজী আপনি! আমি ভেবেছিলাম, অন্য কেউ। আসুন, বসুন।

বসলাম গিয়ে কাছে। সেই নবগ্রহের মূর্তিসমন্বিত ঘরখানি, সেই ভিতরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা সঙ্গীতলহরী।

নারায়ণ একটু হেসে বললে, এত যে কাণ্ড, নটরাজনের গানের কিন্তু বিরাম নেই। সে ঠিক ভিতরে গিয়ে তানপুরা নিয়ে বসেছে।

বলে উঠলাম, কেমন আছেন সেই মহিলাটি?

কে? ভামতীর মা? ভাল নয়।

চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু হল?

নিশ্চয়ই। আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি। নতুন ডাক্তার আসছেন। তবে খুব ভরসা দিচ্ছেন না। শেষ বয়সে কতখানি যুদ্ধ করা সম্ভব?

ঠিক এই সময় দরজায় আর একবার টোকা বেজে উঠল কার যেন। নারায়ণ একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে তারপরে বলে উঠল, ভিতরে আসুন।

দরজা ঠেলে ঘরে এলেন স্থূলকায় এক ব্যক্তি, ধুতির ওপরে কমলালেবু রঙের হাফশার্ট গায়ে, বাঁ হাতের কব্জিতে মোটা নিকেলের ব্যান্ডে ঘেরা সোনালি রিস্টওয়াচ।

কথাবার্তায় বুঝলাম, অতিথিবর্গেরই একজন হবে। ফুলের নামের প্রশ্নে, অতি অদ্ভুত, লোকটি একটু ভেবে নাম উচ্চারণ করল, চম্পা!

কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না নারায়ণের মুখে, কিন্তু কী জানি কেন, আমার বুকের মধ্যটা হঠাৎই ধ্বক করে উঠল। জানি, নাম বদলায়, তবু আমার প্রথম দিনের প্রথম উচ্চারিত নামটির সঙ্গে স্মৃতি এমন বিজড়িত হয়ে আছে যে, ঐ নাম মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল করে তুলল আমাকে।

লোকটি যথারীতি ভিতরে প্রস্থান করতেই আমি সাগ্রহে বলে উঠলাম, নারায়ণ?

তার সেই খেরো-বাঁধানো খাতাটি খুলে, কী একটা নামের ওপর যেন লাল কালির রেখা টানছিল সে, মুখ তুলে বললে, কী?

বললাম, একটা কথা বলব? সে তো আজ আসেনি এখানে?

একটু যেন অবাকই হল নারায়ণ, বললে, কে?

তারপরেই একটু হেসে বলে উঠল, ও, বুঝেছি। না না, সে আজ আসবে কী করে তার মাকে ছেড়ে? কিন্তু বাবুজী, আপনার কথাটা কী? বসে আছেন! ফুলের নাম করুন?

ফুলের নাম?

ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, এবং সত্যি কথা বলতে কী, সে সব

কিছু মনে করেও আমি আসিনি। ওর কাছে ছুটে এসেছিলাম শুধু একটি সংবাদ জানতে। কেমন আছে তার মা?

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সেকথাটাই বলি কী করে ওকে? তার মা অসুস্থ, সেই ব্যাপারে আমারই বা অনর্থক মাথা-ব্যথা কেন?

ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করা নারায়ণের পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় বা অযৌক্তিক হয়নি, বরং জিজ্ঞাসা করাই স্বাভাবিক। এবং আমার পক্ষেও স্বাভাবিক হবে, আগের মতোই কোনও ফুলের নাম করা।

একটু ইতস্তত করেই বললাম, ফুলের নাম! হ্যাঁ, তা করছি। এই নিন, আগে টাকাটা রাখুন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল নারায়ণ, বললে, টাকা থাক বাবু, আগে কোনও ফুলের নাম করুন দেখি?

কেন? আগে তো টাকা দেওয়াই নিয়ম!

তা হোক, করুনই না?

একটুক্ষণ থেমে থেকে যে কোনও ফুলের নামই বলতে চেষ্টা করলাম। মনে হচ্ছিল, সত্যিই তো, এখানে যখন এসেছি, তখন ওসব মিথ্যা ভাবালুতায় কাজ কী? যে কোনও একটা ফুলের নাম করা যাক, যে-কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ! কিন্তু, আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তে চট করে কোনও ফুলের নামই মনে পড়ল না।

কী হল? বলুন?

বলছি। এই ধরুন—

বলতে বলতেও থেমে গেলাম, চম্পা ছাড়া আর তো মনে পড়ছে না কোনও নাম! ঘুরে ফিরে চম্পা নামটাই বা এত করে মনে জাগছে কেন!

একটু বাঁকা হেসে নারায়ণ বললে, মনে আসছে না তো কোনও ফুলের নাম? থাক বাবুজী, মনে করে কাজও নেই।

বলেই খেরো-বাঁধানো খাতাটা বন্ধ করে দিল সে। বললে, বিশ্বনাথমকে একটা কাজে ভিতরে পাঠিয়েছিলাম। দাঁড়ান, ওকে ডেকে নিয়ে আসছি।

কেন?

ওকে আমার আসনে বসিয়ে আপনাকে নিয়ে একটু বেরুব।

কোথায়?

একটু থেমে তারপরে বললে, বাবুজী, আমাকে একটা লোহার তৈরি মানুষ বলে আপনারা মনে করেন, না? আমারও একটা মন আছে, আমিও সব বুঝতে পারি।

কী?

কাছে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল, আর অতি অদ্ভুত চোখদুটো তার ছলছল করে উঠল, বললে, সরোজা আজ থেকেই এবাড়ির নয়জনের একজন হয়েছে, ফুলের নামও নিয়েছে,—এই পরিবর্তনটার কথা চিন্তা করতে করতে আপনার কথা ভাববার অবকাশ তেমন পাইনি। নইলে সকালেই যখন ভামতীর মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিলেন, তখনই অনুমতি আমার দেওয়া উচিত ছিল।

ওর চোখের দিকে একটু বিস্মিত হয়েই তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, বললাম, তাহলে অনুমতি এখন দিচ্ছ?

দিচ্ছি ভাই, কিন্তু একথাটা যেন পাঁচ কানে না যায়।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, তা যাবে না, যদি তুমি 'আপনি আজ্ঞে' ছেড়ে এরপর এই ভাই' সম্বোধনের ফলস্বরূপ 'তুমি'তে এসে সত্যিই নেমে দাঁড়াও।

হেসে বললে, আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

কাছেই একখানা মাটির ঘর। দরজার কড়া নাড়তেই একটি বুড়ি ঝি এসে দরজা খুলে দিল, তারপরে নারায়ণকে দেখে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।

ঘরের মেঝে পাকা, কিন্তু দেওয়াল মাটির, সাদা রঙ করা। মাথায় তালপাতার ঘন ছাউনি। ঘর অবশ্য মাত্র দুখানা। বাইরের ঘর, অর্থাৎ যেটাতে নটরাজন থাকে, সেটা একটা প্রকাণ্ড তক্তপোশে ভর্তি, তার উপরে পাতা বিছানা, বিছানার উপরে বই খাতাপত্র, একটা মৃদঙ্গম, গোটাকয়েক বাঁশের বাঁশি, একটা হারমোনিয়াম, এই সমস্ত শোভা পাচ্ছে নিতান্ত অগোছালো ভঙ্গিতে।

এই ঘরখানা পার হয়ে একটি দাওয়া, দাওয়ার পরে ছোট একটা বাঁধানো উঠোন, উঠোনে ঠিক ওবাড়িতে যেমন দেখছিলাম, তেমনি দুটি লৌহদণ্ডে ঝোলানো একটি দোলনা। উঠোনে বা দোলনায় কেউ কোথাও ছিল না, শুধু যে বুড়ি ঝিটি দরজা খুলে দিয়েছিল, সে এসে দাঁড়াল দাওয়ার এক পাশে। আমরা উঠোন পার হয়ে যে ঘরখানায় গিয়ে পৌঁছলাম, সেটাতেই শুয়ে ছিলেন মহিলাটি, ছোট্ট একটা খাটে। পায়ের কাছে বসে আছে ভামতী, মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন শোনবার চেষ্টা করছে সে মায়ের মুখ থেকে।

আমাদের দেখে সে মুখ ফেরাল, নারায়ণের পিছনে পিছনে যে আমি গিয়ে উপস্থিত হব, এ সে ভাবতেও পারেনি। বিপুল বিস্ময় নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে।

নারায়ণ মহিলাটির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাকল, সরস্বতী আম্মা!

ধীরে ধীরে ওর দিকে চোখে তুলে তাকালেন, ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসির আভাসও ফুটে উঠল, অতি ক্ষীণস্বরে কোনক্রমে যেন বলে উঠলেন, নারায়ণ?

হ্যাঁ, আমি। কেমন আছ?

ঠোঁটের কোণের হাসিটা এবার ফুটে উঠল স্পষ্ট হয়ে, কোনও কথা বললেন না, শুধু ম্লান একটু হেসে চোখ দুটি বুজলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণের জমা অশ্রুবিন্দু দুটি ধারা বেয়ে দুটি গালের উপরে নেমে এল।

নারায়ণ মুখ ফেরাল ভামতীর দিকে, বললে, ডাক্তার এসেছিল এ বেলা? কী বলে?

দুটি বড় বড় চোখের দৃষ্টি নারায়ণের ওপরে মুহূর্তের জন্য ফেলে চোখ দুটি নামিয়ে মুখ নত কবল সে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল নারায়ণ, বললে, বুঝেছি। আমি বড় ডাক্তারকেও আনার চেষ্টা করছি কাল সকালে। আসল কথা, ওষুধ ইনজেকশন —এসব তো পড়ছে, এখন ভালমত নার্সিং দরকার।

ভামতী বললে, আমি তো করছি সাধ্যমত।

করতেই হবে।

ভামতী বললে, মাব যতদিন কিছু না হয়, এখানেই থাকব তো?

নারায়ণ একমুহূর্তে থেমে থেকে তারপরে বললে, তাই থাকবে। তোমার ও-বাড়ির ঘরে আপাতত স্থান হয়েছে ভারাহালুর।

কেন? ভারাহালুর ঘর কী হল?

সে ঘরে পাকাপাকিভাবে এসে বাস করছে এখন সরোজা।

সরোজা!

হ্যাঁ। ঘনশ্যামদাসজী তাকে ত্যাগ করেছেন। এবং সেও তার পুরনো জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও থাকবে না।

কেন?

কেন! তাকেই একদিন জিজ্ঞাসা কোরো।

ভামতী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর হঠাৎ আমাকে নির্দেশ করে নারায়ণকে বলে উঠল, ইনি?

ইনি? আমাদের বাবুজী? নারায়ণ একমুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, তারপরে ভঙ্গি পরিবর্তন করে সহজভাবে বলে উঠল, ইনি এসেছেন তোমার মায়ের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। আমিই নিয়ে এসেছি। মনে হয়, ইনি নিয়মিত দেখাশোনা করলে রোগীর নার্সিং বা চিকিৎসা ভালই চলবে। নটরাজন এক পাগল লোক, কাজকর্মের ব্যাপারে তার ওপরে খুব নির্ভর করা যায় কী? এঁর ওপরে যথেষ্ট নির্ভর তুমি করতে পারবে আশা করি।

ভামতী মাথা নিচু করে রইল, কিছু বলল না।

ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নারায়ণ বলে উঠল, তাহলে বাবুজী, আমি চলি। তোমার ওপর এদের সব ভার দিয়ে গেলাম, মনে থাকে যেন?

বললাম, সাধ্যমত বইবার চেষ্টা করব।

নারায়ণ একটু হেসে, তারপরে সত্যিই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি ভামতীর দিকে ততটা নয়, যতটা লক্ষ্য করছিলাম তার মাকে। কপালের উপরে সিঁথির কাছে এবং কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে, দুটি চোখ বসা, গালে কপালে চোখের কোণে কুঞ্চনের রেখা, সমস্ত দেহটা কঙ্কালসার, শীতের পার্বত্য জলধারার মতো বিশীর্ণ হয়ে পড়ে আছেন যেন পাষাণের বন্ধনে, কিন্তু তবু মনে হল, অপার্থিব এক সৌন্দর্যের জ্যোতিরেখা কে যেন এঁকে রেখেছে অন্ধকার রাত্রির কৃষ্ণ পটভূমিকায়।

এ-সৌন্দর্যের বিশ্লেষণও করা যায় না, এ সৌন্দর্যের কথা বলেও বোঝানো যায় না, এ জিনিস ধরা পড়ে মাত্র অনুভূতিতে।

কিন্তু অনুভূতি? পৃথিবীর মাটি আর পাথর নিয়ে যার কারবার, তার মধ্যে অকস্মাৎ এ অপার্থিব অনুভূতির স্পর্শ জাগলই বা কেমন করে?

চকিতে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম ভামতীর দিকে। ওর চোখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর বোধহয় কাটেনি, নিষ্পলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখে চোখে মিলে যেতেই বললে, এলে কেন এখানে?

বললাম, খুবই অবাক হয়েছ, না?

নিম্নকণ্ঠে প্রায় ফিসফিস করেই বললে, নারায়ণকে জয় করলে কেমন করে, তাই ভাবছি।

তার মানে? এর মধ্যে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন আসছে কেন?

আসছে। তুমি জানো না, নারায়ণভাই কোনও মেয়ের কাছে কোনও বাইরের পুরুষকে কখনও অনর্থক মিশতে দেয় না।

বললাম, আমি কি বাইরের পুরুষ?

নও!

একটু থেমে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, হয়ত তাই। কিন্তু তা বলে—

বাধা দিয়ে বলে উঠল, কিন্তু-টিন্তু নয়, ওদের চোখে তুমি তা-ই, বাইরের লোক।

একটু হেসে বললাম, নারায়ণকে নির্বোধ মনে কোরো না, সে ঠিক বুঝেছে।

কী বললে! আর্তনাদ করে উঠল ভামতী, বুঝতে পেরেছে ওরা সব?

ওরা বলতে কী বোঝাতে চাও জানি না, তবে নারায়ণ সমস্তই আন্দাজ করতে পেরেছে।

নটরাজন?

সে হয়ত নয়, কিন্তু ক্রমশ সেও জানতে পারবে।

চুপচাপ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল ভামতী।

বললাম, ভয় পাচ্ছ কেন? জানাজানি হলেই বা!

না না, জানাজানি হওয়াটা ঠিক নয়, এর ফল ভাল হয় না।

তাহলে, কী করবে এখন?

বলে উঠল, বাধা দেব।

বললাম, কাকে? আমাকে? আমার এখানে আসাটা তুমি রোধ করতে পারবে?

হঠাৎ মুখের উপর দুটি হাত চেপে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

এ কী! কাঁদছ কেন?

বললে, আমি চাই না তুমি এখানে আসো। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে, তুমি না এলেই বা মাকে আমার দেখবে কে? নারায়ণভাই ব্যস্ত মানুষ, আর নটরাজন? সে অন্য জগতের লোক, সে খেয়ালী। নারায়ণভাই সত্যি কথাই বলেছে, তুমি ছাড়া নির্ভর করার মতো অন্য কেউ আমার নেই।

একটু থেমে তারপরে বললাম, বেশ। তোমার মায়ের ভার আমি নিলাম। আর তুমি যা ভয় করছ তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে কেউ যাতে কিছু মনে করতে না পারে, সেদিকে আমার সজাগ দৃষ্টি থাকবে।

আমার কথায় কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হল ভামতী, বললে, নারায়ণভাই যখন জানতে পেরেছে, জানুক। তার কাছ থেকে অন্য কেউ কখনও কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু অন্য কাউকে যেন আর বুঝতে দিয়ো না। তাদের নিজেদের বহু ব্যর্থতার ইতিহাস আছে, তারা নারায়ণভাইয়ের এই প্রশ্রয়ের কথাটা জানতে পারলে তারই কাছে গিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

সামান্য একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে উঠলাম, তোমার ইঙ্গিতটা কি নটরাজনকে লক্ষ্য করে?

হ্যাঁ, কতকটা তাই।

বললাম, ওরও কি আছে কোনও ব্যর্থতার ইতিহাস?

বললে, থাকতে পারে। নইলে এমন করে পড়ে আছে কেন এ পল্লীতে? কী স্বার্থ ওর এখানে?

বললাম, সেটা আমি জানি। নৃত্যশিল্পী আর গায়িকা গড়ে তুলতে চায় তোমাদের মধ্যে থেকে।

বললে, কে জানে! কিন্তু আমার মনে হয় আরও যেন কিছু আছে ওর ভেতরে। কী এক দুঃখ থেকেই বুঝি ওর এই শিল্পীমনের জন্ম! প্রতিটি সৃষ্টির মূলেই তো থাকে গভীর কোনও বেদনা। নয় কী?

বললাম, এটা তুমিই বা বুঝলে কী করে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, তা আমি পারি বুঝতে। আমার শিক্ষাগুরুই বলো, আর দীক্ষাগুরুই বলো—সে এই আমার মা।

নির্জীবের মতো বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছেন মহিলাটি। চোখদুটি বোজা, যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে মনে হল।

বললাম, চিকিৎসা তো ভালই হচ্ছে, কী বলো?

বললে, তোমার কি তাই মনে হয়? ইনজেকশন তো দিয়ে গেল, আরও নাকি দিতে হবে।

খাওয়ার ওষুধ?

এই যে শিয়রের কাছে, টেবিলটার ওপরে।

কী বলে ডাক্তার?

অবস্থা ভাল নয়। সারারাত জাগতে হবে। হাত পা ঠাণ্ডা না হয়ে আসে।

বলতে না বলতেই কেঁদে ফেলল ভামতী, মা যে আমার কতখানি, তা তোমরা বুঝবে না। সব শিখেছি, সব জেনেছি এই মায়ের কাছ থেকে। এই মা যদি—

বাধা দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলে উঠলাম, এত কাতর হোয়ো না। ঠিকমত চিকিৎসা হলে ঠিকমত শুশ্রূষা হলে—দেখতে না-দেখতেই সেরে উঠবেন উনি।

দুটি চোখ আমার উপর স্থাপিত করে বললে, আমার বড্ড ভয় করছে। আমি যে পাপ করেছি।

কী পাপ?

বললে, ঐ নবগ্রহমূর্তি বড় জাগ্রত। ওঁদের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কাউকে ফুলের নাম বলব না, কাউকে নিজের নাম বলে দেব না।

অথচ আমাকে বলে দিয়েছ, এই তো?

হ্যাঁ।

বললাম, তাতে কোনোই পাপ হয়নি।

বলছ কী তুমি!

ঠিকই বলছি। কে আমি তোমার? আমাকে না বলে তুমিই বা থাকতে কেমন করে?

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপরে স্থানকাল ভুলে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, তুমি বুঝতে পেরেছ তা?

কী জানি কী হল, আমিও কোনও উত্তর দিতে পারলাম না, মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বললে, জানো, মাকে তোমার কথা বলেছি।

ফিরলাম ওর দিকে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, কী বলেছ!

নাই বা শুনলে?

দোষই বা কী, শুনলে?

বললে, অন্তরে সাত্ত্বিকভাব, বাইরে অন্য-কিছু, এবকম 'কবি'-পুরুষের বর্ণনা মায়ের কাছ থেকেই শুনেছিলাম।

একটু হেসে ওর কাছে সরে গিয়ে বললাম, তা-ই হয়েছে। মায়ের কাছে এসব শুনে শুনে মনের মধ্যে একটা কল্পনার রাজ্য গড়ে তুলেছ, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাও সবাইকে। আর যাই করো, আমাকে কিছু কল্পনা কোরো না—ঠকবে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে, না, ঠকব না।

বলেই মায়ের শিয়রে গিয়ে বসে পড়ল, ধীরে ধীরে ওঁর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, মা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছে। তুমি এখন যাবে না?

এক মুহূর্ত ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম, যাব বলে তো আসিনি। থাকব।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর দুটি চোখ, একটু যেন ভয়, একটু যেন শঙ্কাও জেগে উঠল সে দৃষ্টিতে, বললে, তুমি থাকবে! মানে?

বললাম, বাইরের ঘরটা তো নটরাজনের। সে দেখেই বুঝেছি। তোমার ঘর কোন্‌টা?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমার আবার ঘর কোথায়? মায়ের ঘরই আমার ঘর।

রাত্রে শোবে কোথায়?

বললে, সে ওই পাশের ঘরখানায়।

তাহলেই হবে। আমি থাকব এঘরে। একজন কেউ ওঁর শিয়রে জেগে না থাকলে চলবে না।

তেমনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার দিকে, তারপর ঈষৎ চাপা কণ্ঠে বললে, রাত জাগার জন্য তো আমিই আছি, তুমি কেন?

বললাম, সঙ্গে আর একজন থাকলে দোষ কী?

ধীরে ধীরে নিচু করল মুখ, তৎক্ষণাৎই কোনও উত্তর দিল না। তারপর চোখদুটি যখন তুলে ধরল, দেখলাম, দুটি চোখই অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেছে, বললে, ভিতরে ভিতরে বুক কাঁপছে আমার দারুণ ভয়ে, যদি কিছু হয়? আমার পাপের শাস্তি যে এমনভাবে নেমে আসবে, তা আমি কখনও ভাবিনি।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, তুমি সরো। মায়ের শিয়রে বসে অনর্থক কেঁদে কেঁদে ওঁর ঘুমটা ভেঙে দিয়ো না।

হয়ত কান্নার আবেগটা শান্ত করবার জন্যই উঠে দাঁড়াল। তারপর মাকে যেন আমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে।

একটু ঝুঁকে মহিলাটির মুখের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম ভাল করে। মনে হল, এ ওঁর ঠিক ঘুম নয়, অথচ অজ্ঞানও হয়ে যাননি, কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। কপালে হাত রেখে শরীরের উত্তাপটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। জ্বর খুব বেশি হবে না, বুকের ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের ব্যথায়ও ওঁকে তেমন কাতর মনে হচ্ছে না। পায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, পাও ঠাণ্ডা নয়। অথচ এমনভাবে পড়ে আছেন কেন?

মনে একটা প্রশ্ন নিয়েই শিয়রে বসে ওঁর মেয়ের মতো হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম মাথায়। নীরবেই কাটতে লাগল সময়। কেরোসিনের উজ্জ্বল টেবিল ল্যাম্পটা ঘিরে একটা জ্যোতির্বৃত্ত, ঘরখানার বাকি অংশে আলো-আঁধার অদ্ভুত এক রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে।

কিছুক্ষণ পরেই এল ভামতী। সে দ্রুতপায়ে মায়ের বিছানা পর্যন্ত এসে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে চলার গতি দিল থামিয়ে। ইঙ্গিতে জানালাম, কাছে এসো।

বললাম, ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে নাকি? রাত এখন সাড়ে আটটা।

তাই নাকি! কিন্তু মা যে ঘুমিয়ে পড়েছে! ঘুম ভাঙানো কি উচিত হবে?

বললাম, ঘুম কী? আমার তো মনে হয় না। তুমি একবার ডাকো দেখি?

বেশিক্ষণ ডাকতে হল না ভামতীকে, ওঁর কপালে হাত রেখে মুখের কাছে ঝুঁকে বার-কয়েক ডাকতেই যেন অতি দূর থেকে সাড়া দিলেন। যেন সুদূর কোনও জগৎ থেকে উত্তরণ করলেন এই জগতে।

ভামতী ওষুধটা খাইয়ে দেবার পর ওঁর দুটি বিহ্বল দৃষ্টি যেন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হল।

কী খুঁজছ মা?

দুটি চোখ অবশেষে স্থাপিত হল আমার ওপর, ধীরে কণ্ঠে বললেন, নটরাজন?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল ওঁর মেয়ে, না মা, এই সেই বাঙালী ভদ্রলোক। তোমার সেবা করতে এসেছেন।

স্নিগ্ধতায় ভরে গেছে বৃদ্ধার দুটি চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে সস্নেহ হাসি, আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললেন, সেবা! না। কারুর সেবা আমাদের নিতে নেই। আমরা দেববধূ।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুজে গেল চোখের দুটি পাতা, ঠোঁট দুটি কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল। অবশ্য আশঙ্কার কিছু নয়, তাড়াতাড়ি হাত টেনে দেখলাম, কপালে হাত রেখে দেখলাম। অবস্থার তারতম্য বিশেষ কিছুই হয়নি, বরং জ্বরটা কমই মনে হচ্ছে।

কিন্তু এভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়া, এও যেন কেমন স্বাভাবিক ঠেকছে না।

ভামতী বললে, ঘুমিয়ে পড়ল, না?

তাই কী?

হ্যাঁ, এভাবেই তো ঘুম আসছে ওঁর।

বললাম, অবস্থা অবশ্য খারাপ নয়, কিন্তু ঘুমটা? তা হবে। হয়ত ঘুমই হবে। আমারই বোঝবার ভুল।

বলে, আর একবার পায়ে হাত দিলাম। না, পা-ও ঠাণ্ডা নয়।

ভামতী বললে, শোনো?

কী?

খেয়ে তো আসোনি।

কী আশ্চর্য, এখন কি সেকথা জিজ্ঞাসা করার সময়?

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললে, মেয়ে হয়ে জন্মেছি যে, বলো না গো? আর বলবেই বা কী, মুখ দেখেই বোঝা যায়। ওঘরে এসো তো চট করে, আসন পেতে রেখে এসেছি, দুটি মুখে দিয়ে নাও।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে, বললাম, আশ্চর্য তোমরা! আমি বলি, থাক ওসব, হোটেল থেকে এখুনি খেয়ে আসছি।

খপ করে আমার হাতটা ধরল, বললে, না। যেতে হবে না।

বললাম, আচ্ছা পাগল তো!

কেন! পাগলামিটা কিসে দেখলে?

এই একটু আগে বলেছিলে, 'তুমি যাবে না?' আর এখন না যেতে দেওয়ার মতলব!

ও কিন্তু এ পরিহাসের সুরে যোগ দিল না, মুখ নত করল, গম্ভীর ওর মুখ।

কী হল!

ধীরে ধীরে দুটি আয়ত চোখের করুণ দৃষ্টি আমার ওপর স্থাপিত করে বললে, খাবে না?

চোখের ভাষায়, গলার স্বরে এমন এক মিনতি ছিল যে, আমি আর 'না' করতে পারলাম না। বললাম, আচ্ছা, চলো। কিন্তু মায়ের কাছে থাকবে কে?

আমিই থাকব। তোমাকে বসিয়ে দিয়েই চলে আসব।

পাশের ঘর। ঘরখানা লম্বায় ও-ঘরখানারই সমান, পরিসরে ছোট। দরজার কাছেই একটা নেয়ারের সাদা ফিতে-বোনা খাটিয়া, তার পাশে কয়েকটা বাক্স ওপরে ওপরে সাজানো, আর ঘরের বিপরীত অংশ জুড়ে ঠাকুর-পূজার নানাবিধ উপকরণ। ধূপ-ধুনো একঝকে পিতলের পিলসুজের মাথায় প্রদীপ জ্বলছে, জলচৌকির উপর চতুর্ভুজ নারায়ণের বেশ বড় একটা ছবি বসানো—দেওয়ালে হেলান দেওয়া সেই ছবির ওপরে চন্দনের ফোঁটা। পায়ের কাছে ফুলের রাশি।

কী আকর্ষণে যেন এগিয়ে গিয়েছিলাম ছবিটার কাছে। দেওয়াল ভরে নানান ঠাকুর-দেবতার ছবি, নানান তীর্থেরও ছবি। কিন্তু সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল যেটা, সে হচ্ছে একজোড়া পায়ের ঘুঙুর—নারায়ণের মূর্তির পাশেই রাখা আছে ভিন্নতর ছোট্ট একটা জলচৌকির ওপরে। দেখেই বোঝা যায়, বহু পুরনো, কিন্তু যত্নের অবধি নেই। তারও ওপরে চন্দনের ফোঁটা, ফুলের অঞ্জলি। দুটো জলচৌকিতেই আলপনা আঁকা।

কতক্ষণ ধরে এই সমস্ত নিরীক্ষণ করেছিলাম মনে নেই, পিছন থেকে ভামতী এসে চুপিচুপি বললে, কী দেখছ?

বললাম, এটা যে তোমার মায়ের পূজার ঘর, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু—

থামলে কেন, বলো?

বললাম, ঠাকুরের পাশে ওই ঘুঙুরটা কিসের? ওটারও কি পুজো হয়?

বললে, হয়। আমাদের নিয়মকানুন সব তোমরা বুঝবে না।

অন্তত চেষ্টা করছি বুঝতে।

একটু ইতস্তত করে বললে, মাও ছিলেন আমার মতো দেববধূ। সে তো শুনেছ? দেবতার মন্দিরে জীবনের প্রথম নৃত্য মা করেছিল ওই ঘুঙুর পায়ে দিয়ে, সেইজন্যই ওই ঘুঙুর ওভাবে রেখে দিয়েছে মা, পুজোও করে।

জীবনের প্রথম নৃত্য মানে?

বললে, আমাদের একটি মেয়ে—ভারাহালু, সে শীগগিরই তো জীবনের প্রথম নাচ দেখাবে মন্দিরে। তোমাকে নিয়ে যাব, দেখো'খন নিজের চোখে। নাচ শেখবার পর, প্রথম নাচ দেখাতে হয় দেবতার কাছে—দেবতার মন্দিরে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। নাচটাকে আমরা মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবের একটা বিকাশ বলে মনে করি। ক্রমে ক্রমে তুমি সবই জানতে পারবে। এখন খাবে এসো।

খাওয়া দাওয়ার পর আমি স্থান নিলাম বৃদ্ধার কাছে। বললাম, তুমি শোও গিয়ে, আমি জেগে আছি।

ও বললে, তা কি হয়!

হয়। যাও দেখি তুমি।

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, বললে, সত্যিই জেগে থাকবে কেন?

এমনি। খেয়াল।

আমার মুখের দিকে তাকাল, বললে, খেয়াল নয়, আমি বুঝতে পেরেছি, কেন।

কেমন যেন অদ্ভুত গম্ভীর আর কঠিন দেখাল ওর মুখ। আশ্চর্য হয়ে বললাম, বলতে চাও কী তুমি?

নির্মম কণ্ঠে বললে, আজ ও-বাড়ি যাওনি?

আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে হতবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছি লক্ষ্য করে বললে, অন্য মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে এলেও তো পারতে!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ, তা পারতাম। কিন্তু পারলাম না।

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত। মায়ের কাছে বসে ও। শিয়রে আমি। এক সময় বলে উঠল, মাকে খাইয়ে দিই এবার?

বললাম, হ্যাঁ, তা দেওয়া উচিত। কিন্তু এমন নিঃঝুমের মতো পড়ে আছেন কেন বুঝছি না।

মাকে ডেকে ও বোধহয় বার্লি খাওয়াল একবাটি। এবারেও চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজতে খুঁজতে আমার ওপর দৃষ্টি স্থাপিত করলেন, নটরাজন?

ভামতী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সে এখনও আসেনি। এ সেই বাবুজী।

বাবুজী! বৃদ্ধা একটু হাসলেন, কোমল কণ্ঠে বললেন, আমি ভাল আছি। রাত অনেক, না? তোমরা শুয়ে পড়োগে।

পরক্ষণেই বাইরে একটা কলরব শোনা গেল, দাওয়ায় শুয়ে থাকা সেই ঝিটির কণ্ঠস্বর তারপরে খিল খোলার শব্দ, কয়েক মুহূর্ত পরেই উঠোন পার হয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল নটরাজন, আমাকে দেখে বোধহয় একটু অবাকই হয়ে গেল সে, বললে, যাননি বাবুজী?

একটু হেসে বললাম, না তাড়ালে যাব না। থাকব।

ছি ছি, এ কী বলছেন! এ আমাদের সৌভাগ্য।

ভামতী বলে উঠল, খাওয়া হয়েছে?

নটরাজন বললে, হ্যাঁ। ও বাড়িতে। সরস্বতী আম্মা কেমন?

ততক্ষণে আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেছেন বৃদ্ধা, নটরাজন কাছে এসে ওঁকে ভাল করে দেখল, তারপরে বললে, আপনারা রইলেন, তেমন কিছু বুঝলে আমাকে ডাকবেন। কেমন?

আচ্ছা।

যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল নটরাজন।

তারপরে কাটতে লাগল সময়। মিনিটের পর মিনিট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রহরের পর প্রহর।

ভামতী মায়ের পায়ের কাছে ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছিল, একসময় বললে, ঘুম পাচ্ছে না তোমার?

না।

শোবে না?

না।

না আবার কী? ওঘরে বিছানা করেছি। শোও গিয়ে।

না।

সোজা হয়ে উঠে বসল এবার, বললে, মা তো ঘুমুচ্ছে। ঘরে ঝিও তো রয়েছে। তুমি ঘুমোও গিয়ে।

ইতিমধ্যে অবশ্য সেই বুড়ি ঝিটি এসে ঘরের একপাশে শতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়েছিল, সেও আচ্ছন্ন নিবিড় ঘুমে। বললাম, বরং তুমি গিয়ে ঘুমোও।

এবং এরই উত্তরে হঠাৎ সে বলে বসল অদ্ভুত একটা কথা, বললে, তুমি আগে যাও বিছানায়, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

তার মানে! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই ধরতে পারলাম ওর ইঙ্গিত, বুঝতে পারলাম কী ভয়ানক কথা ও বলতে চায়!

মুহূর্তে যেন সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় ঘিনঘিন করে উঠল! কী জঘন্য পশুই না ও ভেবেছে আমাকে। মনে হল, এখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাই।

পরক্ষণেই মনে হল, এ চিন্তা করে অন্যায় ও কিছু করেনি। ওর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্র কী? হঠাৎ কী-এক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যে-ভাবে প্রথম গিয়েছিলাম ওর ঘরে, তাতে করে আমাকে নিছক দেহবাদী ছাড়া সত্যি সত্যি আর কী ভাবা উচিত ওর পক্ষে? অন্তত নিজের ওপরেও আমার সেই ধারণা। কিন্তু, ও-ই আমার মনে জাগিয়ে দিয়েছে অন্য এক ভাবের প্রবাহ, যাতে অনুক্ষণ অবগাহন করে চলেছি, আর মনে হচ্ছে, এই যা দেখছি. এই যা করছি, এই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন, এই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা, এর বাইরেও এক রসের জগৎ আছে, এক আনন্দের বিশ্ব বিদ্যমান।

অবশ্য, কে জানে, এ মাত্র কল্পনাবিলাস কি না, ওরও—আমারও?

তাই ওর কথার উত্তরে একটু হেসেই বললাম, বেশ। তুমি শোও গিয়ে আগে। আমিই বরং যাচ্ছি একটু পরে।

সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল ভামতী, দুটি ঘুম-ঘুম চোখের দৃষ্টি আমার ওপর স্থাপিত করে বলল, দেরি কোরো না, ভোরে উঠতে হবে আমাকে।

চলে গেল পাশের ঘরে।

আমি কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম না এ পরিস্থিতির জন্য।

প্রথমে মনে একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণা এলেও পরে মনে হল ক্ষতি কি? বৃদ্ধা অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন, রাত্রিও শেষ প্রহরে এসে পৌঁছেছে, অখণ্ড নিস্তব্ধতা চারিদিকে, এ সময় মূর্তিমান পাপের মতো ভামতীর কাছে গেলে, আর যাই হোক, অন্তত ভামতীর অনুমানেব যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।

কবি! বিশ্বরহস্যের সর্বত্র যে চিরসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করে, সে-ই নাকি কবি! আমি যে ওর অনুমান মতো সত্যিই 'কবি' নই, তার প্রমাণ দেব ঠিক এই মুহূর্তে ওর কাছে গিয়ে কামনার বহ্নিতে বহ্নিমান হয়ে। পড়ে থাক রোগিণী এক পাশে, দূরে থাক সমস্ত সুকুমাব অনুভূতি। বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে, তাঁর ওই আচ্ছন্নভাব দেখে যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে মন নিবিড় হয়ে উঠছিল, তা থেকে জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

জানলার বাইরে ঝাঁকড়া-মাথা একটা গাছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা

একটা হাওয়া ভেসে আসছে। জানলায় ঝুঁকে হাওয়ার কাছে মাথাটা রেখে একটু যেন স্নিগ্ধ হল মন, তারপরে ধীরে ধীরে গেলাম পাশের ঘরে ভামতীর কাছে।

দেবমূর্তির কাছে রাখা সেই প্রদীপটি কখন নিভে গেছে, সেই নেয়ারের খাটটায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে, চুপচাপ শুয়ে আছে ভামতী, ঘুমের ঘোরে বেশবাস এলোমেলো, বুকের আঁচলটা লুটিয়ে পড়ে আছে মাটিতে!

কয়েক মুহূর্ত ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে এল অন্য এক ভাব।

মনে হল, নিশীথ রাত্রে বিশ্বসংসার যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তারও এক রূপ ফুটে ওঠে। সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। এ যেন ঘুম নয়, কোনও এক কৌতুকময়ী যাদুকরী যেন তার মায়ার জাল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে সবাইকে।

পাশের ঘর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যেটুকু আলো এসে পড়েছে এই ঘরে, সেই আবছা আলোতেই ভামতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, কী নিশ্চিন্ত নির্ভাবনাতেই না ও এসে ঘুমিয়ে পড়তে পেরেছে!

কিন্তু আশ্চর্য ওর আহ্বান! আমাকে যে অমন করে ডেকে এল, সে কি এই ভামতী? বিশ্বাস হয় না। যে ঘুমিয়ে আছে, সে আর-এক মেয়ে, আর-এক জগতের মেয়ে, আর এক অনুভূতির মেয়ে। একে ছোঁয়াও যায় না, বোঝাও যায় না।

ধীরে ধীরে ফিরে এলাম ওর কাছ থেকে। ফিরে এলাম ওর মায়ের কাছে। ঠিক তেমনি একই ভাবে পড়ে আছেন বিছানায়, আলো-কমানো বাতিটার স্বল্পালোক আলো-আঁধারে অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করেছে।

আমার চোখে মৃদুমাত্র ঘুমের ছোঁওয়া নেই, কী এক অজানা অনুভূতির আবেশে দেহমন আচ্ছন্ন। মহিলাটির শিয়রের কাছে যে খোলা জানলাটি দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস আসছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে জনপদপ্রান্তের বিস্তৃত পর্বতমালা চোখে পড়ল। রাত গভীর বলে রাস্তার আলো বোধহয় 'মনুষ্যপালসমিতি' বা 'মিউনিসিপ্যালিটি'র লোকেরা নিভিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, অরণ্যচারী হস্তীযূথের মতোই দেখাচ্ছিল পাহাড়গুলোকে। মনে হচ্ছিল, বহু মত্ত মাতঙ্গ যেন একসঙ্গে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই এক কোণে, পর্বতচূড়ার অনেক নিচে, বলা যায় পাহাড়ের কোলে, সাদা-সাদা দেখাচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটা। বোধহয় এখনও আলো জ্বলছে মন্দিরে, কান পেতে শুনলে, বাতাসে কেঁপে কেঁপে ভেসে-আসা কোনও সঙ্গীত-মূর্ছনার রেশও অনুভব করা যায়। নিশীথ রাত্রে হয়ত নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীতের আরতি করছে দেবদাসীরা। আর যারা দেববধূ, তারা নেই মন্দিরে, একজন তো ঘুমিয়েই আছে পাশের ঘরে।

কী একটা অস্ফুট শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি জানলা ছেড়ে ছুটে এলাম মহিলাটির কাছে। বোধহয় ঘুম ভেঙেছে। হাত দুটি ওঠাবার চেষ্টা করছেন, ঠিক পারছেন না, ভয়ানক কাঁপছে দুটি হাত। বালিশ থেকে মাথাটাও ওঠাবার চেষ্টা করছেন, তাও পারছেন না, চোখদুটি বিস্ফারিত।

আমি চট করে ভামতীকে ডেকে আনব কি না ভাবছি, হঠাৎ ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বিস্ফারিত সেই চোখের দৃষ্টিতে ভয়ও নেই, আতঙ্কও নেই, অদ্ভুত এক আনন্দের জ্যোতিতে সমস্ত মুখখানা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে! কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে। মনে হল ক্ষীণকণ্ঠে কী যেন বলছেনও তিনি।

তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম মেঝের ওপরে। খাটের কিনার ধরে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ওঁর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, চোখের দৃষ্টি শূন্যে কী এক অশরীরী উপস্থিতির দিকে স্থিরনিবদ্ধ, অপ্রত্যাশিত আনন্দের আবেগে বুঝি ধারাও নেমেছে চক্ষু বেয়ে, বলে চলেছেন, এসেছ! আমাকে নাও সঙ্গে করে, আমার হাত ধরে নাও।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, মনে হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু উনি যেন ঠিক দেখতে পেয়েছেন কাউকে ওঁর সামনে।

খুব মৃদুকণ্ঠে বলে চলেছেন, এক হাতে তোমার গদা, অন্য দুই হাতে শঙ্খ আর চক্র। চতুর্থ যে হাতটিতে তোমার পদ্ম, সেই হাতটি ধরে আমাকে তুলে নাও তোমার কাছে।

বার বার উনি বলতে লাগলেন এই কথাটা। জ্বরের ঘোরে ভুল-বকা ব্যাপারটা আমার দেখা আছে, এটা ঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না। জ্বরও তো বেশি নয়, অথচ—

অথচ ব্যাপারটা যে কী, তা বুঝেও বুঝতে পারছিলাম না। ভক্তিমতী নারী চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন পেয়েছেন, এ-কথাটা সেই মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত, সহজ হয়ে যেত ব্যাপারটা। কিন্তু এ-যুগের লোক আমি, এ যুগের বস্তুবাদের ভাবধারায় লালিত, চট করে 'অলৌকিক' বলে মনে করব কেন সব-কিছুকে?

উনি দেখছেন, কিন্তু আমি তো দেখছি না কিছুই! তবে এ কি কোনও মানসিক বিকার? তাও মেনে নিতে মন রাজী হচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে কেমন যেন একটা ভয় হতে লাগল মনে। উনি বার বার বলছেন, তুমি এসো, নাও আমাকে।

আর আমার মনের গহন-কন্দরে কী অদ্ভুত যেন এক সুর উঠছে, বলছে, আমাকেও নাও। গ্রহণ করো আমাকে রসের রাজ্যে।

যেন হাহাকার করে বলতে চায় আমারই ভিতরকার আর-এক মন, আমি ভূতত্ত্ববিদ, সম্পূর্ণ বস্তুবাদী সাধারণ একটি লোক, কিন্তু আমাকে তুমি পরিবর্তিত করে দাও। আমি তোমার এ সুন্দর রাজ্যের সুন্দর কণাটুকুও যেন দেখতে পারি! 'কবি' করে দাও তুমি আমাকে।

কবি!

কথাটা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমক দিতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। অদ্ভুত এক আতঙ্কের অনুভূতি এল মনে। বৃদ্ধাটির ব্যাপারে ততটা নয়, যতটা নিজের নিভৃত অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনে।

একরকম ছুটেই চলে এলাম পাশের ঘরে। অন্য কিছু ভাববার অবকাশ ছিল না, দরজার কাছ থেকে ডাকতে লাগলাম, ভামতী! ভামতী!

সাড়া নেই। ভিতরে গিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সেই আলুলায়িতকুন্তলা ঘুমন্ত নারী-শরীরের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে ওর মাথায় হাত দিয়ে ডেকে উঠলাম, ভামতী!

উঁ! বলেই ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরল।

বাহুমূলে নাড়া দিয়ে ডাকতে লাগলাম, এই, শীগগির ওঠো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধড়মড় করে উঠে বসল ভামতী, কী। কী হয়েছে?

তোমার মা—

মা! কী হয়েছে মায়ের?

বলতে-না-বলতেই কোনক্রমে আঁচলটা সামলে তাড়াতাড়ি এ-ঘরে ছুটে এল ভামতী। টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা উজ্জ্বল করে দিয়ে আমিও ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মা! মা!

যেন অঘোর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করলেন বৃদ্ধা, ভামতীকে দেখে অপূর্ব স্নেহের ভাবে ভরে গেছে মুখ, বললেন, কী মা ভামতী?

যেন অতি স্বাভাবিক হয়ে গেছেন তিনি, ব্যাধির কোনও গ্লানি, কোনও বিকার তাঁকে যেন আর ছুঁয়ে নেই।

ভালো আছ?

ঠোঁটের কোণে তেমনি প্রসন্ন হাসি, বললেন, আছি।

কষ্ট হচ্ছে কোনও?

না।

আমার দিকে চোখ ফেরাল ভামতী, চোখের ভাষায় নীরবে প্রশ্ন করল, কী? ভয় পেয়েছিলে কেন?

বৃদ্ধা জল চাইলেন এ সময়।

ভামতী ওঁকে জল খাইয়ে ওঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগল নীরবে। আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, ওঁর মেয়ের সাহায্যে থার্মোমিটার লাগিয়ে শারীরিক উত্তাপ নিলাম, সামান্য একটু জ্বর রয়েছে মাত্র। বুকে বেদনা শ্বাসকষ্ট যেন কিছুই নেই। ধীর ক্ষীণকণ্ঠে মেয়ের সঙ্গে সহজভাবেই কথা বলে যাচ্ছেন তিনি।

একসময় মেয়ে ডাকল আমাকে, বললে, এসো, মা ডাকছে।

আমি খুব কাছে এসে বসতেই সস্নেহে তাকালেন আমার দিকে, একখানা হাত উঠিয়ে আমার মাথায় ছুঁইয়ে আশীর্বাদও করলেন মনে হল যেন। বললেন, ভাব আছে তোমার মধ্যে। ভাবী হয়ো।

কথাটার তাৎপর্য সেদিন বুঝিনি। কিন্তু বৃদ্ধার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম।

মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। আলোটা চোখে না লাগে এইজন্য কমিয়ে দিয়ে ঘরের অপর জানলাটির কাছে একটা ডেকচেয়ার পেতে দিল ভামতী, বললে, এসো, এখানে বসবে এসো।

নিজে একটা মোড়া টেনে নিয়ে কাছেই বসল। বললে, রাত আর বেশি নেই, বাকি রাতটা গল্প করে কাটাবে, না, ঘুমোবে? আমি বলি, ঘুমিয়ে নাও বরং।

ডেকচেয়ারে এলিয়ে দিয়েছি ততক্ষণে নিজেকে। ওর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ।

আমার বাহুতে একটা নাড়া দিয়ে বললে, ও ঘরে চলো। ঘুমোবে।

সংক্ষেপে বললাম, ঘুম আসবে না।

অর্থাৎ গল্প করবে, এই তো? বুঝেছি।

আমি চুপ করে রইলাম। ও একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলতে শুরু করল, তখন আমার কাছে এলে না কেন, ও-ঘরে?

চুপ করেই আছি।

ও বললে, জানি আমি ডাকলেও তুমি তখন আসতে পারতে না। আমি জেনেশুনেই ডেকেছিলাম। অন্য লোক হলে ডাকার অপেক্ষাও করত না। আমার মায়ের অসুখ হয়েছে, তাতে তার কী? সে তার ভোগের কড়ি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ছাড়ত।

বাজে কথা বোলো না। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠলাম, কোনও মানুষই তা পারে না।

বোধহয় একটু হাসল, বললে, মানুষের তুমি কতটুকু জানো? তুমি তো অ-মানুষ!

চুপ করে রইলাম।

একটু থেমে আবার বললে, রাগ করেছ?

সবিস্ময়ে বললাম, কেন?

তোমাকে অ-মানুষ বলেছি।

তাতে রাগ করার কী আছে?

নেই!

বলে উঠলাম, থাক এসব কথা। কেন তোমার ঘুম ভাঙালাম জিজ্ঞাসা করলে না তো?

জিজ্ঞাসা কী আর করব! ভয় পেয়েছিলে।

বললাম, হ্যাঁ, তা পেয়েছিলাম। কেন, শুনবে?

ওকে বললাম ওর মায়ের সব কথা। সেই বার বার 'আমাকে নেবে? নাও।' প্রভৃতি কথা।

শুনতে শুনতে দুটি চোখ ওর ভরে এল জলে, বললে, সত্যি বলছ!

মিথ্যে বলব কেন?

চোখ মুছে বললে, না, মিথ্যে বলবার লোক তুমি নও।

বলেই তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেল মায়ের কাছে, বললে, মা!

আমিও এসেছিলাম পিছু পিছু। বললাম, ঘুমোচ্ছেন। ডাকছ কেন?

ওর চোখের ধারা আর বাঁধ মানল না, আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলতে লাগল, মা পেয়ে গেছে।

কী?

মেয়ে-মানুষের যা পাবার শ্রেষ্ঠ জিনিস।

ওকে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে এলাম ওর আসনে, বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলাম পাশে। ডেকচেয়ারের হাতলে দু হাত রেখে মাথাটা এলিয়ে দিল তার ওপরে, বললে, তোমায় তো বলেছি, দেববধূ ছিল মা। না, দেবদাসী নয়, দেববধূ। দেবতার প্রতি আমাদের দাসীর ভাব নয়, দয়িতার ভাব, প্রেমিকার ভাব।

একটু ভেবে আবার বললে, কত রূপেই না তিনি আসছেন আমার জীবনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি আমি পাব? পাব না।

কেন?

ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, আমি যে পাপ করেছি!

ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। ওর কান্না থামাই-ই বা কী করে, অথবা ওকে সান্ত্বনাই বা দিই কী ভাষায়? এই সব দয়িতা-প্রেমিকা, হেন-তেন—এসবের ব্যাখ্যা আমার জানা নেই, বিশ্বাসও তেমন নেই। 'দেবদাসী' আর 'দেববধূ'—এদের মধ্যে আসল তফাতটা কোথায়, সেটা ভালভাবে জানলেও না হয় মনোরম ভাষাবিস্তারের একটা প্রয়াস করে দেখতাম।

এই সব ভাবছি, হঠাৎ কানে এল দূরাগত সুরের গুঞ্জনধ্বনি, দক্ষিণদেশীয় গায়কের কণ্ঠে হিন্দিগানের উৎসারণ, জাগো মোহন প্যারে, সঁবরি সুরত মোরে মন ভাওয়, সুন্দর লাল হমারে—

মনে মনে চমকেই উঠলাম বলা যায়। ভোর হয়ে এসেছে তাহলে? গানের সুরে এই

ভোর হওয়ারই বার্তা শোনাচ্ছে নটরাজন। কিন্তু কাকে সে শোনাতে চায়?

আরও কাছে আসতে লাগল গানের সুর। সুর কানে যেতে যেন চিত্রার্পিতের মতো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল ভামতী, হঠাৎ চমকে কাছে সরে এসে ফিসফিসিয়ে বললে, ওই আসছে। যদি জিজ্ঞাসা করে তো বোলো, আমি পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছি।

বলেই আর দাঁড়াল না, ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে। আর আমি ব্যাপারটাকে ভাল করে অনুধাবন করার আগেই এসে পড়ল নটরাজন।

কাছে এসে বৃদ্ধার দিকে ঝুঁকে, তারপরে আমার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন ইনি?

ভালই তো মনে হয়।

আমার দিকে তাকিয়ে বললে, সারা রাত জেগেছেন তো?

বললাম, হ্যাঁ, তা জাগতে হয়েছে।

একটু অপ্রস্তুতের মতোই বললে, ভেবেছিলাম উঠে আসব, এসে আপনাকে একটু রেহাই দেব। কিন্তু গানের সুরে সুরে এমন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম যে, রাত্রে আর আসর ছেড়ে উঠতেই পারলাম না। এই আসছি। নারায়ণও সমানে জেগেছে সারা রাত আমার সঙ্গে।

নারায়ণ!

হ্যাঁ। কী যে হল, একা ঘরে বসে আমি রেওয়াজ করি তো, ও এসে শুয়ে থাকে ওর বিছানায়। আজ দেখলাম অদ্ভুত ওর মনের অবস্থা! বললে, ঘুমোব না নটরাজন, সারা রাত তোমার গান শুনব। হ্যাঁ, তা গানের পর গান শুনে গেছে। আমিও শ্রোতা পেয়ে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, শ্রোতা থাকে না বুঝি?

একটু হেসে বললে, প্রথম রাত্রিতে দুটি-একটি মেয়ে এসে বসে, কিন্তু ওদেরই বা অবকাশ কই? তাই একাই বসে বসে সুর তুলি। নারায়ণ কাল আমার এক পুরনো প্রিয় গান মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। বলল, 'সেই গানটা গাও নটরাজন। সেই কৃষ্ণচূড়া ফুলের গান।' হ্যাঁ বাবুজী, আমাদের দক্ষিণদেশীয় প্রাচীন কবির এক গান আছে, যার ভাবার্থ হল—দেবতার মাথার ফুল কৃষ্ণচূড়া, তাকে মাথায় রেখো, কখনও পায়ে ফেলে দলে-পিষে নষ্ট কোরো না।

কী জানি কী হল মনের মধ্যে, একটু হেসে হালকা সুরেই বলে উঠলাম, শেষকালে ফুলের গান?

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে চকিতে তাকাল নটরাজন, তারপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হ্যাঁ ফুলের গান। ও বাড়িতে ফুলের নামই যখন সব, তখন ফুলের গানে আর আশ্চর্যের কথা কী?

স্থান কাল পাত্র অনুসারে কোনও প্রয়োজনই ছিল না ও-প্রসঙ্গ তোলার। তবু, কী আশ্চর্য, আমার মতো স্থূল স্বভাবের বাস্তববাদী লোকের মনও অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। মনের মধ্যে কী একটা সন্দেহ মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মতোই রেখায়িত হয়ে উঠল। বললাম, কাল কারও নাম ছিল নাকি কৃষ্ণচূড়া ফুল?

নিদারুণ চমকে যেন কেঁপে উঠল নটরাজন, তারপরে সবিস্ময়ে বলে উঠল, কী বললেন বাবুজী?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম, না না, কিছু মনে কোরো না, এমনিই বললাম কথাটা, মানে হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটু হেসে জানলার কাছে সরে গিয়ে ঈষৎ চাপাস্বরে নটরাজন বললে, সত্যি কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়েছে আপনার। আপনি হয়ত ওদের সব নিয়ম-কানুন জানেন না। আসল কথা, কাল ভোরে এসে সবে পৌঁছেছিল সরোজা, অথচ কালই সে মন্দিরের সরোবরে স্নান করে পুজো দিয়ে ওদের যা করণীয়, তা করবার ব্রত গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ নিয়েছিল ফুলের নাম। আর সেই ফুলের নাম হচ্ছে কৃষ্ণচূড়া। নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি করে জানলে? তোমার তো জানবার কথা নয়। না, সত্যিই আমি জানতাম না, ঘটনাচক্রে জেনে ফেলেছিলাম। আমি তখন নারায়ণের কাছে বাইরের ঘরে বসে। কে একজন এসে কৃষ্ণচূড়ার নাম বলে ভেতরে চলে গেল। লাল খেরো-বাঁধানো খাতাটায় সেই নামটা লাল কালি দিয়ে কাটতে গিয়ে রীতিমত হাত কাঁপছিল নারায়ণের। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল তোমার? আর আশ্চর্য, কেমন যেন ধরা গলায় সে বললে, কিছু না। আমি ঝুঁকে পড়ে নামটা পড়তে গিয়ে দেখি, কৃষ্ণচূড়া হচ্ছে সরোজা।

বললাম, তা সরোজার ব্যাপারে নারায়ণের এমন হল কেন?

নটরাজন বললে, সে এক অদ্ভুত ঘটনা। পরে বলবো'খন আপনাকে। কিন্তু ভোর হয়েছে, ওঁর মুখে একটু গঙ্গাজল দিলে ভাল হত।

কার মুখে?

সরস্বতী আম্মার।

বলতে বলতে বৃদ্ধার কাছে এসে দাঁড়াল নটরাজন। তেমনি নিঃঝুমের মতোই এক ভাবে পড়ে আছেন। ওঁর কপালে আর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কী যেন দেখছিল নটরাজন, বললে, আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? মহাযাত্রা ওঁর আসন্ন।

কী বলছ তুমি!

একটা নিঃশ্বাস ফেলে নটরাজন বললে, হ্যাঁ, তাই আমার মন বলছে। তাই গঙ্গাজল মুখে দিতে চাই। ওঁর মেয়ের মতো উনিও দেববধূ ছিলেন, ওঁরও সেই ছোট বয়সে দেবতার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল।

কিন্তু পাবে কোথায় গঙ্গাজল?

নটরাজন বললে, শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের পাশে যে ঝিলটি আছে, লোকের বিশ্বাস, তাতে গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতীর অন্তঃসলিলা ধারা এসে মিশেছে। দাঁড়ান, আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।

অন্তবাল থেকে সবই শুনছিল ভামতী। পাশেব ঘর থেকে উন্মত্তেব মতো ছুটে এল সে, নটরাজনকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, ঠিক বলছ, মা আর বাঁচবে না?

ওর কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকাল নটরাজন, বললে, আপনি এখন ওদের ছেড়ে যেন যাবেন না বাবুজী, আমি আসছি।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, আমি বলি কী, তুমি বরং ডাক্তারকে খবব দিয়ে এসো।

বললে, বেশ। পথে ডাক্তারের বাড়ি পড়বে, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চলে গেল। তবে কি সত্যিই বৃদ্ধার মহাযাত্রা আসন্ন? ভামতী ওঁকে আকুল হয়ে ডাকতে লাগল—মা—মা!

চোখ তুলে প্রসন্ন দৃষ্টিতেই তাকালেন মেয়ের দিকে, কী যেন বলবারও চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুখে ফুটল না কোনও কথা।

ঘরে আর কেউ নেই। বৃদ্ধা আর ভামতী। কী এক অদৃশ্য টানে ওঁর শিয়রের কাছে

বসে পড়লাম এক সময়ে, ঠাণ্ডা কপালটায় ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিতে লাগলাম হাত।

বাকরোধ হয়ে গেলেও জ্ঞান তখনও হারান নি, চোখ ঘুরিয়ে একবার যেন দেখবার চেষ্টা করলেন আমাকে।

বললাম, কেমন বোধ করছেন?

বোধহয় কানেও গেল আমার কথা, ডান হাতখানা কোনক্রমে তুলে নিয়ে এলেন নিজের গলার কাছে, যেন বলতে চাইলেন, কী হল আমার! গলার স্বর ফুটছে না কেন?

বললাম, ভাববেন না, এখুনি ডাক্তার এসে পড়বে।

নিস্তেজের মত পড়ে রইলেন বৃদ্ধা, ভামতী ওঁর পায়ের ওপর মুখ রেখে কাঁদছিল, একসময় মুখ তুলে তাকাল মায়ের দিকে, তারপর আমাকে উদ্দেশ করেই বলে উঠল, দেখলে তো? আমার পাপের ফল! নবগ্রহমূর্তিকে লুকিয়ে কিছু করতে ভয় করে, তবু আমি করেছি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু তার ফল যাবে কোথায়? মাকে যে চলেই যেতে হবে।

মৃদুকণ্ঠে বললাম, আবার বলছি, তোমাদের এসব সংস্কার আমি মানি না। আর তাছাড়া, ডাক্তার আসুন, কিছু যে একটা ঘটবেই, এর কী মানে আছে?

বললে, আমি জানি। মা আব থাকবে না।

মহিলাটি আমার সত্যিই কেউ নন, কিন্তু ভামতীদের এই যে সংস্কারাচ্ছন্ন ভাব, এই যে অন্ধ বিশ্বাস, এর বিরুদ্ধে আমার মনটা যেন রুখে দাঁড়াল। এই যে ভামতী বার বার বলছে আমাকে গোপনে ওর নাম বলে দেওয়া ওর কাছে পাপ, মনে হতে লাগল, তার সঙ্গে আমারও গুরুতর কোনো অপরাধ জড়িয়ে আছে। আর এটা যতই মনে হতে লাগল, ততই মনে হল, জয়ী আমাকে হতেই হবে, বাঁচাতেই হবে মহিলাটিকে।

ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিয়ে গেলেন, বোধহয় কোরামিন, হার্টের জন্য। বললাম, কেমন বুঝছেন?

ডাক্তার যা বললেন তাতে বুঝলাম, অবস্থাটা খুবই খারাপ। তবে উপযুক্ত শুশ্রূষা অনেক সময় অসাধ্যও সাধন করতে পারে।

দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় মনকে বাঁধলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, অসাধ্যই সাধন করবো। রইল পড়ে আমার কাজ, রইল পড়ে ঘনশ্যামদাসজী, তাঁর ছেলে রামদাস আর পান্থলু। আমি এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়ব না, যতক্ষণ না সেরে ওঠেন ইনি।

পরদিন এসেও ছিল পান্থলু আমার খোঁজে, বললে, রামদাসজী এসেছেন। আপনার খোঁজ করছেন।

বললাম, করুন খোঁজ। আমি এখন যেতে পারব না।

তারও পরের দিন। পান্থলু এসে বললে, আজও যাবেন না?

না। তাঁর দরকার, তিনি আসুন।

পান্থলু বললে, কে? রামদাসজী? তিনি আসবেন না। কিন্তু শেঠজী যে চলে যাচ্ছেন!

তাই নাকি! বললাম, তা হোক, তবু যাবো না। বরং তাঁকে আসতে বোলো।

পান্থলু তাড়াতাড়ি দু কানে দুটি আঙুল ছুঁয়ে বলে উঠল, সর্বনাশ! ছেলে যে সব শুনেছে! বাবাকে কি আর এদিকে আসতে দিতে পারে!

পরের দিন অবশ্য পান্থলু আর আসেনি। কিন্তু আমার ব্যাপার দেখে বোধহয় চমৎকৃতই হয়েছিল নারায়ণ আর নটরাজন। এই চারটে দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে

ডুবিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে। এ অঞ্চলে সব থেকে বড় ডাক্তারকেই ডেকে এনেছিলাম নিজে গিয়ে নারায়ণের সাহায্যে। তাঁর সঙ্গে অনুক্ষণ যোগাযোগ রাখা, রোগীর শিয়রে বসে দিন-রাত সেবা করা!

আচ্ছন্নের মতো সর্বক্ষণ সরস্বতী আম্মা পড়ে আছেন বটে, কিন্তু জ্ঞান হারান নি একেবারে। তাই আমি কে, আমার সঠিক পরিচয় না জানলেও, আমার সেবার মর্মটা বুঝতেন। এমন হল, নিজের মেয়ের থেকেও আমাকে যেন খুঁজতেন বেশি।

অভিভূত হয়ে নারায়ণ একদিন আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছিল মনে আছে, বলেছিল, তুমি কে ভাই? এমনটি কখনও দেখিনি।

আমি একটু হেসে বলেছিলাম, ভাই বলে ডেকেছ, মনে থাকে যেন!

হ্যাঁ। আজ থেকে তুমি আমার ভাই, আমার পরমাত্মীয়।

নটরাজন একান্তে একদিন ডেকে নিয়ে বললে, আপনার সেবার জনাই এখনও বেঁচে আছেন! বাস্তবিকই, আপনার ভালবাসাকে আজকের দিকে প্রণাম জানাতে ইচ্ছে করে।

ওদের সেই চৌকো উঠোনের এক কোণে বসেছিলাম দুজন। ওর কথায় একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম, বললাম, এর মধ্যে ভালবাসাটা আবার দেখলে কোথায় নটরাজন? মানুষ মানুষের জন্য যদি এটুকু না করে, তো, চলবে কী করে?

নটরাজন একটু হাসল, বললে, আর আপনি করে বলব না—তুমি। দেখো, এ ক'দিনে আমাদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা হয়েছে, তা তো অস্বীকার করতে পারবে না? সেই অধিকারেই বলছি, দেখবার চোখ আমাদের দিয়েছেন ভগবান, মনও দিয়েছেন অনুভব করবার।

বললাম, ভূমিকা রেখে দাও, বলতে চাও কী?

বললে, শুনবে বন্ধু? আমিও খেয়ালের বশে একদিন এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। আমিও বিদেশী। তামিলনাদের লোক। আমিও তোমার মতো এমনি করে একটি মেয়ের মায়ায় পড়ে গিয়েছিলাম।

বটে? কে সে?

অল্প একটু হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নটরাজন বললে, 'সে' তো এখানে বড় নয়, বড় হচ্ছে, 'তাকে' উপলক্ষ করে আত্মবিকাশ। সেটা আগে শোনো?

বলো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেমে রইল নটরাজন, যেন ফেলে-আসা সেই দিনগুলির স্মৃতির প্রবাহে অবগাহন করল কয়েক মুহূর্ত, তারপরে সুপ্তোত্থিতের মতোই বলে উঠল, জানো ভাই, আশ্চর্য এই ওদের রীতি-নীতি। ঐ যে ফুলের নাম করার নিয়ম, ওর বোধহয় উদ্দেশ্যই হচ্ছে, মনের টানকে বাড়তে না দেওয়া। কিন্তু মনের ধর্মে আমি শিল্পী, আমি ভাবুকতায় আচ্ছন্ন, আমার মন তাতে কিছুতেই মানল না।

তারপর?

বললে, ওই সরোজাকে নিয়ে ঘনশ্যামদাসবাবুর কথা তো শুনেছ। ওঁর ছিল অগাধ পয়সা, তাই বাড়ি-ঘর-দোর সব কিনে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারলেন তিনি। মেয়েটিকেই তিনি নিয়ে যেতে পারলেন। কিন্তু আমরা?

প্রশ্ন করলাম, বলবে না, কে সেই মেয়েটি? এই ন'জনের মধ্যে একজনই তো হবে?

ওকে এই প্রশ্ন করলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ভামতীর কথা। ভামতীও

একদিন ওর সম্বন্ধে এমনি এক সন্দেহের কথাই বলেছিল, নিশ্চয়ই এখানে কেউ আছে ওর, নইলে এমন করে এখানে ও থাকতে পারত না।

আমার কথায় আবার একটু হাসল নটরাজন, বললে, বার বার একই কথা জানতে চেয়ো না। কী হবে নাম দিয়ে? যদিও আমার সব অনুপ্রেরণাই তাকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে, তবু আজ সে আমার কাছে 'একা' একটি মানুষ নয়, এখানকার সবার ওপরই আজ আমার সমান স্নেহ। আমার 'স্নেহ' শব্দটা তুমি লক্ষ্য করো। আমি নারায়ণের ওখানে যাই শিক্ষক হিসেবে, অতিথিরূপে কখনও নয়। সে প্রয়োজনও কখনও বোধ করি না।

একটু অবাক হয়েই তাকালাম ওর মুখের দিকে। আমার সে দৃষ্টি লক্ষ্য করেই আবার ও একটু হাসল, বললে, না ভাই, মিথ্যে কথা আমি বলছি না। এ যে কত বড় সত্য, তা হয়ত তুমিও একদিন বুঝতে পারবে।

বললাম, তাহলে বলো, তুমি অতি মহৎ ব্যাক্তি, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।

হেসে উঠল হো হো করে, বললে, মোটেই জিতেন্দ্রিয় নই। আচ্ছা, একদিন রাত্রে তোমাকে আমার কাছে বসতে দেব, আমি যখন আমার বীণায় হাত দিয়ে সুরের মধ্যে ডুবে যাব, তখন আমার দিকে তাকিয়ে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে, আমি কী বলতে চাই। ওখানে নারায়ণের যে নিজস্ব ঘরখানা আছে, তুমি দেখোনি সে ঘরখানা। আমি সেখানেই বসে রাত্রে রেওয়াজ করি।

মেয়েদের শেখাও কখন?

সকালে।

আর রাতে?

সম্পূর্ণ নিজের। আমি আর আমার বীণা। না না, আমার নিজস্ব বীণাখানি তুমি দেখোনি, সেটি নারায়ণের ঘরে রেখে দিয়ে এসেছি সযত্নে।

এখানে রাখোনি কেন?

একটু থেমে তারপরে বললে, ছিল। কিন্তু আর এখানে বসে বীণায় হাত দিতে পারব না। আমার বীণা বড় স্বার্থপর।

বলেই একটু হাসল নটরাজন, বললে, সমস্ত মন-প্রাণটা বীণায় অর্পণ না করলে সে সাড়া দেয় না। এখানে আর সেটা হবার জো নেই, মনঃসংযোগ করতে পারি না।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল নটরাজন, তারপরে একটিও কথা না বলে আপন মনেই চলে গেল অন্যদিকে।

সেদিন সকালের দিকে রোগিণীর ঘরে আমি একা বসে আছি চুপচাপ। ভামতীকে দেখলাম, একসময় স্নান সেরে পিঠে খোলাচুল এলিয়ে দিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। মায়ের কাছে এসে বসে মাকে পরীক্ষা করে, তারপরে আমার দিকে বলে উঠল, আজ একটু ভাল আছে, না?

হ্যাঁ। তাই তো মনে হচ্ছে।

বললে, প্রদীপ যেমন নিভে যাবার আগে দপ করে জ্বলে ওঠে, এও হচ্ছে তাই। আমি জানি, মা আর বাঁচবে না, মা যাবেই।

ভিতরটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল, কণ্ঠে জোর এনে বললাম, কখ্খনো না। হতেই পারে না তা। তুমি ওভাবে বলবে না কখনও।

আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপরে বললে, তুমিই বা কী অদ্ভুত মানুষ, এখানে এভাবে পড়ে আছ কেন?

এমনি। এমন রোগীকে ফেলে আমি যাই কেমন করে?

বললে, তাই কী? রোগীকে দেখবার লোকের কি অভাব আছে এখানে?

না, তা নয়, তবু—

কেমন যেন ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল মুখে, বললে, জানি, কেন তুমি এখানে আছ।

কেন?

আমার চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, অদ্ভুত স্নেহঝরা দুটি চোখের দৃষ্টি। তারপরে কোমল অথচ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, এত ভালবাসছ তুমি আমাকে!

রাগ করে উঠে দাঁড়ালাম, যত সব কল্পনা! ভালবাসা আবার কোথায়? নিছক একটা কর্তব্যবোধ।

তাই বুঝি?

বললাম, শোনো। আমি একটু বাসা থেকে ঘুরে আসছি। ওদিককার খবরও যে রাখি না অনেক দিন। পাহুলু তিন দিন এসে ঘুরে গেছে।

যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

আর কোনদিকে না তাকিয়ে, বিন্দুমাত্র কালক্ষয় না করে, তাড়াতাড়ি চলে এলাম বাইরে।

বাসায় ফিরে প্রথমেই দেখা হয়ে গেল ঘনশ্যামদাসজীর ছেলে রামদাসজীর সঙ্গে। পাহুলু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ই আলাপ করিয়ে দিল। ছিমছাম স্যুট-পরা পরিচ্ছন্ন কর্মঠ চেহারার ব্যক্তি। বয়স তিরিশের কাছাকাছি যেতে এখনও বাকি, কিন্তু চলনে-বলনে এমন একটা ভারিক্কি ভাব এসে গেছে, যে, যে-কোন গুরুদায়িত্বের ভারবহনে এখুনি তার দেহ-মন-প্রাণ সর্বতোভাবে প্রস্তুত। নমস্কার জানিয়ে বললেন, তিন দিন ধরে আপন'র সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। আজ হয়ে গেল।

হাসিমুখে বললাম, দুজনের স্বার্থ যে একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে, দেখা একদিন হতেই হবে।

হাস্য-পরিহাসবোধ অবশ্যই আছে ভদ্রলোকের, সহজ বন্ধুত্বের সুরেই বলে উঠলেন, ব্যবসায়িক স্বার্থের কথা বলছেন? ও তো আছেই। আপনার সঙ্গে আমার দরকারটা ব্যক্তিগত। কিন্তু আজ নয়। রোগীর সঙ্গে এ ক'দিন যুঝে-যুঝে আপনি ক্লান্ত, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। আরাম করে নিন, পরে কথা হবে।

বললাম, কিন্তু আমার সব খবরই রেখেছেন দেখছি যে!

হেসে বললেন, অপরাধ নেবেন না। এখানে আমি এখন থাকব ঠিক করেছি। সমস্ত পরিস্থিতিটাই তো আমাকে বেশ করে বুঝে নিতে হবে, কী বলেন?

তা অবশ্য।

বলে, আর কথা না বাড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলাম আমি। এটুকু বুঝলাম, রামদাস শুধু শিক্ষিতই নয়, বুদ্ধিমানও বটে। চতুর বললে কথাটা খারাপ শোনায়,

কিন্তু লোকটি আর যাই হোক, ঠকবার পাত্র নয় বা হটবার পাত্রও নয়।

একটু পরেই চুপিচুপি ওপরে উঠে এলেন স্বয়ং ঘনশ্যামদাসজী। এ ক'দিনেই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। ঝঞ্ঝাহত, বিপর্যস্ত, অসহায়। বললেন, আমার ছেলে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে বাবুজী। আজই বিকেলে রওনা করে দিচ্ছে। বলছে, আর দেশ থেকে ফিরতে দেবে না।

বললাম, তাহলে আপনার ব্যবসা, আপনার সম্পত্তি?

বললেন, সব হয়ত বিক্রি করে দেবে।

আপনার মত আছে তাতে?

বললেন, আমার পড়ি-লিখি জোয়ান ছেলে, ও যা করবে, তাতে কি অমত করা আমার সাজে?

সায় দিয়ে বললাম, তা তো বটেই।

বললেন, আচ্ছা, আরাম করুন বাবুজী, আমি পরে আসব।

আরাম করা অবশ্য বেশিক্ষণ হল না, এল পান্থলু। বিরস তার মুখ। বললে, খবর খুবই খারাপ বাবুজী। উনি চলে গেলে এখানকার কাজকর্মও বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেপিলে সংসার নিয়ে খাব কি? আবার কি ভাইজাগে যেতে হবে স্টিভেডোর-ফার্মে বিল টাইপ করে দিন কাটাতে?

কথাটা মনে হতেই হেসে ফেললাম, বললাম, না পান্থলু, নিষিদ্ধ বস্তুর নাম টাইপ করে পাপ অর্জন করতে হবে না তোমাকে।

তবে?

বললাম, কিছু ভেবো না। ব্যবসায়ী কখনও ব্যবসা তুলে দিতে পারে না। ঘনশ্যামদাসজী না থাকেন, ওঁর ছেলে থাকবেনই, দেখো।

এখানে স্থিতু হয়ে?

হ্যাঁ। তুমি দেখে নিয়ো।

বলেই টেবিলে অপেক্ষমাণ এ ক'দিনের জমানো ডাকের চিঠিগুলি নিয়ে পড়লাম। পান্থলু বললে, যাই বাবুজী। রামদাসবাবুর সঙ্গে বেরুচ্ছি।

কোথায়?

যেসব জায়গায় আপনি প্রস্‌পেক্‌টিং করেছেন, সেসব জায়গায় উনি ঘুরে ঘুরে দেখবেন বলছেন।

বললাম, তা ভালই তো! আমাদের ফার্মের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজের যে ব্যবসাটা ঘনশ্যামদাসজী চালাবেন বলে প্রস্তাব করেছিলেন, ওইটাই বুঝি ঠিক করতে চান?

পান্থলু বললে, হ্যাঁ, বোধহয় তাই হবে।

বললাম, তবে? বড় যে চাকরি যাবার ভয় করছিলে?

আজ্ঞে, বাবুজী, প্রসপেক্‌টিং করে যে-দরের জিনিস পাওয়া গেছে, তাতে যদি উনি খুশি না হন?

একটু হেসে বললাম, হবেনই। ব্যবসায়ী লোক, রত্ন চিনতে ভুল করবেন না।

কথাটার মধ্যে ভিন্ন কোন অর্থের আভাস লক্ষ্য করে পান্থলু যেতে-যেতেও ঘুরে দাঁড়াল, বললে, আজ্ঞে?

আবার হাসলাম, বয়সে তরুণ। দেবীপল্লীর রত্নের প্রস্‌পেক্‌টিংয়ে যাও না! তারপরে তোমার চাকরি ঠেকায় কে?

উত্তরে বিরসমুখেই পাছলু বললে, বড় শক্ত ঠাঁই।

কী রকম?

চাপা কণ্ঠে পাছলু বললে, আসামাত্রই ঠারেঠুরে একটু-আধটু ইঙ্গিত করেছিলাম। সেয়ানা লোক, বুঝেছিল ঠিকই। বললে ওখানকার এস্টাব্লিশমেন্টের কাগজপত্র নিয়ে আসুন। ওসব পাট আমি একেবারেই তুলে দেব।

তারপর?

আপাতত ব্যাপারটা চাপা পড়ে আছে। এখন তো আপনার পাহাড়-পর্বতের প্রস্‌পেক্‌টিংয়েই চললাম।

হেসে বললাম, এসো। তোমার পথ শুভ হোক।

চলে গেল পাছলু। অফিসের জরুরি চিঠিপত্রগুলো পড়ে এবং কিছু টুকিটাকি কাজ সেরে বেরিয়ে পড়লাম হোটেলের উদ্দেশে। কাছেই হোটেল। ফিরে আসতে বেশি সময় লাগল না। এসে, বিছানার ওপর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছি, রাত্রি জাগরণে চোখ ভারী, ঘুম আসছে, আবার আসছেও না, কী-এক চিন্তায় এলোমেলো হয়ে আছে মন। মনের এই ভার-হয়ে-হয়ে থাকা, কিছু ভাল না-লাগা, অকারণ দুশ্চিন্তার পীড়া, এর সঠিক কারণটা যদি নিজেই বিশ্লেষণ করতে পারতাম তো ভারমুক্ত হওয়া যেত। বার বার ঘুরে ফিরে ভামতীর কথাই মনে জাগছে, কিন্তু নিজের চিন্তাধারার মধ্যে দুটি বিপরীত স্রোত লক্ষ্য করে নিজেই অবাক হচ্ছি। একবার মনে হচ্ছে, ভামতী ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন! আবার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হচ্ছে, এ কী মোহের জালে জড়াচ্ছি নিজেকে! এর থেকে যত তাড়াতাড়ি ছুটি পাই ততই ভাল। ওর সেই একটি কথাই বার বার মনের মধ্যে গুমরে উঠছে, তুমি কবি—তুমি কবি!

অস্বস্তির আর সীমা নেই। শুয়ে থেকেও মনে হচ্ছে, অজস্র কাঁটা কে যেন ছড়িয়ে রেখে গেছে আমার শয্যায়, যতই পাশ ফিরি, দংশনের জাল থেকে মুক্তি নেই।

কতক্ষণ যে এভাবে কেটে গেছে কে জানে! ঘুমও আসছে না, শরীরও শ্রান্ত, অথচ মন চায় না স্থির হতে।

বাবুজী!

কে? চমকে, দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, চুপচাপ আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং ঘনশ্যামদাসজী। শরীর-মনের সেই বিশ্রামের অবকাশে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে ওঁকে কাছে পেয়ে ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত উল্লসিতই হয়ে উঠলাম আমি।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। উনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি আপনার কাছে এই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসছি।

তাতে কী হয়েছে! বসুন আপনি।

বসে একটু দম নিয়ে তারপরে বললেন, বাবুজী, খবর তো সবই শুনেছেন।

বললাম, আপনার বাচ্চুর খবর?

সোজা হয়ে বসলেন, কণ্ঠস্বর ধরা-ধরা, বললেন, ও চলে গেছে, আর আমার সবকিছু আঁধার হয়ে গেছে। নইলে—।

থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উনি কোনও কথা বলতে পারলেন না, আমিও না। নীরবে পার হয়ে গেল কয়েকটা মুহূর্ত।

একসময় ওঁর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, কী অব্যক্ত বেদনায় যে ওঁর ভিতরটা গুমরে মরছে, তা যেন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু পারলাম কেমন করে? যে গভীর অনুভূতি আর মমতা দিয়ে সংবেদনশীল মানুষ মানুষের মন বুঝতে পারে, আমার তা তো নেই, ছিলও না। চিরদিন কাজ আর জীবনের বহিরঙ্গ অধ্যায় নিয়ে মেতে আছি, অন্তরে গহীন স্রোতের অবগাহনের মানুষ তো আমি নই। তবে?

কী আমার হল? বার বার অন্তর্মুখী কেন হতে চাইছে আজ আমার মন? এ এক ধরনের আনন্দও বটে, জ্বালাও বটে।

সব-কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পার হয়ে অবশেষে বলেই উঠলাম, ঘনশ্যামদাসজী?

বলুন।

বাঁকা একটু হেসে বললাম, সরোজাকে ছেড়ে দিলেন যে বড়?

আরে, চুপ চুপ, ঘনশ্যামদাসজী চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন, ছেলে টের পেলে কি আর রক্ষে থাকবে? আমার পড়িলিখি ছেলে—চাঁদির টুকরো। ওর কাছে কেউ না। দিলাম মেয়েটাকে তাড়িয়ে।

এত সহজভাবে কথাটা উনি বললেন যে, আমি চমকে উঠলাম মনে মনে। তবে কি সত্য অনুভূতিটুকুর সাড়া জাগেনি আমার মনে? জানতে কি তাহলে আমি পারিনি ওঁর অন্তরের গভীরতম বেদনার বাণীটুকু?

বললাম, মনে কষ্ট হল না? শুনেছি, খুবই নাকি ভালোবাসতেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আর আমার বাচ্চুই যদি চলে গেল, গণেশজীর বাহনই যদি চলে গেল তো, কী হবে আমার আর সবাইকে নিয়ে?

মনে হল, তাই কি সত্যি কথা? সরোজার থেকে বাচ্চু বড়? প্রেমের থেকে সংস্কার বড়? পরক্ষণেই শান্ত হয়ে গেল মন, হতেও পারে। আমারই বা মনে কেন জেগে উঠছে এই সব প্রশ্ন? তবু বলে উঠলাম, সরোজা কোথায় গেল জানেন তো?

তা আর জানি না! ঘনশ্যামদাসজী বললেন, সেই দেবীপল্লীতেই গেছে। ওর যে আমি সবই জানতাম। শুনবেন তবে? মনে মনে ও ভালবাসে ওই নারায়ণকে।

ভালবাসে!

হ্যাঁ বাবুজী। দেখা হলে মুখেই দুজনের ঝগড়া, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে অদ্ভুত টান। যখন ওকে নিয়ে আসি এখানে, নারায়ণ আসতে দেবে না, তখন সে কী ওর ঝগড়া! যা-তা বলে এসেছিল নারায়ণকে। আর কী আশ্চর্য ব্যাপার জানেন? আমার বেশ মনে আছে, নারাযণ যেন ওর সামনে কুঁকড়ে গেল ভয়ে। আমি অবশ্য ওসব বুঝি-টুঝি না। ঐ বাড়ি, বাগান-টাগান, সবই একদিন কিনে নিলাম।

এখন নাকি বিক্রি করে দেবেন?

একটু থেমে তারপর বললেন, হ্যাঁ, তা দেব। আর যদি বিক্রি করে দিতে না পারি তো, ওদের তাড়িয়ে ওখানে একটা ধর্মশালা বানিয়ে দেব।

একটু আশ্চর্য হয়েই বললাম, তাহলে ওরা যাবে কোথায়?

যেখানে খুশি! যেখান থেকে সব এসেছে, সেখানে যাবে।

যদি সমাজ ঠাঁই না দেয়, তবে?

সে ওদের সমাজ, ওরাই ভাল বুঝবে। আমার ও নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই। কিন্তু বাবুজী, আপনাকে চুপি চুপি একটা কথা বলি, ও সরোজা মেয়েটি কী বেইমান জানেন?

কী রকম?

ঘনশ্যামদাসজী চাপা উত্তেজনায় যেন কাঁপছেন, বললেন, আমি কত টাকাকড়ি দিতে চাইলাম, নিল না। বললাম, তাহলে একটা বাড়ি কিনে দিই তোমার নামে। তাও নিল না। শুনলে আশ্চর্য হবেন, কোন গয়না-গাঁটি বা শাড়ি-টাড়ি কিছুই নেয়নি। নেহাতই নিজের জিনিসগুলি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবাক হয়ে শুনছিলাম সরোজার কাহিনী। তার বিচিত্র চরিত্রের যে দিকটি প্রকাশ পেল ওঁর কথার মধ্যে, তাতে মেয়েটির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে উপায় নেই। বললাম, অদ্ভুত মেয়ে তো!

অদ্ভুত! ঘনশ্যামদাসজী বললেন, ওরকম একরোখা একগুঁয়ে মেয়ে বোধহয় তামাম দুনিয়া খুঁজে পাবেন না। এ দেমাক কিসের থেকে জানেন?

কিসের থেকে?

বললেন, প্রেম। ওই নারায়ণ।

বললাম, তা যদি হয় তো, এ-ও এক আশ্চর্য কাহিনী ঘনশ্যামদাসজী।

তা হবে।

আর বিশেষ কিছু না বলে কিছুক্ষণ পরেই বিরসমুখে উঠে গেলেন ঘনশ্যামদাসজী।

উনি গেলেন বটে, কিন্তু আমার মনে রেখে গেলেন এক অপরূপ বিস্ময়ের ছায়াপাত। সরোজা মেয়েটি আর নারায়ণকে নিয়ে যে ইঙ্গিত উনি করে গেলেন, তা অনুধাবন করে মনে মনে পৌঁছনো যায় অপূর্ব এক মাধুর্যের রাজ্যে। নারায়ণকে ভালবাসে, অথচ তাকে ছেড়ে ঘনশ্যামদাসজীর কণ্ঠলগ্ন হওয়া, এ যেন ত্যাগ করে ভোগ করার মতো অবস্থা। অন্য দিকে ঘনশ্যামদাসজীকে যখন ছেড়ে এল চিরদিনের মতো, তখন সর্পিণীর নির্মোক-ত্যাগের মতো সব-কিছুই মুহূর্তে ত্যাগ করে এল, তার গয়না-গাঁটি অশনবসন, সব। ও-মেয়ের পক্ষে অত্যাশ্চর্য ঘটনা নয় কি?

আশ্চর্য ঘনশ্যামদাসজীর মানসিক অবস্থাটাও। যাকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে ছেলের কাছে নিজের সম্মান রাখবার জন্য, তাকে তাঁর অদেয় কিছুই ছিল না, বাড়ি ঘর টাকাকড়ি সবই তো দিতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সে নিল না, এই প্রত্যাখানের জ্বালাতেই কি শুধু জ্বলছেন তিনি? আর কোনও জ্বালা নয়? প্রেমের স্বরূপ কী কে জানে, কিন্তু যে মাধুর্য সৃষ্টি করেছিল মেয়েটি তাঁর জীবনে, সেই মাধুরীর ক্ষয় হল অকস্মাৎ, সেই ক্ষয়ের কি জ্বালা নেই? আমি যেন নিজের মন দিয়ে ওর মনের হাহাকারকে অনুভব করতে পারলাম।

এই সব ভাবতে ভাবতে বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাভিভূত হয়ে থাকব, হঠাৎ একসময় জেগে উঠলাম আচ্ছন্নতা থেকে—দূর ছাই, এসব ব্যাপার এত গভীরভাবে অনুভব করতে শুরু করলাম কবে থেকে? একটা লোক একটি মেয়েকে তার বিলাসের উপকরণ হিসাবে কাছে রেখেছিল কিছুদিন, তারপরে একদিন মেয়েটিকে সে ছেড়ে দিল, এই তো ঘটনা, এর মধ্যে থেকে এত মানসিক দ্বন্দ্ব আর বেদনার সুরই বা অনুধাবন করতে পারছি কেমন করে?

তাড়াতাড়ি উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে টেবিলে বসলাম অফিসের কাগজপত্র নিয়ে। ক্রমশ ডুবেই গেলাম কাজে। অর্থাৎ বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল অফিসের কাজকর্মে।

একটা জরুরি চিঠির খসড়া করতে বোধহয় মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, সিঁড়িতে হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ বেজে উঠতেই উৎকির্ণ হয়ে উঠলাম। আমারই খোঁজে ছুটে এসেছে বিশ্বনাথম, তাড়াতাড়িতে চোখের চশমাটি পর্যন্ত পরতে গেছে ভুলে।

বাবুজী—বাবুজী!

কী ব্যাপার বিশ্বনাথম?

শীগগির আসুন আপনি। সরস্বতী আম্মা বোধহয়—

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। আমিও যেন এলাম এক জগৎ থেকে আর এক জগতে। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ঘর, সেই ভামতী আর সেই বৃদ্ধা।

তাড়াতাড়ি জামাটা আলনা থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে বললাম, চলো।

একটু দূর থেকেই দেখতে পেলাম, ওঁর পায়ের কাছে পড়ে কাঁদছে ভামতী, জানলার কাছে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নটরাজন, আর বৃদ্ধা শীর্ণ হাত কোনক্রমে ওঠাতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

মা গো, কথা কও!

মেয়ের আর্ত চিৎকারের উত্তরে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন কী যেন বলবার, কিন্তু স্বর ফুটছে না কণ্ঠে, শুধু চোখের কোণ বেয়ে নেমে আসছে ধারা।

বললাম, অমন করে কেঁদো না, তোমার কান্নায় ওঁর কষ্ট হচ্ছে, দেখছ না?

অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা তুলে ভামতী বলে উঠল, কী হল মায়ের? কথা বলছে না কেন?

ভেবো না। ডাক্তার ডেকে আনছি এখুনি।

জানলার কাছ থেকে নটরাজন বললে, ডাক্তার ডাকতে গেছে নারায়ণ।

এসেছিল নারায়ণ?

হ্যাঁ। এই তো এতক্ষণ কাছে ছিল। আমিও এগিয়ে গিয়ে দেখছি।

নটরাজন ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি মহিলাটির শুশ্রূষায় মন দিলাম।

ভামতী আবার কেঁদে উঠল, আমি জানি, মা আর থাকবে না। আমার পাপ—

চুপ করো তুমি। বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলাম, বলেছি তো, ওঁকে বাঁচিয়ে তুলে আমি প্রমাণ করে দেব যে, সমস্তটাই তোমাদের কুসংস্কার।

এর পরে বর্ণনায় বাহুল্য কিছু এনে লাভ নেই, আমাদের সমবেত শুশ্রূষায়, আর ডাক্তারের যত্নে ও চিকিৎসায়, সরস্বতী আম্মা দিনকয়েকের মধ্যেই ধাক্কাটা সামলিয়ে উঠলেন। অর্থাৎ ডাক্তারের ভাষায়—বিপদ কেটে গেল।

তা অবশ্য গেল, কিন্তু যা রেখে গেল তাও মর্মান্তিক। বাক্‌যন্ত্রের কী উপসর্গ দেখা গিয়েছিল কে জানে, সরস্বতী আম্মা বেঁচে উঠলেন বটে, কিন্তু কথা গেল বন্ধ হয়ে। ডাক্তার বললেন, কিছু ভাববেন না, এটা সাময়িক।

দিন যায়। তেমনি করে বিছানায় এলিয়ে শুয়ে থাকেন তিনি, কিন্তু মাঝে মাঝে চোখের কোণ ওঠে ভিজে। কাছে গিয়ে বলি, কী হয়েছে?

আকারে ইঙ্গিতে বোঝান, কী হল আমার, কথা বলতে পারছি না কেন?

নারায়ণ আরও দিনকতকের জন্য ছুটি দিয়েছেন ভামতীকে, অর্থাৎ মায়ের সেবার জন্য ইচ্ছা করলে মায়ের কাছে সে থাকতে পারবে আরও কয়েকটা দিন।

ভামতীকে বললাম, দেখলে তো? মা সেরে উঠলেন, তোমরা মিছিমিছি একেবারে ভয় পেয়ে—

মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিল আমার কথা, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, শোনো।

কী?

নিম্নকণ্ঠে বললে, পাশের ঘরে যাও।

আজকাল এই-ই হয়েছে ওর রীতি। আমার সঙ্গে একান্তে কোনও কথা বলতে হলে মায়ের সাক্ষাতে বলে না, এইভাবে আড়াল খুঁজে নেয়।

আমি আসবার একটু পরেই ও এল পাশের ঘরে। বললে, ঠিক বলছ মাকে নিয়ে আর ভয় নেই?

একটু হেসে বললাম, আমি কি বলব, ডাক্তারই তো বলে গেলেন। আর কথা বলতে না পারা? ওটা অনেক সময় হয়। দিনকয়েকের মধ্যে এটা থেকেও সেরে উঠবেন, তুমি দেখো।

আমার দুটি হাত ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, অসাধ্য সাধন করেছ তুমি। আমরা সবাই জানতাম, মাকে হারাব।

বললাম, তাহলে স্বীকার করছ, সংস্কার-টংস্কার সব বাজে! এ তোমার পাপ নয়, কিছু নয়—

যেন শিউরে উঠল মুহূর্তে, বললে, ওকথা বোলো না, পাপ তো নিশ্চয়ই। শুধু তোমারই প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে এ-যাত্রা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম।

হাসলাম। বললাম, প্রবল ইচ্ছাশক্তি তাহলে আছে বলে স্বীকার করছ তো?

নিশ্চয়ই আছে। হাসিতে যোগ না দিয়ে তেমনি গাঢ়কণ্ঠে ভামতী বললে, শুদ্ধ সত্তা যে তোমার।

পরিহাস-তরল কণ্ঠেই বললাম, সে আবার কী!

আমার দুটি হাত নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে বললে, মা আরও বলতে পারবে। এসব লক্ষণ মায়ের খুব জানা। দেখছ না, মা কী ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে তোমাকে। আগে 'নটরাজন নটরাজন' করত, আর আজকাল তোমাকে নইলে তার একদণ্ড চলে না।

বললাম, তা অবশ্য! কিন্তু আর নয়, এবার চলি। সন্ধ্যায় আসব।

অবাক হয়ে বললে, সন্ধ্যায় আসবে মানে! যাবে কোথায়?

বললাম, কটা দিন তো এখানে এভাবে কাটল, এবার বাসায় যাই। অফিসের কাজকর্ম কত জমে গেছে জানো! দু দিন পাম্বলু এসে ফিরে গেছে।

হাতদুটো ধরে বললে, না, কয়েকটা দিন ছুটি পেয়েছি। এই কয়েকটা দিন কাছে থাকো।

বললাম, কাছেই তো থাকব। সারাদিনের কাজ সেরে সন্ধ্যায় আসব।

বললে, না। যেতে দেব না।

একটু হেসেই বলে উঠলাম, পাগল!

দুটি ছলছল চোখ আমার ওপর স্থাপিত করে বললে, পাগল আমি! এ ক'দিন সমানে রাত জেগে চেহারা কী হয়েছে দেখেছ!

তা হোক। বাসায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দিলে ঠিক হয়ে যাবে।

এখানে ঘুমোনো যায় না!

বললাম, অফিসের কাজগুলো করবে কে?

থাক না কাজ এ ক'দিন!

ওর কপালের ওপর চূর্ণালক এসে পড়ে খেলা করছিল ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ায়, তার ওপর হাতের ছোঁয়া রাখতেই আমার বুকে মুখ লুকালো। বললাম, কতক্ষণ আর? দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

হঠাৎ মুখ তুলল একসময়, গাঢ়কণ্ঠে বললে, তোমার কাজ-কর্মের খুব ক্ষতি করে দিয়েছি না?

সস্নেহে বললাম, দূর পাগল! এসব কথা ভাবতে হবে না। চলি।

প্রায় জোর করেই সরিয়ে নিয়ে এলাম বলা চলে। বাইরের ঘরে থেকে কখন নটরাজন বেরিয়ে গেছে নারায়ণের কাছে। সকালেই তো তার গান শেখানোর পালা। অদ্ভুত গুণী লোক, গানও জানে, নাচও জানে। এবং দুটিই শেখাবার মতো ক্ষমতা রাখে। ওর কথা ভাবতে ভাবতেই কখন যে বাসায় এসে পৌঁছেছি, খেয়াল নেই। পাছলু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, বললে, বাবুজী! ইস্! আর-একটু আগেও যদি আসতেন!

অবাক হয়ে বললাম, কেন?

বললে, এই একটু আগে ঘনশ্যামদাসজী চলে গেলেন।

চলে গেলেন! কোথায়?

দেশে। চিরকালের মতো।

সে কী!

হ্যাঁ। আপনার নামে একটা চিঠি রেখে গেছেন।

কোথায়?

ওপরে, আপনার ঘরের টেবিলে রেখেছি।

তাড়াতাড়ি উঠে এলাম ওপরে। আমার ঘরের একটা চাবি পাছলুর কাছেই থাকত, কারণ আমার ঘরে বসেই সে আমার কেরানীর কাজটা করে দিত। সুতরাং ঘর ছিল খোলাই।

দেখলাম টেবিলের ওপর গালা-দিয়ে সিল-করা একটা খাম পড়ে রয়েছে।

চিঠিটা তৎক্ষণাৎ না খুলে পাছলুকে প্রশ্ন করলাম, চিঠিটা কি টাইপ করা?

পাছলু বললে, টাইপ করলে তো আমিই করব। আমাকে তো দেননি কিছু টাইপ করতে। আর তাছাড়া, শেঠজী তো ইংরেজি লিখতেই জানেন না।

তাহলে লিখলেন কোন্ ভাষায়? বলে উঠলাম, আচ্ছা সে যাক। রামদাসবাবু কোথায়?

পাছলু বললে, তিনিও তো বাপের সঙ্গে গেলেন তাঁকে রেল-স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। বাপ রে, তিনটে ট্যাক্সি ভর্তি মালপত্র!

ট্যাক্সি পেলেন কোথায়?

শহর থেকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন।

বললাম, এত কাণ্ড! আর আমি কিছুই জানতে পারলাম না?

পাছলু বললে, আমি বলেছিলাম শেঠজীকে! আমি কেন, রামদাসজীও বলেছিলেন। তা বললেন, না, বাবুজী যেখানে আছে থাক, তার আরামে ব্যাঘাত কোরো না।

মনে মনে হাসলাম কথাটা শুনে, হ্যাঁ, আরামই বটে।

মুখে বললাম, তারপর?

পাছলু বললে, শুধু যাবার আগে আমাকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললেন, এই খামটা বাবুজীকে দিস পাছলু।

ততক্ষণে চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। বললাম, চিঠি কী ব্যাপার নিয়ে, তা তুমি জানো?

না বাবুজী।

বললাম, আচ্ছা, যাও পান্থলু। আমি একটু বিশ্রাম করব।

আজ্ঞে, চিঠিটা?

একটু হেসে বললাম, চিঠির ব্যাপারে তোমারও কৌতূহল হচ্ছে, না?

হ্যাঁ, বাবুজী।

পরে খুলব। কী আবার, অফিস-সংক্রান্তই কিছু হবে। হয়ত আয়রন কিংবা ম্যাঙ্গানিজ 'ওর'-এর যে প্রসপেক্‌টিং করেছিলাম, সে বিষয় নিয়ে ওঁর আর ব্যবসার ঝুঁকি নেবার ইচ্ছে নেই। অতএব আমারও প্রস্‌পেক্‌টিং শেষ। অর্থাৎ পাততাড়ি গুটোতে হবে।

একটুক্ষণ চুপ থেকে পান্থলু বললে, আমার তা মনে হয় না বাবুজী। ঘনশ্যামদাসজী ছেলের কাছে এ সম্বন্ধে টুঁ শব্দটিও করেননি। রামদাসজী ব্যবসা চালু রাখবেন বলে মনে হচ্ছে।

তাহলে কী ব্যাপার নিয়ে চিঠিটা লেখা তাঁর! বলতে না-বলতেই খামের ধারটা ছিঁড়ে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। একটা রেজিস্ট্রিকরা দলিল, আর ইংরেজিতেই লেখা একটি চিঠি।

চিঠিটি সংক্ষিপ্ত : 'বাবুজীর সঙ্গে শেষ-দেখা হল না বলে দুঃখিত। অনেক কথা ছিল বাবুজীর সঙ্গে। কাল রাত্রে চুপিচুপি গিয়েছিলাম দেবীপল্লীতে, নারায়ণের সঙ্গে সব পাওনা-দেনা চুকিয়ে ফেলতে। ফেলেওছি। কিন্তু যে দলিলটি নিজের হাতে সরোজাকে দেব বলে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা আর দেওয়া হল না। দেখা হল না সরোজার সঙ্গে। প্রথমে মনে হল, নারায়ণই কায়দা করে দেখা করতে দিচ্ছে না। দেখতে চাইলাম খাতা। তা সে তৎক্ষণাৎই দেখাল। দেখলাম, সত্যিই তার নামটা লাল কালি দিয়ে কাটা। আমি অবশ্য দেখা করতে পারতাম। আমি মালিক, মানি না তাদের আইন-কানুন। কিন্তু নারায়ণের ঘরটা দেখেছেন তো? নবগ্রহের মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত মনে হল। কেমন যেন হঠাৎ ভয় হল ওদের নবগ্রহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা-করা নিয়মগুলি ভাঙতে। চলে এলাম।

বাবুজী, একবার ভেবেছিলাম দলিলটা নারায়ণের হাতে দিয়ে আসব। কিন্তু তাও পারলাম না। সরোজাকে ও যে মনে মনে ভালবাসে, তা আমি জানি। সরোজার নাম প্রতি সন্ধ্যায় নিজের হাতে লাল কালি দিয়ে কেটেও যে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে, তাকে নাড়া দেব, এ শক্তি আমার কোথায়?

এ দলিলের কপি আমার সিন্দুকে আছে, যথাসময়ে রামদাসের হাতে পড়বে। তাকে মুখে তো এসব বলতে পারি না, কিন্তু দলিলের মারফৎও যে সে এসব ব্যাপার আঁচ করবে এ লজ্জাতেও মরে যেতে ইচ্ছা করছে। ছেলের কাছে—ছি-ছি—এ কী লজ্জা, বলুন তো বাবুজী!

ভয়ানক রাগ হচ্ছে ঐ মেয়েটির ওপরে। ঐ সরোজা। তাকে একটি দিনের জন্যও অনাদর করিনি, কিন্তু তবু সে কী ভাবে প্রতিশোধ নিল একবার দেখুন! আমি তাকে নগদ টাকা দিতে চেয়েছিলাম, তা সে নেয়নি। রামদাস এসে পড়বার আগেই বাড়ি দিতে চেয়েছিলাম রেজিস্ট্রি করে, তাও সে নেয়নি। নিলে ছেলের কাছে এভাবে আমাকে ধরা দিতে হত না।

কিছুই সে চায়নি। এই না-চাওয়াটাই তার চরম প্রতিশোধ নেওয়া। বাবুজী, একজন

যদি আর-একজনের কাছ থেকে কেবল কিছু পেয়েই যায়, তাতে সে সুখী হয় না, পরিবর্তে সে কিছু দিতেও চায়।

ভেবেছিলাম, দাম্ভিকা মেয়েটিকে কিছুই আমি দেব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিতে হল। না-দেওয়া পর্যন্ত যে আমার সুখ নেই বাবুজী, স্বস্তি নেই।

তাই দিলাম। বাড়ি-টাড়ি আমার নামেই রইল, যা পরে ছেলে পাবে, কিন্তু এই দেবীপল্লীর খরচ-খরচা বাদ দিয়ে, নারায়ণের অংশ বাদ দিয়ে, আমার নিজস্ব যা আয় হত, তার সব-কিছু স্বত্ব আমি সরোজার নামে সজ্ঞানে লিখে দিলাম। এর সাক্ষী রইলেন আমার এখানকার উকিল, আপনি চিনবেন না, কিন্তু পান্থলু বা বিশ্বনাথম এরা চিনবে। আর সাক্ষী রইল, এ চিঠি যে আমার হয়ে দিচ্ছে, সে। আপনি তাকে চেনেন ভালো করে—বিশ্বনাথম। সে আমার অতি বিশ্বস্ত লোক, তাকে আমি কিছু টাকা দিয়ে গেলাম।'

আমার সঙ্গে সঙ্গে পান্থলুও পড়ছিল চিঠিটা। সে এইসময় অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, বিশ্বনাথম!

বললাম, প্রাইভেটে বি.-কম. পড়ছে যে ছেলেটা, ঐ যে নারায়ণবাবুর ডান হাত, ওদের এজেন্ট, সেই বিশ্বনাথম। পুরু কাচের চশমা-পরা।

পান্থলু বলে উঠল, বাহাদুর ছেলে বটে!

আমি ততক্ষণে ডুবে গেছি চিঠিটার শেষ অংশে।

'বাবুজী, যতই রাগ করি, মেয়েটিকে ভোলা আমার পক্ষে কষ্ট হবে। আপনি নিজে ওর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবেন। বিশ্বনাথম এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে হয়ত। সে যাতে আমার এই সামান্য উপকারটুকু গ্রহণ করে, সেটা দেখবেন।'

একটু চমকেই মুখ তুললাম। বিশ্বনাথম? সে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে, এ কথাটার অর্থ কী! তবে কি ফুলের নাম ছাড়াও গোপনে সাক্ষাৎ করার কোন উপায় জানা আছে বিশ্বনাথমের? দেখতে হবে, জানতে হবে ব্যাপারটা। আবার পড়তে লাগলাম চিঠিটা।

'বাবুজী, ব্যবসায়ী লোক আমি, টাকা-আনা-পাই নিয়ে আমার কারবার। কিন্তু ঐ মেয়েটার সঙ্গে মিশে এইটুকু মনে হয়েছে, মানুষের মন কখনও মরে না। সে ভেঙে পড়ে, কখনও বিকৃত পথও ধরে, কিন্তু আলোর ছোঁয়া পেলে আবার সে জেগে ওঠে। এই আলোর ছোঁয়া হচ্ছে, প্রেমের পরশ। এই 'প্রেম' যে কী, তা আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু এইটুকু বলব, এত করেও আমি তা পাইনি, এক বিন্দুও পাইনি। অবশ্য বলবেন, পাবার দরকারই বা কী? দরকার থাকে না, টাকার নেশায়, অন্য নানান নেশায়, মানুষ তার এই সব থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসটার কথা ভুলেই থাকে। কিন্তু যখন মনে পড়ে, তখন?

সে হাহাকারের তুলনা নেই, সে বেদনার কোন উপমাও নেই। আপনি শক্ত মানুষ, আপনার হয়ত আমার মতো অবস্থা কখনও হবে না। তবু বলি, সাবধান। মনের সঙ্গে জড়াবেন না কারুর মন। একজনকে যদি ভাল লেগে যায় তো, তক্ষুনি আর একজনের দিকে ঝুঁকবেন, ভুলেও আর তার সঙ্গ নয়।'

চিঠি শেষ করবার পর, আমি আর পান্থলু কেউই কথা বলতে পারিনি কিছুক্ষণ। নীরবে একসময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। আমিও চাকরটাকে ডেকে মুহুর্মুহু কয়েক কাপ চা আনিয়ে খেলাম।

অফিসের জরুরি একটি চিঠির উত্তর লিখলাম। ল্যাবরেটরি অ্যানালিসিস, অর্থাৎ যাকে বলে 'অ্যাসে-রিপোর্ট', তাই এসেছে অফিস থেকে। আমার পাঠানো ম্যাঙ্গানিজ

'ওর'-এর নমুনার মূল্যায়ন। খুবই সন্তোষজনক এবং চিঠিটা রামদাসবাবুকে দেখানোও দরকার। ব্যবসা যদি এদিক দিয়ে তিনি করতে চান তো, এই সুযোগ।

কিন্তু বাপকে পৌঁছে তিনি ফিরে আসবার আগেই আমার হোটেল-পর্ব সমাধা হয়ে গিয়ে দিবানিদ্রার পালা চলেছে। ঘুম ভেঙে যখন উঠলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

পোশাকাদি পরিবর্তন করে, খামসুদ্ধ ঘনশ্যামদাসজীর চিঠিটা পকেটে নিয়ে নিচে নেমেছি, দেখি একটি ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ শুয়ে আছেন রামদাস। একা।

বলে উঠলেন, চললেন বাবুজী?

ভাবলাম, ঘনশ্যামদাসজীর দলিলের কথাটা ওঁকে এখন বলেই ফেলব নাকি? পরক্ষণেই মনে হল সিন্দুক খুললেই তো যথাসময়ে দলিলটার কপি ওঁর চোখে পড়বে। আমি আগে থাকতেই বা বলতে যাই কেন? মনের ভাব গোপন করে সহজ কণ্ঠে বলে উঠলাম, একটু পরেই ফিরে আসছি। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আমারও আছে।

কী রকম!

রামদাস বললেন, আসুন ফিরে। পরেই হবে।

চলতে চলতে মনে হল, দলিলের কথা কি তাহলে ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন রামদাস? কে জানে!

এ অবস্থায়, আমার কর্তব্য কী? আমার কর্তব্য চুপচাপ দলিলটা সরোজার হাতে পৌঁছে দেওয়া। বিশ্বনাথমের সঙ্গে গোপনে দেখা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু কে আগে? বিশ্বনাথম, না ভামতী?

ভাবলাম, আগে ভামতীর সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎকার হোক, পরে বিশ্বনাথমের সঙ্গে দেখা করলেই হবে।

গেলাম। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। গাঢ় হলদে রঙের একটা শাড়ি পরেছে, খোঁপায় হলদে রঙের একরাশ কল্‌কে ফুল। বললে, জানো? মা কথা বলেছে।

বলেছেন!

হ্যাঁ, এসো শীগগির।

বলে আমার হাত ধরে একরকম আমাকে টেনেই নিয়ে চলল ভিতরে। প্রথমেই পড়ে নটরাজনের ঘর। বইপত্র কী সব গোছাচ্ছিল যেন, বললে, এই যে বাবুজী। এসেছ?

ভামতী তাড়াতাড়ি আমার হাতটা ছেড়ে দিল। বোধহয় লজ্জা পেয়েই।

হাসিমুখে বললাম, না এসে পারলাম কই?

স্নিগ্ধ সস্নেহ হাসি নটরাজনের মুখে, বলল, ও-বাড়ি যাচ্ছি বাবুজী। তুমি আসবে? বীণা শোনাব।

আমি উত্তর দেবার আগেই ছেলেমানুষির স্বরেই বলে উঠল ভামতী, না, বাবুজী যাবে না। তুমি একাই থাকো গিয়ে তোমার বীণা নিয়ে।

হেসে উঠল নটরাজন, বললে, তাহলে দেখছি ছুটি পেলে না বাবুজী। আচ্ছা, আমি চলি।

আমাদের দুটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, বললে, শোনো। কাল ও-বাড়ির একটি মেয়ে, তার নাম ভারাহালু, ওদের যে নিজেদের মন্দির

আছে বাড়ির ভিতরের বাগানটাতে, পুরুষোত্তমের মন্দির, সেখানে নাচ দেখাবে। কাল খুব ভোরে, ব্রাহ্মমুহূর্তে। তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এসো।

মন্দিরে নাচ দেখাচ্ছে মানে?

নটরাজন বললে, আমাদের ভাষায় বলি, 'আরঙ্গেত্রম্'। এর তেলেগু প্রতিশব্দ আমার ঠিক জানা নেই। ভামতী জানে। ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ো।

চলে গেল নটরাজন। পথ থেকে ওর কণ্ঠের মিলিয়ে-যাওয়া গানের সুর শোনা গেল, ভামনে সত্যভামনে—

একটু অবাক হয়েই বলে উঠলাম, নটরাজন আজ হিন্দি গান ছেড়ে তোমাদের ভাষায় গান গাইছে, ব্যাপারটা কী?

তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠল ভামতী, ও-পাগলটার কথা ছেড়ে দাও।

বললাম, কিন্তু কথাটার মানে কী হল? 'ভামনে সত্যভামনে...' মানে?

আমার হাতে হাতটা জড়িয়ে হেসে ফেলল ভামতী, বাপ রে, কোনও জিনিসটাই এড়িয়ে যাবার জো নেই। সহস্র চক্ষু!

বললাম, অযথা কৌতূহল লক্ষ্য করে মনে মনে রাগ করলে বুঝি?

স্নিগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি আমার দু চোখে ন্যস্ত করে গভীর কণ্ঠে বলল, না গো, রাগ করিনি। আমাদের কথা এমন করে জানতে চাও, এতে রাগ করব? জানতে তো তুমি চাইবেই। তুমি যে কবি!

মুহূর্তে বিরক্ত হয়ে ছাড়িয়ে নিলাম ওর হাত, বললাম, কী বলছ এসব!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করল, তারপরে আমার একটি হাত ওর দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, বেশ, আর বলব না। খুশি তো?

আমি তখনও মুখ ভার করে আছি লক্ষ্য করে বলে উঠল, হয়েছে হয়েছে, আর রাগ করতে হবে না। এখন শোনো, ও কী বলে গেল।

কে?

নটরাজন। ওই যে গান গাইল না? 'ভামনে সত্যভামনে।' আমি নারী। কিন্তু কোন্ নারী? সত্যভামা।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, তা হঠাৎ 'আমি সত্যভামা' এই কথা গাইতে গেল কেন?

খেয়াল। ওর কি কোনও মানে ধরতে আছে? ও-গানটা হচ্ছে একটা দারু।

দারু মানে?

মানে, পাত্রপ্রবেশ দারু।

পাত্রপ্রবেশ দারু! মানে?

বললে, বাব্বা! কত 'মানে'র মানে আর বলব? চলো না ঐ ঘরে মার কাছে। মা সব জানে, বলবে'খন।

বললাম, হ্যাঁ। রোগা মানুষকে বকবক করাই আর কি! তুমি বলো না? তুমিও তো কম জানো না দেখছি।

বললে, ভরতনাট্যম জানো?

জানি না? তোমাদের সারা দাক্ষিণাত্যই তো 'ভরতনাট্যম'-নৃত্যের জন্য বিখ্যাত।

দেখেছ ভরতনাট্যম?

তা কিছু কিছু দেখেছি বইকি।

বললে, ছাই দেখেছ। যা সব তোমরা দেখে থাকো, ভরতনাট্যমের সে আর কতটুকু?

মানে!

হেসে বললে, আবার মানে? তোমার মানের জ্বালায় কি দেশ ছেড়ে পালাব?

বলো না?

বললে, যে ভরতনাট্যমের চর্চা বেশি হয়, যার পরিচয় বাইরের লোকেও জেনেছে, তা ভরতনাট্যমের একটা অংশ মাত্র। আমরা তাকে বলি, সাডির নৃত্য। অবশ্য এর মূল্যও কম নয়। যুগ যুগ ধরে দেবদাসীরা এই নাচ শিখে আসছে। এর মূল রসটা হচ্ছে, যাকে বলে শৃঙ্গার রস।

তুমি জানো এই নাচ?

সামান্য। এরই আর এক নাম দাসী আট্টম। দেবদাসীরা নাচত কিনা, তাই।

তোমাদেরও এই নাচ শিখতে হয় তো?

ঐ যে নটরাজন। ও শেখাচ্ছে কিছু কিছু। ঐ তো শুনলে? একটি মেয়ে, ভারাহালু, কাল ভোরে মন্দিরে তার জীবনের প্রথম নাচ দেখাবে। দেখো। যদিও সেটা ঠিক সাডির নৃত্য, অর্থাৎ দাসী আট্টম নয়।

তাহলে?

বললে, যেটা তোমরা দেখ সাধারণত, অর্থাৎ এই যে সাডির নৃত্য, এটা শিবের মন্দিরে হয়ে থাকে। কিন্তু শুনলে তো? আমাদের যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তিনি পুরুষোত্তম। তাঁর সামনে যে নৃত্য হয়, তা একটু আলাদা। একে আমাদের অন্ধ্রদেশে বলে কুচিপুডি। এ নাচ সচরাচর লোকে দেখতে পায় না। একে ঠিক নাচও বলা চলে না, এ হচ্ছে নৃত্যনাট্য। নাচও থাকে, অভিনয়ও থাকে।

বটে, দেখতে পারি না কোথাও এ নাচ?

হেসে বললে, কোথায় দেখবে! মরে যাচ্ছে। ঐ তামিলনাদের লোকটা, ঐ নটরাজন, ঐ লোকটা পাগল, ও আমাদের মধ্যে ওই নাচ আবার প্রচলন করতে চায়।

ও জানে?

হ্যাঁ। পিতৃদত্ত কিছু সম্পত্তি-টম্পত্তি আছে, তারই আয়ে যা খুশি তাই করে বেড়ায়। কেউ তো কোথাও নেই। কুচিপুডি বলে একটা গ্রাম আছে, সেখান থেকে ও কিছু কিছু শিখে এসেছে। মাঝে মাঝে এখনও ও যায় সেই গ্রামে, ওর গুরুর কাছে।

বললাম, কুচিপুডি একটা গ্রামের নাম তাহলে?

উত্তর দিল, হ্যাঁ। ঐ গ্রামের নাম থেকেই নাচটার নাম হয়েছে কুচিপুডি। কৃষ্ণের পারিজাত হরণের গল্প জানো তো? বিয়ের পর সত্যভামা কৃষ্ণকে বললেন স্বর্গ থেকে পারিজাত গাছটিসুদ্ধ নিয়ে আসতে, তিনি তাঁর বাগানে পুঁতবেন। স্ত্রীর কথা রাখতেই তো ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ। জানো না এই গল্প?

বললাম, ঠিক জানি না। কিন্তু বলো। তার পর?

বললে, এই গল্প নিয়েই একটি কুচিপুডি নৃত্যনাট্য আছে, তার নাম ভামকলাপম্। তার নিয়মটা হচ্ছে কী জানো? প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে যখন যে চরিত্র মঞ্চে এসে প্রবেশ করবে, অভিনয় আরম্ভ করবার আগে, ছোট্ট গান গেয়ে আর নাচের মুদ্রা দেখিয়ে তার নিজের পরিচয়টা সে আগে দিয়ে দেবে। তাকেই বলে পাত্রপ্রবেশদারু। ভামকলাপম্-এ 'সত্যভামা' যখন প্রথম মঞ্চপ্রবেশ করে, তখন সে ঐ গানটা গায়, যেটা তুমি নটরাজনের

মুখে এইমাত্র শুনলে, 'ভামনে সত্যভামনে'—আমি নারী সত্যভামা।

মন দিয়েই শুনেছিলাম ওর কথা, বলে উঠলাম, বাঃ! সুন্দর তো! তুমি জানো সত্যভামার নাচ?

সর্বনাশ! কোত্থেকে জানব? ও নাচ মেয়েদের নাচবার নিয়ম নেই। ছেলেরাই নাচে।

মেয়ের ভূমিকা?

হ্যাঁ, মেয়ের ভূমিকা।

বললাম, তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ এই নাচ?

না। আমার মা দেখেছে।

একটুক্ষণ চুপচাপ। বললাম, ঐ যে মেয়েটি কাল নাচবে, ভারাহাল্, সে কী নাচবে? কুচিপুডি?

হ্যাঁ। সে যে নাচটা নাচবে, তাকে আমরা বলি, পূজা-নৃত্য। অনেকটা সাডির নৃত্যের আলারিপ্পুর মতো। অথচ ঠিক আলারিপ্পু নয়।

বললাম, তাহলে কাল ভোরে আসতেই হবে। দেখতেই হবে নাচ। আচ্ছা, এ নাচ মন্দিরে কেন?

বললে, এই নিয়ম। শোনো? নাচ শেখবার পর সেই নাচটা প্রথম দেখাতে হয় দেবতাকে। আমাদের পুরুষোত্তমই তো পরম দেবতা। তাঁরই তো বধূ আমরা। কিন্তু আর বকবক করব কতক্ষণ? মায়ের কাছে যাবে না?

চলো।

আমার হাত ধরে আবার তেমনি করে নিয়ে চলল ভিতরে।

ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম, তেমন করেই শুয়ে আছেন বিছানায়। মুখের ভাবে প্রসন্নতা। আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলেন। স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল মুখ, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, তবু বললেন, কাছে বোসো। তোমাকে দেখি।

বসলাম। হাতটা বাড়িয়ে রাখলেন আমার কাঁধের ওপর, নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করে, মনোযোগ সহকারে কী যেন দেখতে লাগলেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, অস্বস্তি বোধ করে চোখ নামাতেই বলে উঠলেন, ভামতী ভুল করেনি।

আমার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়েছিল ভামতী, তার আঙুলের মৃদু ছোঁয়া আমার পিঠের ওপর রেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, দেখলে তো মা! তোমার শিক্ষা আমি কিছু কিছু পেয়েছি। কিন্তু তুমি আর কথা বোলো না মা, বড় দুর্বল তুমি, কথা বললে হাঁপিয়ে উঠবে।

সত্যি কথা। ঐটুকু কথা বলেই শ্রান্ত বোধ করছিলেন মহিলাটি। বললাম, একেবারে সেরে উঠুন, আপনার কাছ থেকে অনেক কথা শুনব।

খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন। ভামতী পিঠের ওপর আঙুলের সামান্য একটু চাপ দিয়ে বললে, ওঠো। রান্নাঘরে রান্না করছি, দেখবে এসো।

তারপরে মায়ের দিকে ফিরে বললে, ওকে নিয়ে যাই মা?

আমার ডান হাতটি ধরে কী যেন লক্ষ্য করছিলেন মহিলাটি, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই আমি উঠে পড়লাম, কিন্তু হাতটা রইল ওঁর হাতে। হাতটা ধরা অবস্থাতেই আমার আংটিটায় আঙুল বোলাতে বোলাতে হঠাৎ বলে উঠলেন, এ আংটি কোথায় পেলে তুমি?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল ভামতী, আমি দিয়েছি।

কী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, প্রথমে মুখখানা সাদা হয়ে গেল, তারপরে ধীরে ধীরে খুশির আলো জাগল মুখে, বললেন, ও আংটি আমার। আমিই পরতাম। ভামতীকে দিয়েছিলাম। খুব ভাল হয়েছে। ওটা তুমি সব সময় পরবে।

ভামতী মায়ের মুখের দিকে ঝুঁকে বললে, খুশি হয়েছ মা?

আবার শ্রান্তিবোধ করছিলেন, মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ।

ভামতী বললে, শুয়ে থাকো। আমি ওকে ভেতরে নিয়ে চললাম।

মহিলাটি যেন কী এক চিন্তার গভীরে মুহূর্তে তলিয়ে গেছেন ততক্ষণে, সাড়া দিলেন না।

একটা পিঁড়ি পেতে দিয়ে ভামতী বললে, বোসো।

বসতে বসতে বললাম, ঠিক এইখানটিতে তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনও তফাৎ নেই। রান্নাঘরের ব্যাপারে দেখছি, একবারে আমাদের দেশের মতোই সব কিছু।

তা বলে মাছ রান্না করি না আমরা।

এই বাহ্য পরিবেশের দিক থেকে কে বলবে তখন যে, আমি আমার দেশের রান্নাঘরে বসে আছি না?

ভামতী বললে, শোনো, খাওয়াদাওয়া করে রাত্রে আর যাওয়া হবে না।

বললাম, সে কী! অফিসের কাজের ব্যাপারে রামদাসজী বসে থাকবেন যে! আর তাছাড়া, আমার অন্য কাজও আছে।

একবার ভাবলাম, সরোজার কথাটা ওকে বলেই ফেলি। কিন্তু কী ভেবে আর পারলাম না।

ও বললে, থাকে থাকুক, আবার বলছি, আজ ছাড়ব না কিছুতেই।

বললাম, মা রয়েছেন। এভাবে আমার এখানে রাত্রে থাকাটা দৃষ্টিকটু ঠেকবে।

ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল ভামতী, রাখো তো ওসব বাজে ওজর আপত্তি। এই নাও, কেমন 'মশলা-পাঁপড়' ভেজেছি, একটু খেয়ে দেখ।

খেতে খেতে বললাম, তাহলে ছুটি পাচ্ছি না সত্যিই?

না। ভামতী বললে, কিন্তু একটা ব্যাপার দেখলে? তোমাকে আংটিটা দেওয়াতে মা একটুও রাগ করল না! ওটা কিন্তু মার বড় আদরের।

আমাকে দিলে কেন তবে?

মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলেমানুষের মতো বলে উঠল, বেশ করেছি। আসলে ওটা মায়েরও নয়।

কার?

মুখ টিপে হেসে বললে, শুনেছিলাম, অপরের হাতের আংটি। মাকে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু 'তিনি'টি কে?

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল, অতশত আমি জানি না।

অল্প একটু হেসে বললাম, জানো না যখন, তখন উঠি।

মানে!

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে। সবিস্ময়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, চলে যাচ্ছ?

ওর ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে হেসে উঠলাম, যাব না। বসে বসে রান্না করো। আসছি ঘুরে। নারায়ণের খবর নেওয়া হয়নি, যাই একটু গল্প করে আসি।

ভামতীর ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি, বললে, আসলে, আজ অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব করার ইচ্ছে হয়েছে, তাই না?

অপ্রতিভের মত হেসে উঠলাম, কী যে বলো!

কেন?

বললাম, অনন্য মেয়েকে যে পেয়েছে, অন্য মেয়ের সঙ্গে সে ভাব করতে যাবে কেন?

দুটি চোখে খুশির বিদ্যুতি, কিন্তু কৃত্রিম কোপ। বললে, ইস! অত বাক্‌চাতুরি করতে হবে না। আমি 'অনন্য মেয়ে' হতে যাব কেন?

একটি হাত চট করে ধরে ফেললাম, বললাম, সত্যি কথা। অভিভূত হবার মতো চরিত্রেরই মেয়ে তুমি।

বলেই আর দাঁড়ালাম না, কথাটা বলেই কেমন যেন লজ্জা হল, এ ধরনের কথা যে আমার মুখে একদিন আসতে পারে, এ আমি নিজেই জানতাম না।

চলে আসছি, পিছন থেকে বলে উঠল, শীগগির এসো কিন্তু। বসে থাকব।

ওর মায়ের ঘরের মধ্যে দিয়েই বাইরে যেতে হয়। ঠিক তেমনি শুয়ে আছেন। তাড়াতাড়িতে চোখে পড়বার কথা নয়, তবু চোখে পড়ল। দুটি চোখ নিমীলিত, কিন্তু চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ছে অবিরল ধারায়।

কাছে গিয়ে বললাম, এ কী, কাঁদছেন কেন এমন করে?

চমকে চোখ খুললেন। দুর্বল হাতটা উঠিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ন না, ও কিছু নয়।

কাঁদবেন না। দুঃখ কিসের আপনার? আপনি তো সেরে উঠেছেন।

দুটি পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকালেন আমার দিকে, বললেন, ও-আংটি যেন কখনও খুলো না।

ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠেই বলে উঠলাম, আপনার মেয়ের কিন্তু এটা আমাকে দেওয়া ঠিক হয়নি।

ঠিকই হয়েছে। উনি একটু ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আমার একটি হাত ধরে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন, ঠিক তোমারই মতো একজন। এমনি খেয়ালী। এমনি বৈরাগ্যের দৃষ্টি

একটু হেসে বললাম, আমার বৈরাগ্য আছে একথা শুনলে লোকে হাসবে। আমি সাধারণ লোক, রিপুর বশ।

বললেন, রিপু থেকে অ-রিপুতে যাওয়ার পথও তোমার জানা। তুমি যাবেই। আমি সব লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখে-চোখে-কপালে।

বললাম, বোধহয় ভুল হয়েছে আপনাদের।

না। আমাদের চোখ পুরুষদের সম্পর্কে কতকগুলি ব্যাপার সহজেই বুঝতে পারে জানো, সেও তোমার মতো ছিল, তাকে বাঁধতে পারিনি। অমন মানুষকে বাঁধা যায়ও না হয়ত সংসার করে, গৃহীও হয়। কিন্তু তবু তারা থাকে আজন্ম বৈরাগী।

কোনও বিস্মৃত সুষুপ্ত তারে যেন আঘাত লেগেছে, বীণার মতো বাজছে সেই তার আবার ওঁর চোখ হয়ে উঠল সজল। তাড়াতাড়ি বললাম, আর কথা বলবেন না, কাঁদলেও চলবে না। আমি যাই, একটু ঘুরে আবার আসছি। কেমন?

উনি চোখ মুছলেন, তারপরে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললেন, আচ্ছা।

সেই নবগ্রহের অদ্ভুত মূর্তি, সেই ধূপ, সেই মূর্তির পায়ের কাছে পুজো-করা ফুল। হাতবাক্সের ওপরে লাল খেরো-বাঁধানো খাতাটা খুলে মাথাটা তার ওপরে নুইয়ে রেখে বসেছিল নারায়ণ। আর পুরু কাচের চশমা-পরা বিশ্বনাথম বি.-এ., কমার্সের বই এপাশে-ওপাশে ছড়িয়ে রেখে, উবু হয়ে বসে খাতায় বুঝি কোনও প্রবন্ধই লিখে চলেছে একমনে।

ভেজানো দরজা খোলার শব্দেই চমক ভাঙল ওদের। নারায়ণ আমাকে দেখে বলে উঠল, বাবুজী!

হ্যাঁ।

বিশ্বনাথম অবাক হয়ে বললে, এখানে?

আপন মনেই একটু হেসে বলে উঠলাম, ফুলের নাম করব।

সোজা হয়ে বসল বিশ্বনাথম, কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম, তোমাকে একটু ডিস্টার্ব করব বিশ্বনাথম? একবার আমার বাসায় যেতে হবে। রামদাসজী বসে থাকবেন আমার জন্যে। পান্থলুও থাকবে। ওদের বলে এসো, আমি এখানে আটকে গেলাম, বাড়ি ফেরা আজ আর হল না।

বেশ। বলে উঠে দাঁড়াল বিশ্বনাথম, তারপরে তার স্যান্ডেলজোড়ায় পা গলিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে গেল ঘর থেকে।

পিছন থেকে ডেকে উঠলাম আমি, শোনো বিশ্বনাথম।

দরজার কাছে ও দাঁড়িয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আরও একটা কথা জানাবার আছে রামদাসজীকে। শোনো এদিকে।

বলে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে গেলাম ঘরের বাইরে। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে ওকে টেনে নিলাম পথের এক নির্জন প্রান্তে, বললাম, রামদাসজীকে যা বলতে বললাম, তা তুমি বলে এসো। কিন্তু তাকে আর-কিছু সত্যি-সত্যি জানাবার নেই। একটা গোপন কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

আমার আচরণে উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল বিশ্বনাথম, বললে, কী কথা! বলুন?

ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলে ফেললাম, সরোজার সঙ্গে গোপনে আমাকে একটু দেখা করিয়ে দিতে পারো?

কেন?

বললাম, ঘনশ্যামদাসজী সরোজাকে দেবার জন্য আমার হাতে একটা দলিল দিয়েছেন। এবং আমি জানি, এ দলিলের সব খবর তোমার জানা, তুমিই লিখেছ ঐ দলিল।

বিশ্বনাথম একটু থেমে থেকে সম্ভবত সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করল। তারপরে বললে, সবই তো জেনেছেন দেখছি। কিন্তু নারায়ণ-ভাইকে কি এসব কোনও কথা বলেছেন?

না—না। বললাম, সে যাতে জানতে না পায়, সেজন্যই তো তোমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এলাম!

বিশ্বনাথম বললে, অবশ্য আপনার নিজের হাতেই দলিলটা ওকে দেওয়া উচিত। আমার হাত দিয়ে গেলে ওদের মনে আমার সম্বন্ধে নানা সন্দেহ জাগতে পারে। আচ্ছা, এক কাজ করুন। কাল সকালে, অর্থাৎ মন্দিরের আরতির সময় আপনি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে

আসুন। ওখানে দেখা করিয়ে দেব। আমি যে এ ব্যাপারের মধ্যে আছি, ঘুণাক্ষরেও এটা কাউকে যেন জানতে দেবেন না।

না, তা দেব না। বললাম, কিন্তু, একটা কথা। মন্দিরে যে দেখা করিয়ে দেবে, সেটা তোমাদের নিয়মবিরুদ্ধ নয় তো?

নিয়মবিরুদ্ধ তো বটেই। বিশ্বনাথম বললে, কিন্তু নিয়মটা করেছে কে? ট্রেডের খাতিরে আমি ওসব মেনে নিয়েছি, নইলে অন্তরের সঙ্গে আমার এসবে সায় নেই। এসবে বিশ্বাসও করি না। আচ্ছা, আমি চলি। এতক্ষণ এভাবে গল্প করা ঠিক নয়। নারায়ণ ভাই কিছু সন্দেহ কবতে পারে। আপনি ওর কাছে যান।

বিশ্বনাথম চলে গেল। আমি আবার প্রবেশ করলাম ভেজানো দরজাটা ঠেলে। ঘরে তখন আর-কেউ নেই। ধীরে ধীরে বসলাম গিয়ে ওর কাছে, খাটের ওপরে। মনে হল কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে নারায়ণকে।

কণ্ঠে একটু পরিহাস-তরলতার সুর এনে বলে উঠলাম, কই, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে না?

চমক ভেঙে নারায়ণ বললে, কোথায় আটকালে? এ-বাড়িতে, না, ও-বাড়িতে? আমি ভামতীর কথা বলছি।

অত সোজাসুজি প্রশ্নে একটু লজ্জিতই হলাম বলা যায়। তাড়াতাড়ি সে লজ্জা কাটাবার জন্যই বলে উঠলাম, তুমি কি মনে করো, অত সহজেই আটকে যাবার লোক আমি?

কে জানে।

ফুলের নাম করি? আজ অন্য কারুর সঙ্গে গল্প করে কাটাব।

একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে, বললে, কী হয়েছে বলো তো? ঝগড়া করেছ?

দূর, ঝগড়া হতে যাবে কেন! এই তো গল্প কবে এলাম তার সঙ্গে। সরস্বতী আম্মাও ভালো আছেন।

জানি। কিন্তু—

বললাম, কিন্তু-টিন্তু নয়, নাম করব ফুলের?

সেদিন কেন যে অত ফুলের নাম করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, তার কারণ আজ কিছুটা বুঝি। সরস্বতী আম্মার কথাবার্তাই এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মূলে। ঐ যে তিনি বললেন, আমি বৈরাগী, আমার কোন-কিছুতে আসক্তি নেই। আসলে এগুলিই জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল আমার মনে। মনে হয়েছিল, যা আমি নই, কেন ওরা বার বার তা বলে? এভাবে ওসব কথা বলার অর্থই বা কী?

নারায়ণ বললে, ভাব করবে আজ অন্য মেয়ের সঙ্গে? সত্যি?

সত্যি।

তবে ফুলের নাম করো।

মনে হল ক্ষতি কী? না হয় কিছুটা সময় কাটিয়েই আসি একটি মেয়ের কাছে। তারপরে ভামতীকে সে গল্প করলে হয়ত সে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। বলবে, তোমার দ্বারা এ হতে পারে না। তোমার লক্ষণ দেখে জানি, তুমি 'অমুক তমুক'—

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা জাগল। পাছে মত বদলে যায়, তাই তাড়াতাড়ি যা মনে এল বলে উঠলাম সেই ফুলের নাম—সেবন্তী। অর্থাৎ সেঁউতি বা সেজুঁতি। ভামতী আজ এই ফুলই খোঁপায় পরেছে, দেখে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা চমকে যেন সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল নারায়ণের। মুখখানা যেন মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। বললাম, কী হল?

মুখখানা নিচু করে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপরে হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, না, এর কাছে তোমার যাওয়া হতে পারে না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কার কাছে?

যা করা উচিত নয়, তাই করে ফেলল নারায়ণ। বলে ফেলল, আসল নামটা, সরোজা।

কিছুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে, তারপরে হেসে উঠলাম হো-হো করে। বললাম, বুঝেছি। তাহলে করব অন্য ফুলের নাম?

উঠে দাঁড়াল নারায়ণ। নবগ্রহের সেই মূর্তিগুলির দিকে একে একে তাকিয়ে তারপবে বললে, আর কোনও ফুলই বাকি নেই আজ। একটি মেয়ের শুধু ছুটি—ভারাহালু। কাল সকালে আমাদের মন্দিরে তার নাচের 'আরঙ্গেত্রম্'।

মনে মনে কিন্তু অদ্ভুত ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে, ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত একটি খুশিব স্রোত। উঠলাম। বললাম, তাহলে যাই?

না ভাই, যেয়ো না। নারায়ণ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ধরল আমার একটা হাত, বললে, আমায় মাপ করো। ঐ ফুলের নামটা শেষ পর্যন্ত কেউ করেনি দেখে মনে মনে আশ্বস্ত হযেছিলাম। দেখলে তো মানুষের মন? শেষকালে তুমি এলে, দেবতার সামনে মিথ্যাচরণ করতে পারব না। যাও তুমি তোমার সেবন্তীর কাছে।

দুটি হাতে মাথাটি টিপে ধপ করে বসে পড়ল নারায়ণ। বললাম, তুমি কি পাগল হযেছ বন্ধু? আমি যাব না।

মুখ তুলল, বললে, যদি না যাও তো বুঝব, আমার দুর্বলতা তুমি ক্ষমা করোনি। বিশ্বাস করো, এ আমার মুহূর্তের দুর্বলতা। কী জানো, ঐ মেয়েটি এসে এখানকার সব-কিছু ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

একটু হেসে বললাম, অবশ্য কৌতূহল হয়। কেমন সে মেয়েটি, যে তোমার মতো বিচক্ষণ বিজ্ঞ পোড়-খাওয়া মানুষকেও নাড়া দিতে পেরেছে?

না না, ঠাট্টা কোরো না, নারায়ণ বললে, তুমি যাও। নইলে হয়ত—

থেমে যেতেই বলে উঠলাম, হয়ত? হয়ত—কী?

হাত দিয়ে কপালটাকে সজোরে ঘষতে ঘষতে বললে, তুমি যাও। যেতেই হবে তোমাকে।

কী বলছ!

বন্ধু, এই উপকারটা তুমি করো। আর-কেউ আজ আর আসবে না আমি জানি। তুমি না গেলে—শেষ পর্যন্ত হয়ত আমিই—কে বলতে পারে—হয়ত আমিই গেলাম, অতিথির মতো। সে দুরবস্থা থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও।

বললাম, দুরবস্থা কেন! এতে তোমার ক্ষতিটা কী?

উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল, প্রচণ্ড ক্ষতি। আমি ওদের পুরোহিত। আমি ওদের—।

না না, ধর্মে সইবে না। সমস্তই চুরমার হয়ে যাবে। এই পাথরের ন'টি দেবতার দিকে তাকিয়ে দেখো। ওঁদের সাক্ষী রেখে আমার যে প্রতিজ্ঞা, তা আমি ভাঙ কেমন করে।

সংস্কার?

না না, সংস্কার নয়, সত্য।

বললাম, জানি না। আমি ফুলের নাম করেছি মাত্র, এখনও টাকা দিইনি। অতএব কোনও সত্যেই আমি আবদ্ধ নেই। আমি ভিতরেই যাচ্ছি, কিন্তু তোমার ঘরে, নটরাজনের কাছে। আছে তো সে?

খোলা খাতাটার ওপরে মাথা ডুবিয়ে দিয়েছে নারায়ণ, কোনও উত্তর দিল না মুখে, মাথা হেলিয়ে শুধু জানাল, হ্যাঁ।

সেই পদ্মফুল-আঁকা দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই মনে হল, দরজার কাছ থেকে সরে গেল একটি ছায়ামূর্তি। সরে গিয়ে অদূরের থামটার আড়ালে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সবটা লক্ষ্য করে, তারপরে পা বাড়ালাম। থামটার কাছাকাছি এসে থেমে গেলাম, বললাম, মনে হয় আমি জানি আমি কার সঙ্গে কথা কইছি। আপনার নাম—সরোজা।

চমকে উঠল মেয়েটি, থামের পাশ থেকে সরে এল। বললাম, আড়াল থেকে আমাদের সব কথাই আপনি শুনেছেন মনে হয়। লজ্জা পাবেন না, আমি নারায়ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু। লোকটিকে আমিও ভালবাসি।

সেই আবছা আলোতেই আমার মুখের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিল সে। আলপাকা-রঙের কইম্বাটুর শাড়ি পরা। বললে, বুদ্ধিমান লোক আপনি মনে হচ্ছে। তবে আর যা-ই করুন, আমাদের ব্যক্তিগত কথার মধ্যে দয়া করে থাকতে আসবেন না।

বলেই হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল, পিছন থেকে বলে উঠলাম, শুনুন?

থমকে দাঁড়াল। বললে, কী?

অদ্ভুত কিন্তু পরিস্থিতি! দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে যে সরাসরি এই মেয়েটির সম্মুখীন হতে হবে, এ-ও যেমন ভাবিনি, তেমনি ভাবিনি, খেয়ালের বশে ফুলের নাম করবার জেদ ধরে শেষ পর্যন্ত এমনি এক ফুলের নাম করে বসব, যে নাম হয়েছে একেবারে এই সরোজার।

চকিতে মনের কোণে একটা অভিলাষ বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে উঠল। বললাম, একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েই দৃঢ়কণ্ঠে বলল, অন্য কারুর সঙ্গে এভাবে কথা বলা আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ।

বলেই আর দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি সামনের ঘরটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ওঁর ঘরের কপাটটা লক্ষ্য করলাম। মনে হল, ঠিকই হয়েছে। এই-ই বোধহয় বিধাতার নির্দেশ। নইলে, এমনভাবে আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটল কেমন করে?

দ্রুতপায়ে নারায়ণের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, পকেট থেকে তিনটি দশ টাকার নোট বার করে ওর সামনে রেখে বলে উঠলাম, এই নাও টাকা। ফুলের নাম তো আগেই করেছি। যেতে পারি?

মুখ তুলল নারায়ণ। অদ্ভুত প্রসন্নতা দুটি চোখের দৃষ্টিতে, ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত স্নেহমণ্ডিত হাসির রেখা। মাথা নেড়ে জানাল, যাও।

দরজা তো চিনেই গিয়েছিলাম। এগিয়ে গিয়ে ভেজানো দরজায় টোকা দিলাম। মুহূর্তে দরজাটা খুলে সামনা-সামনি এসে দাঁড়াল সরোজা। বললাম, নিয়মমতোই এসেছি। ফুলের নাম—সেবন্তী।

দরজায়-রাখা হাত দুখানি যেন মুহূর্তে শিথিল হয়ে পড়ে গেল। বললাম, এবার ঘরে আসতে পারি?

অস্ফুট কণ্ঠে বললে, আসুন।

পিছন পিছন ঘরে ঢুকে পায়ের জুতো খুলে খাটের একপাশে উঠে বসলাম। ঠিক তেমনি সাজানো একখানা ঘর। জানলার কাছে কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বোধহয় সামলাতে পারল নিজেকে। তারপরে ফিরে, হাসিমুখেই কাছে এসে দাঁড়াল। একেবারে ভিন্ন মূর্তি! বললে, কী চাই? গান? নাচ?

ততক্ষণে ইতিকর্তব্য আমি স্থির করে নিয়েছি। পকেট থেকে সেই দলিলটা বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। হাতে নিয়ে একটু আশ্চর্য হয়েই বললে, কী এটা!

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, দলিল। আজ থেকে এ প্রতিষ্ঠানের আপনি মালিক।

মানে!

বললাম, ঘনশ্যামদাসজী যাবার সময় এটি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এটা দেবার জন্যই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম।

মুখে বিচিত্র হাসি, সরোজা হঠাৎ খামসুদ্ধ দলিলটা দু হাতে করে অবলীলায় ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

এ কী করছেন!

ওটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জানলা দিয়ে ফেলে দিল। বললে, এ দিয়ে আমি করব কী?

বললাম, টাকায় আপনার দরকার নেই?

না।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, তবে?

তবে কী? এই যা এখানে করছি, এও টাকার জন্য, এই তো? সে টাকায় অগৌরব নেই।

বুঝলাম না।

বাঁকা একটু হেসে বললে, বুঝবেনও না। যে বুঝবে, সে বসে আছে ওই বাইরের ঘরে, আপনার বন্ধু, ওই নারায়ণ।

সরোজার কাজলপরা বড় বড় চোখদুটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম, অবাক লাগে, সব কিছু বুঝেও সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে কী করে? কী করে আপনাকে এখানে সে প্রতিনিয়ত সহ্য করবে? কী করে প্রতিনিয়ত বাইরের লোককে সে—!

বাধা দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বললে, চুপ করুন। আমি সেইটাই দেখতে চাই। দেখতে চাই কত ওর সহ্যগুণ! ওর ভিতরটাকে ক্রমাগত ঘা দিয়ে ভেঙে চুরমার না করা পর্যন্ত আমার নেই—স্বস্তি নেই।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম, তখন আরেক মানুষ। বিস্ফারিত অগ্নিক্ষরা দুটি চোখ, চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, উত্তেজনায় কাঁপছে। বলতে লাগল, এখানকার প্রায় সব মেয়েই

ধর্মবিশ্বাসে অটল। ধর্মের প্রতি দুর্বলতার সেই সুযোগ নিয়ে ওরা—আপনার ঐ বন্ধু—ঐ বন্ধুকেই তো ওরা অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছে। ব্যথা যে কোথায় গিয়ে বাজে—ও নিজেকে দিয়ে বুঝুক! ওকে সেটা মর্মে মর্মে বোঝাবার জন্যই আমি এখানে এসে আবার ঢুকেছিলাম। আপনি শত হলেও বাইরে থেকে এসেছেন, আমাদের কথাবার্তা বুঝবেন না জানি। আমার ওপর ওর টান নেই ভেবেছেন? খুবই আছে। যেদিন বাইরে চলে গিয়েছিলাম সেদিন থেকে ও দগ্ধাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে খাক হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম আমি চলে যাব, আর ও-ও এই ধর্মের নামে কপটাচার বন্ধ করে দেবে। কিন্তু তা তো হল না। তাই এখান থেকে মুক্তি পেয়েও এখানকার শিকল আবার হাতে-পায়ে তুলে নিয়েছি, রোজ রাতে নতুন নতুন ফুল হয়ে ফুটি আর মনের মধ্যে এক একটি হাতুড়ির ঘা দিই। ভাঙবে না ভাবছেন? নিশ্চয়ই একদিন চুরমার হয়ে গুঁড়িয়ে যাবে।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলাম। ওর বক্তব্যের বিরুদ্ধে নারায়ণ যে কী যুক্তি দিতে পারে তা আমি জানি, আমাকে অনেক আগেই একদিন সে বলেছিল। কিন্তু ধর্মের কপটাচার বলে সরোজা যা বোঝাতে চাইছে, ঠিক তার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি তেমন কই? যারা বিশ্বাস করে, রোজ সন্ধ্যায় পুরুষোত্তমই আসছেন নানান রূপ ধরে—তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস সঞ্চারিত করে তাদের দিয়ে প্রকারান্তরে কপটাচারকে কি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না? সরোজার এ অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এসব যুক্তিতর্কের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সেই মুহূর্তে আর যা অনুভব করছিলাম, তা অন্য—নারায়ণ-সরোজার মানসিকতা। দুটি চরিত্রের দুটি ভিন্ন প্রকাশ। একজন অপরজনকে ভাঙতে চায়, কিন্তু সে-ও ভাঙবে না, কত আঘাত দেবে তুমি দাও, আমি অটুট আছি। হৃদয়ের অভিব্যক্তির দিক দিয়ে এ-ও এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা!

কিন্তু সরোজা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সম্ভবত আত্মবিস্মৃতিজনিত একটা লজ্জাও। মুখ নিচু করে কী করবে বা কী বলবে বোধহয় স্থির করতে পারছিল না।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা আপনি আজ খুলে দিলেন। আমি যা ভাবতাম—

যাক, মুখ তুলল সে, ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসি, কণ্ঠস্বর শান্ত।

আমি বোধহয় নারায়ণের প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাধা দিয়ে বলে উঠল সরোজা, থাক ওসব কথা। যার কাছে এসেছেন, তার সঙ্গে কথা বলুন। আমি আজ সেবন্তী।

অনেক কথাই ভিড় করে আসছিল একসঙ্গে, কিন্তু জানি, উত্তর আর পাব না। সরোজা সত্যিই আর কথা বলবে না আমার সঙ্গে, কথা বলবে সেবন্তী।

ধীর মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কেমন করে গ্রহণ করবেন আমাকে?

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল, তারপরে বললে, ওর এ-ব্যবস্থাটা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে মন্দের ভাল। ভিন্ন নামগুলো আছে বলেই বোধহয় আমরা বেঁচে আছি। নিজেদেরকে ভাগ করবার সুবিধা হয়, নিজেকে নিত্য নতুন বলে ভাববারও সুযোগ হয়। তাই বলছি, আর কেন তুলছেন ওসব কথা? আমার নাম আজ সেবন্তী, মনে প্রাণে আমাকে সেবন্তী হতে দিন। সেবন্তীর মধ্যে সরোজার সব কিছু হারিয়ে যাক।

বলে উঠলাম, ঘনশ্যামদাসজী আপনাকে কী নামে ডাকতেন?

মুখ তুলে তাকাল, একটু অবাকই হয়েছে বোধহয় আমার প্রশ্নে। তারপরে, একটু থেমে, একটু ভেবে নিয়ে বললে,—সরোজা নয়। ডাকতে শিখিয়েছিলাম অন্য নামে। কিন্তু আবার ও-প্রসঙ্গ? কার কাছে এসেছেন আপনি? সেবন্তী—সেবন্তী! বুঝলেন?

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, বুঝেছি। কিন্তু, যদি আমি এখন চলে যাই? না থাকি?

ঠোঁটের কোণে বাঁকা একটা হাসি টেনে এনে বললে, সরোজার সব কথা শুনে ফেলেছেন, তাই তাকে অনুগ্রহ করতে চান? তাতে সেবন্তীর কী হবে?

বলে ফেললাম, আসবে অন্য লোক।

আর কোনও লোক নেই।

কেন, নারায়ণ নিজে?

মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেল সরোজা, তারপরে ধীরে ধীরে এক সময় প্রাণ সঞ্চারিত হল সেই পাষাণমূর্তিতে। বললে, আপনি যে নারায়ণের বন্ধু, কথায় কথায় সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।

তারপরে একটু থেমে আবার বলল, কিন্তু কারুরই কোনও উপকার করতে পারবেন না। আপনি গেলে, আর-একজন যে আসবে, এ নিয়ম নেই।

চমকে উঠলাম, বললাম, কি বললেন!

অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বর, বললে, আপনি গেলে যে আপনার বন্ধু আসবে, সে উপায় নেই। আমার থাকবে ছুটি, কিন্তু সেবন্তীর কী হবে? সে শুকিয়ে যাবে।

এবার হেসে উঠল খিলখিল করে, তারপরে বললে, তার চেয়ে থেকেই যান না। মন হরণ করতে একা আপনার ভামতীই জানে না, সেবন্তীও জানে।

শুনেছেন তার কথা?

শুনেছি বই কি! আপনি সবার কথা জেনে বেড়াবেন, আপনার কথা কেউ জানবে না?

নিরুত্তর রইলাম।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে বলে উঠল, কী হল! আসুন?

হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, না।

সরোজা আরও কাছে এগিয়ে এসে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল আমার দক্ষিণ বাহুটা। বলল, না কেন! আসুন না?

নিজেকে মুহূর্তে ছাড়িয়ে নিলাম, দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, না। মাপ করবেন, আমি বুঝতে পারিনি। ও-নিয়মটা সঠিক জানা থাকলে আমি কিছুতেই ফুলের নাম করতাম না। কিন্তু সে যাক। আপনি আমার একটা উপকার করবেন?

অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল, কী?

বললাম, নটরাজন কোন্ ঘরে আছে দেখিয়ে দেবেন?

আর কোনও বাক্যব্যয় না করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে বারান্দার বাঁ দিকে বেঁকে সোজা হাঁটতে হাঁটতে একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। কোন্ ঘরে যেন নৃত্যের উৎসব চলছিল, তার মৃদঙ্গ আর ঘুঙুরের শব্দের জন্য কানে আসেনি, এই দরজার কাছে আসামাত্রই শুনতে পেলাম বীণার তারে কোমল করুণ সুরের মূর্ছনা।

সরোজা বললে, ভেজানোই আছে, ঠেললেই খুলে যাবে।

বলে আর দাঁড়াল না, যে পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে গেল দ্রুতপায়ে।

খাটের ওপরে সত্যিই একটি বীণা নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে নটরাজন। আর অদূরে মেঝের উপরে একটি অল্পবয়সী তরুণী মেয়ে—ধবধবে সাদা শাড়ি-পরা—বসে চুপচাপ শুনে চলেছে সেই বীণার সুর।

মেয়েটিই আমাকে দেখতে পেল প্রথমে। উঠে দাঁড়াল, নটরাজনকে বুঝি বললে আমার কথা, তার কাছে গিয়ে।

বীণার ঝঙ্কার থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল নটরাজন, তারপরে হাসিমুখে বলে উঠল, আরে, এসো এসো। কী সৌভাগ্য!

সৌভাগ্য আমার, বললাম, তোমার বীণা শুনব।

মকরমুখী বিপুলকায় বীণাটি খাটের ওপরে রাখা, তার সামনে বসে আছে নটরাজন, একটু হেসে বললে, চলে এলে যে?

এলাম।

ছেড়ে দিল ভামতী?

ভামতীর নাম উচ্চারিত হতেই সাদা শাড়ি-পরা তরুণী মেয়েটি অস্ফুট কলরব করে উঠল, তার দিকে আমরা দুজনেই একযোগে মুখ ফেরাতে সে বলে উঠল, কবি?

একটু আশ্চর্য হয়েই তার মুখের দিকে তাকালাম। আঁচল দিয়ে হাস্য গোপন করলেও চোখদুটির হাসি সে লুকোতে পারেনি।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নটরাজনের দিকে তাকাতেই সে বলল, এবাড়ির সবাই তোমাকে দেখেনি বটে, তবে সবাই তোমাকে চেনে। তোমার নাম দিয়েছে ওরা—কবি।

তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে বললে, চিনেছ তাহলে ভাবাহালু—এই সেই বাঙালী বাবুটি। তোমাদের কবি।

আমাদের কেন! মেয়েটি তেমনিভাবে হাসতে হাসতে বললে, ভামতীর কবি!

বলেই আর দাঁড়াল না, ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বললাম, এরই তো কাল—

হ্যাঁ। আরঙ্গেত্রম্। নটরাজন বললে, নাচ অনেককেই শিখিয়েছি, কিন্তু সে হচ্ছে যাকে বলে মাত্র তালিম দেওয়া। কাজ-চালানো গোছের। যেটুকু শেখা দরকার, সেটুকুই ওরা শিখে রাখত। কিন্তু এই মেয়েটি মাত্র তালিম নয়, গোড়া ধরে নিয়ম করে নাচ শিখেছে। সেদিক থেকে এটিই আমার প্রকৃত প্রথম ছাত্রী। কাল দেখো, আমিই হব এর 'নট্টুভান'। 'নৃত্যশিক্ষক'। 'নৃত্যগুরু'ও বলতে পারো।

কী নাচ ও শিখছে?

বললে, দাসী আট্টম, যাকে সবাই 'ভরতনাট্যম্' বলে জানে।

সবটা ও শিখেছে?

না। কিছুটা। বাকিটা শিখবে। সব ওকে শেখাব। নিষ্ঠা আছে মেয়েটির।

সবটা শেখেনি বলছ, অথচ 'আরঙ্গেত্রম্' হচ্ছে কী করে?

ওটা আর কিছুই নয়, এক কথায় 'গুরুবরণ' আর কী। দেখতেই পাবে।

বলে নটরাজন তার মকরমুখী বীণায় হাত দিল। বেজে উঠল সুর। এমন তন্ময় হয়ে সে বাজাচ্ছিল যে, ঘরে অন্য কেউ যে বসে আছে, এ তার খেয়ালও বুঝি নেই।

সত্যি কথা বলতে কী, সরোজা আমার মনের মধ্যে একটা ঝড় তুলেছিল, চিন্তার একটি ঝড়। হয়ত বা তারই ধাক্কায় আমি বাইরের পথে নারায়ণের সামনে না গিয়ে

এর কাছে পালিয়ে চলে এসেছি। কথা বলছিলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল সরোজার কথাগুলিই। কিন্তু আশ্চর্য সঙ্গীতের যাদু। প্রাথমিক আলাপের দিকটি, তত ভাল না লাগলেও ক্রমশ আকর্ষণ করতে লাগল আমায় সুর। সঙ্গে সঙ্গত নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে মৃদু—মাঝে মাঝে তীব্র—মাঝে মাঝে ঝড়ের গতিবেগ—অদ্ভুত একটা সুরের মায়াজাল! বোধহয় একটানা ঘণ্টাখানেক সে বাজিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দেয়ালে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, পর্বতের গুহা থেকে প্রবল গতিবেগে যেন বেরিয়ে এসেছে কলহাস্যময়ী চঞ্চল কোনও ঝরনাধারা, উপলে-উপলে মুখরিত হতে হতে প্রপাতের মতো ধাপে ধাপে যে যেন নেমে আসছে নিচে—অবশেষে এল সে সমতলে—মৃদু-মৃদু তরঙ্গ তুলে দুটি কূল ছুঁয়ে নদী হয়ে এগিয়ে চলল সে। ক্রমে ক্রমে মন্দ্রমুখর হল তার জলকল্লোল—গভীর থেকে গভীরতর—বিস্তৃততর—শেষ পর্যন্ত বিলীন হল ব্যাকুলিত সিন্ধু-তরঙ্গে আশ্লেষ-উচ্ছ্বাসে।

থেমে গেল। বললাম, অনেক গুণ তোমার। গাইতেও পারো বাজাতেও পারো। আবার নাচও জানো।

কোনোটাই সেইজন্য বেশি জানা হল না।

নিবিড় আলিঙ্গনে বীণাটিকে টেনে নিল, অপরূপ স্নেহে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল, যেন প্রিয়জন তার অতি প্রিয়জনকে দীর্ঘ অদর্শনের পর আদর করছে।

অবাক হয়ে ওকে দেখছি, এমন সময় একটি ঝিকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল ভারাহালু, দুটি থালায় ভর্তি ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি।

দুটি আসনের সামনে দুটি থালা নামিয়ে রেখে জলের গ্লাস সাজিয়ে আমাদের দুজনকে আহ্বান জানাল ভারাহালু। নিশ্চুপে খাট থেকে এল নটরাজন। আমি আপত্তি জানালাম, এসব কেন? বাড়ি গিয়েই তো খাব।

নটরাজন বললে, খাও। এ হচ্ছে প্রসাদ। শ্রীকৃষ্ণের মন্দির থেকে ভোগ দিয়ে নিয়ে এসেছে ভারাহালু। খেয়ে ওকে আশীর্বাদ করো।

আমাদের সামনে বসে ভারাহালুও মিনতির স্বরে বললে, খান?

অগত্যা খেতে হল। ভারাহালুর নির্দেশে। একে একে সব।

বললাম, রাত্রের খাওয়া হয়ে গেল।

নটরাজন কিন্তু কেমন যেন অনমনস্ক। চুপচাপ খাওয়া শেষ করে সে বাইরে গেল। আমিও মুখ হাত ধুয়ে ভিতরে এলাম। ভারাহালু আর ঝিটি চলে গেল থালা উঠিয়ে নিয়ে, মেঝেটা পরিষ্কার করে। আমি এবার ভাবছিলাম ভামতীর কথা। পেট ভরে গেছে, আর কিছু খেতে পারব না, তার রান্না-করা খাবার যখন মুখে তুলতে পারব না, সে তখন দুঃখই করবে না, হয়ত তিরস্কারও করবে।

ইতিমধ্যে ফিরে এল নটরাজন, বললে, নারায়ণ ভাই বাইরের ঘরেই আজ শুচ্ছে বিশ্বনাথমের পাশে, ভোবে রাতে উঠে আবার ওকে পুজো করতে হবে কিনা ভারাহালুর জন্য! সুতরাং সারারাত এ-ঘরটা আজ আমার। সারারাত আজ বাজাব। শুনবে তো?

বললাম, আমাকে তো ফিরতে হবে।

ফিরতে হবে! মুখ নিচু করে কি যেন ভাবতে লাগল, তারপরে মুখ তুলে বললে, বেশ। তবে কিছুক্ষণ শুনে যাও। ঘণ্টাখানেক।

হ্যাঁ, তা শুনছি।

কিছুক্ষণ বাজাবার পর বললে, ভারাহালুকে দাসী আট্টম শেখাচ্ছি। কিন্তু ওটাই আমার জীবনে শেষ সাধ নয়। আমার সাধ অন্য।

কী বলো তো?

বললে, তাঞ্জোরের কাছেই একটা গ্রামে এক 'নট্টুভান' বা নৃত্যগুরুর বংশে আমার জন্ম। গান-বাজনা-নাচ অধ্যয়নের মত শ্রদ্ধার সঙ্গেই শিখতে হয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ছিল ঘূর্ণি। বেরিয়ে পড়েছিলাম। এখানে এসে জীবনের ধারাটা মুহূর্তে বদলে গেল।

থেমে গেল নটরাজন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কেটে যাবার পর ঈষৎ তরলকণ্ঠেই বলে উঠলাম, মেয়েটি কে তা কিন্তু এখনও বলোনি।

আমার কথা ওর কানে ঠিক গিয়েছিল কি না কে জানে! নিজের মনেই বলতে লাগল নটরাজন, সরস্বতী আম্মার স্নেহ জীবনে কখনও ভুলব না। অথচ জানো?

কী?

বীণার তারে একটা ঝঙ্কার তুলে, তারই রেশ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই বললে, এইসব মেয়েদের মতোই ছিল সরস্বতী আম্মার জীবন। আজ বীণায় শঙ্করাভরণম বাজাতে গিয়ে ওঁর সেই সব কথাই মনে পড়ে গেল। উনি আমাকে স-ব বলেছিলেন। খুবই স্নেহ করতেন কিনা।

বললাম, আমার হাতের এই আংটিটা দেখেছ?

একটু ঝুঁকে আংটিটা দেখতে দেখতে একসময় মুখ তুলল নটরাজন, বললে, সরস্বতী আম্মার আঙুলে আগে থাকত। তোমায় দিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ। এটা ওঁকে দিয়েছিল কে যেন!

তাঁর কথাই বলছি, নটরাজন বললে, তাঁকে দেখিনি, শুনেছি তাঁর কথা। লোকটি বিদেশী, কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির সেই লোক।

মনে মনে একটু চমকে উঠলাম, বললাম, সাত্ত্বিক প্রকৃতি মানে?

নটরাজন বললে, সাত্ত্বিক প্রকৃতি বলতে কী বোঝাতে চান সরস্বতী আম্মা, তা তিনিই জানেন। হয়ত অসাধারণ কোন ব্যক্তি হবেন। তাঁকে ভালবেসেই সব ত্যাগ করলেন তিনি।

সব, মানে?

সব, মানে এই জীবন। তাঁর এই কন্যাটিকেও ত্যাগ করেছিলেন, বলা যায়। ঐ যে বাসাটিতে তুমি গিয়েছিলে, ঐ বাসাটি নিয়ে বাস করতে লাগলেন। সেই লোকটি ছিল খেয়ালী, খেয়ালের বশে যেমন এসেছিল, তেমনি একদিন হঠাৎই চলে গিয়েছিল।

তারপর?

তারপর থেকে এই এত বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ একা কেটেছে সরস্বতী আম্মার জীবন। 'বঞ্চিত সত্তা' বলতে পারো। কিন্তু কখনও—কোনদিন—কোনও অভিযোগ শুনিনি কারুর বিরুদ্ধে। পূজা-অর্চনা নিয়েই আছেন সব সময়। কতদিন দেখেছি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন দেবমূর্তির দিকে, চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ছে। এক একসময় ভাবতাম, এ আধ্যাত্মিক সম্পদ উনি পেলেন কী করে?

বললাম, তোমার সঙ্গে আলাপ বুঝি এইখানে? কেমন করে হল?

সে অনেক কথা, নটরাজন বললে, সেই যে মেয়েটির কথা তোমাকে বলেছিলাম—

হ্যাঁ, বলে উঠলাম, সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি, তোমার প্রণয়িণী সেই মেয়েটি কে?

প্রণয়িণী? নটরাজন বললে, না। সে কথা আর বলা চলে না। তবে সেদিন আমি

ভালবাসার কথা জানতে পেরে সরস্বতী আম্মা নিজেই এসে একদিন আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। কী অপূর্ব স্নেহপ্রবণ মন! বললেন, বাবা, আমার কাছে এসে তুমি থাকো।

কিন্তু মেয়েটি কে?

নটরাজন একটু থেমে, তারপরে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলে, ভামতী।

হঠাৎ মনে হল, চারিদিক অদ্ভুত নির্জন হয়ে গেছে। যত সংক্ষেপে আর সহজে নটরাজনের কথা আমি বলতে পারলাম, অত সংক্ষেপে, অত সহজে, সে আমাকে ওকথা বলেনি। অনেক সময় নিয়ে, অনেক দ্বিধা করে, অনেক ভূমিকার পরে, সে উদ্‌ঘাটিত করেছিল তার মনোরাজ্যের স্মৃতিভাণ্ডারটুকু।

রাতও বোধহয় অনেক। নাচের শব্দও কানে আসছে না, কোনও গানের সুরও আর শোনা যায় না। শুধু নটরাজনদের ঘরের খোলা জানলাটার বাইরে স্বর্ণ-চাঁপা গাছটার ওপরে চাপা জ্যোৎস্নার আলো এসে ঠিকরে পড়েছে, ঝিরঝিরে একটা হাওয়া লেগে পাতাগুলি কাঁপছে, আর ভেসে আসছে পাতায়-পাতায় ঢাকা প্রস্ফুটিত চাঁপাফুলের মৃদু সৌরভ।

কোথাও কোনও কোলাহলের সুর নেই, একটা রাত-জাগা পাখির ককিয়ে ওঠাও শোনা যায় না, অপরূপ নিস্তব্ধতায় ভরে গেছে চারিদিক। নটরাজনের পাশে খাটের ওপরে আমিও বসে আছি দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, আমারও যেন আর-কিছু করবার নেই, উঠে চলে যাবারও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু এই অখণ্ড নীরবতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা, মগ্ন করে রাখা।

হঠাৎ বীণার তারে ঘা দিল নটরাজন! গমকে-গমকে মীড়ে-মীড়ে যেন দুঃসহ এক অন্তর্বেদনাই মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে! জানলার বাইরে আকাশ আর চাপা-জ্যোৎস্নার আবছা আলোছায়ার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর মনে হল, বিচ্ছেদময়ী রাত্রিই বুঝি বুকফাটা কান্নায় গুমরে মরছে।

বহুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর চোখ ফেরালাম নটরাজনের দিকে। নিমীলিত দুটি চোখ, মুখের ভাবে অদ্ভুত এক প্রসন্নতা—সুর-পরিবর্তন করে বসন্ত জাতীয় কোনও প্রাপ্তি-প্রমত্ত সুরের রাজ্যে অবগাহনে নেমেছে সে যেন! এই জাতীয় সুর বেহালায় বা এস্‌রাজে আমাদের দেশেও শুনেছি, কিন্তু বীণার তারে যে স্বাভাবিক স্বর জাগে, তা যেন আপনিই মাদকতায় ভরা—সেই স্বরে আবার জেগেছে ওই সুর, সমস্ত মনটাকে যেন মুহূর্তে মাতিয়ে দিল।

বীণাকে আঁকড়ে ধরেছে সে মদমত্তা কোনও রমণীর মতো! মনে হচ্ছিল, মাত্র একটি যন্ত্রই নয়, যেন কোনও প্রেমিকা নারীর সুসম দেহ-বীণায় পরম প্রেমভরেই সুর তুলেছে নটরাজন। কত দণ্ড পল অনুপল এমনভাবে যে কেটে গেল কে জানে! একসময় সে বাজানো থামিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ বীণাটিই দু'হাতে জড়িয়ে ধরল অতি আদরে। তারপরেই গভীর তৃপ্তিভরেই মাথাটা রাখল বীণার এক দিকে।

কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল ওর ভাবভঙ্গি। বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছি। একসময় ও মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু যেন অবাকই হল। হঠাৎ যেন ততক্ষণে তার স্মরণে এল আমার উপস্থিতি। অপ্রতিভের মতো একটু হেসে, বীণাটি অতি সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে নেমে দাঁড়াল খাট থেকে।

মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কটা বেজেছে?

হাতঘড়ি দেখে জবাব দিলাম, তিনটে বেজে গেছে!

শশব্যস্তে আলনার দিকে এগিয়ে কিছু কাপড়-চোপড় এবং কী কী যেন হাতে তুলে নিল, তারপরে এল আমার কাছে, বললে, ওঠো। না হলে দেরি হয়ে যাবে।

কীসের?

অসহিষ্ণু হয়ে বললে, তুমি নামো দেখি খাট থেকে?

নামলাম। বললে, এসো, স্নান-টান সব সেরে ফেলি। এর পর মেয়েরা উঠে পড়বে, তখন মুশকিল হবে।

কেন?

বললে, আজ ভারাহালুর 'আব ম্' মনে নেই? শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের সেই সরোবরে সবাইকে স্নান করতে হয় আজ। এসো এসো –আর দেরি কোরো না।

আমিও স্নান করব নাকি?

নিশ্চয়ই।

ঠাণ্ডা লাগবে যে!

লাগবে না। এসো। গঙ্গার লুকোনো ধারা ওতে এসে মিশেছে বলে সবার বিশ্বাস।

বাইরের ঘরের দরজাটা খোলা। তক্তপোশের ওপর শুধু বিশ্বনাথমই শুয়ে আছে, নারায়ণ নেই, একটা বালিশ শুধু পড়ে আছে বিশ্বনাথমের মাথার পাশে।

বিশ্বনাথমের ঘুম ভাঙিয়ে ওকে বলব নাকি, সরোজার সঙ্গে আমার আর দেখা করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই? তার সঙ্গে প্রয়োজন আমার মিটে গেছে?

কিন্তু থাক, আরতির সময় মন্দিরে না গেলেই হল। ক্রমে ক্রমে বিশ্বনাথম সবই বুঝতে পারবে।

নটরাজন বললে, দেখলে? নারায়ণ ভাইয়ের স্নান বোধহয় এতক্ষণে শেষ হয়ে এল।

টানতে টানতে আমাকে নিয়ে চলল সেই সরোবরের তীরে। এ গলি সে গলি করে অন্ধকারে কিভাবে যে আমাকে পার করে আনল, ও-ই জানে। সরোবরের ঘাটে রানার পাশে একটা হারিকেন জ্বলছে। আমরা যতক্ষণে পৌঁছলাম, দেখি নারায়ণের স্নান সত্যি সারা হয়ে গেছে।

নটরাজনকে দেখে বললে, শীগগির সেরে নাও। মেয়েরা এসে পড়বে এখ্খুনি।

তারপরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, তোমাকেও ধরে এনেছে বুঝি? নাও, তুমিও স্নান কবো। 'আরঙ্গেত্রম' দেখবে তো? মন্দিরে অস্নাত যেতে নেই।

নটরাজন বাড়তি কাপড়-চোপড়-গামছা এসব এনে দিল স্নানের জন্য,—তেল আর সাবান পর্যন্ত ভোলেনি। হাতে এগিয়ে দিল একটা নিমের দাঁতন। বললে, শীগগির।

নারায়ণ বললে, সারারাত জেগেছ তো নটরাজনের পাল্লায় পড়ে?

তুমি জানলে কী করে! প্রশ্ন করে, তারপরে একটু হেসে বললাম, বাস্তবিক, কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গেল, নিজেই বুঝতে পারিনি।

তা-ই হয়, নারায়ণ বললে, ওর বীণায় এমনি জাদু। আমরা একবার গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এমন তন্ময় হয়ে শুনছিলে যে, আমরা আর তোমার ধ্যান ভাঙিনি।

তোমরা! বললাম, তুমি আর সরোজা?

না, সে বললে, আমি আর ভামতী।

ভামতী!

অবাক হচ্ছ কেন? ও এসেছিল তোমায় ডাকতে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

বললাম, তা ডাকলে না কেন?

নারায়ণ বললে, আমিই বারণ করলাম। ও বললে, খেয়ে আসেনি যে। বললাম, ভারাহালু প্রসাদ খাইয়েছে।

আমি বলে উঠলাম, ব্যস! তোমার কথা শুনেই চলে গেল?

গেল। কিন্তু বোধহয় রাগ করেছে, নারায়ণ কণ্ঠস্বর নামিয়ে একটু কৌতুক করেই বলে উঠল, মান ভাঙাতে হবে তোমাকে।

চুপ করে রইলাম।

নারায়ণ বললে, মন্দিরে দেখা হবে ওর সঙ্গে তোমার। ও-ও আসবে তো? দেখলেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা, আমি যাই। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো।

বাইরে ঠাণ্ডা থাকলেও সরোবরের জলটা গরম। স্নানাদি সেরে, লণ্ঠন হাতে ফিরে এলাম আমরা, বিশ্বনাথম ততক্ষণে উঠে বাইরে গেছে, নারায়ণ ভাই নবগ্রহের পূজা সেরে নিচ্ছে, মেয়েরা তখনও কেউ ওঠেনি।

আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে বসলাম। ভিজে কাপড়গুলি বাইরের উঠানে তারে মেলে দিয়ে এল নটরাজন। তারপরে খাটের উপর বসল এসে কাছে। বললে, ভারাহালু উঠেছে। এইবার সবাই উঠবে একে একে। স্নানে যাবে।

বললাম, কাল রাত্রে অদ্ভুত এক মূর্তি দেখলাম তোমার!

বললে, অদ্ভুত কিছু নয়, তবে তুমি বুঝতে পেরেছিলে?

কী বুঝব?

মুখের দিকে তাকাল, একটু হেসে বললে, বোঝোনি বুঝতে পারছি। কিন্তু বোঝাবই বা কী করে?

কী? বলতে চাইছ কী?

বললে, ভামতীর কথা বলছিলাম! কিন্তু আজ আমার মনের মধ্যে সে নেই! তাকে ভুলতেই বীণা নিয়েছিলাম তুলে, আজ ঐ বীণা আমার সমস্ত মন-প্রাণ জুড়ে আছে। যে কোনও মেয়ের সঙ্গ থেকে ঢের বেশি আনন্দ দেয় ও।

বলে, সামনে-রাখা বীণার তারে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল।

বললাম, তুমি জিতেন্দ্রিয়।

না, মুখ তুলে বললে, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে বীণাটিকে ভালবাসি। বড় যত্নে রাখি। ভেঙে গেলে আমি মরেই যাব।

একটু থেমে আবার বললে, সরস্বতী আম্মার ঘরে রেখেছিলাম, নিভৃতে বসে বাজাতাম। হল সরস্বতী আম্মার অসুখ, বাড়ল ভিড়, বীণা নিয়ে এখানে চলে এসেছি। ওকে বাজালে, আমার দেহ-মন-প্রাণ সব মেতে ওঠে।

বললাম, মন-প্রাণ তো বুঝলাম, কিন্তু 'দেহ' কথাটা ব্যবহার করছ কেন?

অকস্মাৎ হাত বাড়িয়ে আমার হাতদুটি ধরে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললে, পুরুষে পুরুষে কথা বলছি। এ-কথা মেয়েরা বিশ্বাস করবে না। বন্ধু, এই বীণায় যখন সুর তুলে ক্রমশ তন্ময় হয়ে যাই, তখন আমার মন নয়, দেহটা পর্যন্ত মত্ত হয়ে ওঠে।

শিরায় শিরায় রক্তস্রোত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কানে কানে শুনবে? পুরুষ স্ত্রীকে ভালবেসে যা পায়, আমি তা পাই এই আমার বীণার কাছ থেকে। এ তো মাত্র বীণা নয়, যেন জীবন্ত স্ত্রী-শরীর!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শ্রীকৃষ্ণের মূল মন্দির নয়, ওদেরই 'পল্লী'র মধ্যে একটি ছোট্ট মন্দির, এ মন্দিরের দেবতাকে ওরা পুরুষোত্তম বলে ডাকে। সেই মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে যে নাটমন্দির, সেখানেই শুরু হল ভারাহালুর আরঙ্গেত্রম।

সব মেয়ে আমাকে চেনে মনে হল, আমি অনেককেই চিনি না। একটা সাদা কালো-পাড় সিল্কের শাড়ি পরে হাতে পুজোর থালা নিয়ে গর্ভগৃহের দিকে চলে গেল ভামতী। আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে সাড়া দিল না, আমাকে পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে গর্ভগৃহ থেকে ভারাহালুকে সঙ্গে নিয়ে নাটমন্দিরে পৌঁছে দিয়ে আবার সে ফিরে গেল যথাস্থানে। দেবতার সামনে পুরোহিতের পায়ের কাছে বসে রইল।

ততক্ষণে সূর্যোদয়ের প্রথম আলো এসে পড়েছে মন্দির-চত্বরে। মাঝে অনেকখানি জায়গা রেখে পাশে পাশে বসেছে সবাই, দেবতার দিকে যথাসম্ভব মুখ করে। পাঁচজন যন্ত্রী বসে আছে যন্ত্র নিয়ে। একজন মৃদঙ্গ, একজন বাঁশি, একজন সারেঙ্গি, একজন সেতার, আর একজন নিয়ে বসেছে এস্‌রাজের মতো একটা যন্ত্র, তার একটা দিকে ময়ূরের মূর্তি বসানো ওরা বললে, যন্ত্রটির নাম—তাউস।

আমাকে পাশে নিয়ে একদিকে বসে আছে নটরাজন হাতে ছোট্ট একজোড়া খঞ্জনি নিয়ে। পরনে ভারাহালুরই দেওয়া সিল্কের ধুতি, পাঞ্জাবি আর চাদর। অন্যদিকে একান্তে বসে নারায়ণ, চন্দনচর্চিত ললাট, খালি গা, পরিধানে পট্টবস্ত্র। যন্ত্রীরাও তাই—খালি গা, পরনে পট্টবস্ত্র। ললাট চন্দনচর্চিত।

নৃত্যারতির আরম্ভে একটি মেয়ে প্রত্যেকের কপালে কুঙ্কুমের ফোঁটা দিয়ে গেল, এমন কি আমার কপালেও। মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বেজে উঠতেই একযোগে সবাই প্রণাম জানাল দেবতাকে। পুজো শেষ। এইবার নৃত্য হবে। সমস্ত মন্দিরটাই ভরে গেছে সুবাসিত ধূপ আর ধুনোর গন্ধে।

আলপাকা রংয়ের রেশমী কাপড় পরেছে ভারাহালু নাচবার উপযোগী করে। দুটি পা পেঁচিয়ে কাপড়ের দুটি প্রান্ত কটিদেশ বেষ্টন করে উঠেছে। একটি প্রান্ত তারপরে দু'ভাঁজ হয়ে মেখলার মতো জড়ানো। অপর প্রান্ত, অর্থাৎ যেটি আঁচলের দিক, সেটি কোমর ছাড়িয়ে পিঠ দিয়ে বাম কাঁধে উঠে, আবার নেমে, বুকে কিছুটা ছড়িয়ে গিয়ে কটিবন্ধ ছাপিয়ে সামনের দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে ছত্রাকার পাখার মতো। পায়ে ঘুঙুর, কটিতে জরির-কাজ-করা কালো ভেলভেটের বন্ধনী, গলায় হার, হাতে দু'গাছি করে চুড়ি, বাহুমূলে বাজুবন্ধ, নাসিকায় আর কানে হীরের মতো দ্যুতিময় শুভ্র পাথরের বিন্দু, শিরে—সিঁথিতে সোনার টিক্‌লি, বেণীবদ্ধ কেশরাশির মূলে একগুচ্ছ সেঁউতি ফুল, গায়ে আলপাকা রঙেরই চেলি।

রাত্রে প্রথম দর্শনে মেয়েটিকে একটু চটুল ধরনেরই মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেই চটুলতা? ধুনুচিতে বাতাস করলে ধোঁয়া যেমন এঁকেবেঁকে চারিদিকে

ছড়িয়ে যেতে থাকে, মেয়েটির নৃত্যভঙ্গি দেখে আমার মনে হচ্ছিল, এঁকেবেঁকে তেমনি করেই যেন দেবতাকে আরতি করছে সে।

একসময় আমার কানে কানে নটরাজন বললে, প্রাচীনকালে দাসী তিনরকম ছিল। রাজদাসী, দেবদাসী আর স্ব-দাসী। নাটমন্দিরের সামনে ধ্বজদণ্ড বা গরুড়স্তম্ভ দেখলে না? ওর সামনে নাচত যারা, তাদের বলত রাজদাসী। দেবতার সামনে যারা নাচত, তারা দেবদাসী। আর স্ব-দাসীরা নাচত বিশেষ কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাত্র। এরা নাকি ওর তিনটের একটাও নয়, এরা হচ্ছে দেববধূ। এরা এসব নাচের জন্য নয়। এদের নাচ ছিল লাস্যভাবের নাচ! মালাবারের কথাকলির কিছুটা প্রভাব আর তাঞ্জোরের মন্দির-নৃত্যের কিছু প্রভাব—এই দুই মিলিয়ে ছিল 'মোহিনী আট্টম'! সরস্বতী আম্মার কাছে শুনেছি, মোহিনী আট্টম ছিল দেববধূদের নাচ। অবশ্য এসব প্রাচীনকালের কথা।

মাথার ওপরে দুটি হাত জড়ো করে এবং কখনও বা দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে, চোখে আর হাতের ভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে, মাথা নাড়িয়ে, পায়ের ছন্দে তাল রেখে, চমৎকার নাচছিল ভারাহালু। নটরাজন বললে, একে বলে আলারিপ্পু বা আলারিম্পু। কথাটার মানে হচ্ছে—ফুল দিয়ে সাজানো।

বললাম, তা ঠিক। মেয়েটি যেন নৃত্যভঙ্গিতে ফুল দিয়েই তার দেবতাকে সাজাচ্ছে।

বললে, সবই ও অল্পে অল্পে দেখাবে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখি, দুটি মেয়ে বসে বসে অনেকটা আমাদের তানমালার মতো কী সব শব্দ উচ্চারণ করছে সুরে সুরে, আর নটরাজন নিজে উচ্চারণ করছে 'বোল', আর সঙ্গতি রেখে মেয়েটি নাচছে নানান ভঙ্গিতে।

এক সময় থেমে গেল মেয়েদের সুর, থেমে গেল নটরাজন। তারপরে নটরাজন বললে, যেটা হল, একে আমরা বলি, যতিস্বরম। সঙ্গে কী সুর শুনলে? তোড়ি-বসন্ত। এবার 'পদম' শোনো!

এবার আর-একটি মেয়ে শুরু করল গান, সেই গানের অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে মুখের ভাবে ও অঙ্গভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে লাগল ভারাহালু।

নটরাজন বললে, এই সুরটিকে আমরা বলি, আনন্দভৈরবী।

ভারাহালুর নাচের তালে তালে মেয়েটি গাইছে, মাঞ্চিদিনমু...সুন্দর দিন! কেন সে আমার চোখের আড়ালে গেল। আড়াল থেকে সে আমাকে দেখছে লুকিয়ে লুকিয়ে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না তাকে। সখী, তাকে আসতে বলো। তাকে আমি বুকের নিধি করে রাখব। সখী, আমি কি তারই নই? আসছে না কেন? বলো যে আমাকে অত ভালবাসে, তাকে আমি ছাড়ব কেমন করে?

নাটমন্দির থেকে দেবতার দিকে মুখ করলে সামনে পড়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরেই মূল মন্দির, প্রথমে চত্বর, তারপরেই গর্ভগৃহ। ফুলের মালায় শোভিত হয়ে রুপোর পদ্মফুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে, মাথার উপরে চন্দাতপ!

ভারাহালুদের পদম-এর শেষ চরণটি শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই চোখ গেল গর্ভগৃহের দিকে। দেখি, চত্বরের এক কোণ ঘেঁষে এমনভাবে বসে আছে ভামতী, যাতে করে সহজেই দেখতে পায় আমাকে।

আমাকেই সে দেখছিল নিষ্পলক চক্ষু মেলে। চোখে চোখ মিলে যেতেই তাড়াতাড়ি

নত করেছে মুখ, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে সামনের থালায় রাখা নৈবেদ্যর সঙ্গে সাজানো ধূপদানিটার নিবে-যাওয়া ধূপে করতে লাগল শিখা-সংযোগ; অদূরের অতিকায় প্রদীপ-শিখাটি থেকে শলাকা দিয়ে ধূপের শিরে শিখান্তর।

দেখতে দেখতে একসময় শেষ হয়ে গেল আরঙ্গেত্রম। মেয়েরা এসে হাতে প্রসাদ দিল। বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, এবার যে-যার ফিরে যাওয়ার পালা, আমার চোখ কিন্তু সবার অলক্ষ্যে, ভামতীকেই অনুসরণ করছে। গর্ভগৃহেই কিছুক্ষণের জন্য তাকে দেখলাম কী কী সব অনুষ্ঠানের মধ্যে। তারপর হঠাৎ সে ভিড়ে হারিয়ে গেল। নটরাজন আমার হাত ধরে বললে, চলো, ঠাকুর প্রণাম করে আসি।

চলো।

নারায়ণও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একসময় নিম্নকণ্ঠে বললে, এ মন্দির পুরনো নয়, প্রাচীন স্থাপত্যের কোনও নিদর্শন নেই। কংক্রিটে তৈরি। ঘনশ্যামদাসজী অনুগ্রহ করে দেবপল্লীর জন্য করে দিয়েছিলেন। মূর্তিও তৈরি করে আনিয়েছেন কাশী থেকে।

মেয়েরা এদিক-ওদিক দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, প্রণাম করে চলেই যাচ্ছে এবার। কিন্তু কোথায় ভামতী?

নটরাজন আমার হাত ধরে বললে, চলো। এবার শ্রীকৃষ্ণের মূল মন্দিরে। সবাই প্রণাম করতে যাচ্ছে।

চলো।

মূল মন্দিরেও সে নেই। তার অন্য সব মেয়েদের নিয়ে নারায়ণ প্রণাম সেরে চলে গেল। অন্য সব মেয়ে, কিন্তু সরোজা নয়। সরোজাকে কোথাও দেখতে পাইনি, সম্ভবত সে আসেইনি, যোগই দেয়নি এই অনুষ্ঠানে। এলে, নিশ্চয়ই দেখা মিলত।

ওদের পিছনে পিছনে আমরাও চলে আসছিলাম। নটরাজন হাত ধরে টেনে বললে, এসো।

কোথায়?

এসোই না?

মন্দিরের পাশের সেই ঝিলটা। বাঁধাঘাট ছাড়িয়ে সে ঘাটের বিপরীত দিকে নিয়ে এল। হঠাৎ দেখতে পেলাম বিশ্বনাথমকে। চোখে তার সেই পুরু কাচের চশমাটা নেই, ভাল দেখতেও পাচ্ছে না বোধহয়, আন্দাজে পা ফেলে চলছে। স্নান-টান সেরে পট্টবস্ত্র পরে একটা কলাপাতার ঠোঙায় বাগান থেকে নানা ফুল তুলছে, সঙ্গে একটি মেয়ে। দূর থেকে ঠিক চিনতে পারলাম না। কিন্তু এত সকালে ওরা ওখানে কেন?

ওই দিকে নটরাজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, কী ব্যাপার!

নটরাজন বললে, ওসব বুঝবে না! নারায়ণের ব্যাপার। পূজা-অর্চনা বারব্রত এসব লেগেই আছে। আমি ওসব জানিও না বুঝিও না, তবে ভালবাসি নারায়ণভাইকে, সে তো তুমি জানো।

গাছপালার আড়ালে একটা গাছের ছায়ায় নিরিবিলিতে আমরা বসলাম।

কিছুটা দূরেই সেই বৃদ্ধ বেলগাছটা, যার পায়ে এসে আমি ভামতীরই লুকিয়ে রাখা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যেতাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কী নাম হবে তোমার কাল?

মুচকি হেসে বলত, বুড়ো বেলগাছটার পায়ে গিয়ে সাধ্য-সাধনা করো, জানতে পারবে।

গাছটার দিকে তাকাতে তাকাতে সেই সাধ্য-সাধনার কথাই মনে পড়ছিল। আর

আশ্চর্য হচ্ছিলাম নিজের শরীরের অবস্থা দেখে। কাল সারাটি রাত ঠায় জেগে কাটিয়েছি, কিন্তু তা বলে শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ছে না তো শরীর, ঘুমও তো আসছে না চোখ জড়িয়ে! তবে কি ঝিলের জলে রাত থাকতে উঠে স্নান করারই ফল এটা? ঐ তো বাঁধাঘাট, যেখানে লণ্ঠনের আলোয় স্নান করেছিলাম কাল রাত্রে!

চুপচাপ বসে কী যেন ভাবছিল নটরাজন, হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, কী ভাবছ?

কিছু না।

বললে, তোমাকে কয়েকটা কথা বলব বলে ডেকে আনলাম। অবাক হয়েছ কাল রাত্রে আমার অবস্থা দেখে, না?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ও কী বলতে চায়! তবু সরাসরি কথাটা না তুলে বললাম, খুব আশ্চর্য হইনি। ভামতী ভালবাসার মতোই মেয়ে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ছিঃ ছিঃ, সেকথা আমি বলিনি। সে মালা ছিঁড়ে গেছে বহুদিন, সে উন্মাদনা আর অনুভবও করি না। আমার সমস্ত মন ছেয়ে থাকে ওই বীণা আর ওর সুর। আমি সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি। অবাক হওনি তো?

বললাম, খুব না। কী একটা বিদেশী পত্রিকায় যেন একবার পড়েছিলাম এক বিদেশী বেহালাবাদকের কথা। তার কাছে তার বেহালাটাই ছিল যেন এক তরুণী নারীশরীর, বেহালায় হাত দিয়ে সে যেন তার প্রিয়তমারই স্পর্শসুখ অনুভব করত!

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল নটরাজন, তাহলে সত্যিই এটা হয়! আমি পাগল হয়ে যাইনি তো! মাঝে মাঝে মনে হত, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি তো অদ্ভুত লোক! এই শুনতাম, অরসিক বিজ্ঞানী তুমি, মাটির নিচে কোথায় লোহা আর কোথায় কী পাথর, এই সবেরই খোঁজ করে বেড়াও, এখন দেখছি, রসের খোঁজও রাখো। বিদেশী বেহালা-বাজিয়ের খবরও তো রেখেছ দেখছি!

ঈষৎ লজ্জিত হয়েই বলে উঠলাম, ও কিছু নয়। হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়েছিল পত্রিকাটা। আসলে কাঠখোট্টা মানুষ আমি, কোদালকে কোদাল বলাই আমার অভ্যেস। আজেবাজে স্বপ্ন দেখি না।

কিন্তু আমি দেখি। নটরাজন আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগল, সেটা বলব বলেই ডেকে আনলাম তোমাকে। আমি তামিলনাদের লোক, ভারাহালুকে আমাদের তাঞ্জোরের ভরতনাট্যম শিখিয়ে আমার সুখী হবারই কথা। তুমি তো জানো, আমার স্বপ্ন—ওদের মধ্যে থেকে আমি গায়িকা আর নৃত্যশিল্পী গড়ে তুলব। কিন্তু তার থেকেও বড় সাধ, বড় স্বপ্ন আমার আছে।

কী?

বললে, অন্ধ্র মেয়েকে ভালবাসতে গিয়ে সারা অন্ধ্রদেশটাকেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। ভরতনাট্যমেরই একটি প্রায় অপ্রচলিত প্রাচীন ধারাকে অন্ধ্রদেশ ধরে রেখেছে। বহু যত্নে সেই ধারাকে আমি আয়ত্ত করেছি। আমি সেই ধারায় শিক্ষিত করে যেতে চাই এদের অন্তত একজনকে।

কেন?

প্রচার হোক এই ধারার। যদিও এ নাচ পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশের 'দাসী আট্টম' যেমন পুরুষরা শিখছে, এ নাচটাও মেয়েরা শিখুক, ক্ষতি কী? কিন্তু

বড় শ্রমসাধ্য সে নাচ। বড় যত্ন, বড় নিষ্ঠার দরকার। আমার শরীর ঠিক তার উপযুক্ত নয়, এ নাচের উপযোগী শরীরে চাই সুগঠিত মসৃণ দেহলাবণ্য। যার মধ্য দিয়ে এ নাচ বেঁচে থাকবে, যার মধ্য দিয়ে এ নাচের প্রকৃত রূপায়ণ দেখতে পাবে লোকে।

বললাম, কিন্তু নাচটা কী?

বললে, কৃষ্ণানদীর অববাহিকায় প্রাচীন একটি গ্রাম আছে, তার নাম কুচিপুডি। প্রায় চারশো বছর আগের সৃষ্টি এই নৃত্যধারা। তাঞ্জোরপ্রবাসী এক তেলেগু ব্রাহ্মণ, তীর্থনারায়ণ, তিনিই এর মূল প্রেরণা। পরম ভক্ত ছিলেন তিনি, গান করতেন 'গীতগোবিন্দম', তোমাদেরই দেশের কবির রচনা। এঁরই শিষ্য সিদ্ধেন্দ্র যোগী রচনা করেছিলেন 'পারিজাত-অপহরণ' নামে এক নৃত্যনাট্য। তাঞ্জোর থেকে কুচেলাপুরমে এসে (তখন 'কুচিপুডি'র নাম ছিল 'কুচেলাপুরম') ওখানকার ছেলেদের শিখিয়ে পড়িয়ে শুরু করলেন সেই নৃত্যনাট্য-প্রদর্শনী। এই নৃত্যধারারই নাম, কুচিপুডি নৃত্য। এই নৃত্যের মূল প্রেরণা কিন্তু তোমাদেরই কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দম। পরে ভাগবতের আরও উপাখ্যান গ্রহণ করা হল। 'পারিজাত-অপহরণ' বা 'ভাম-কলাপম্' তার মধ্যে বিশেষ একটি।

কথাটা শুনে একটু চমকেই উঠলাম এতক্ষণে, বললাম, কী বললে, ভাম-কলাপম্?

হ্যাঁ। শুনেছ নাকি কথাটা?

শুনেছি। ভামতীর কাছ থেকে।

আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ, বললে, ভোলেনি তা হলে?

কী?

নটরাজন বললে, ভামতীর সুসম শরীরই এই নাচের উপযুক্ত। সত্যভামার ভূমিকায় এখানকার এত মেয়ের মধ্যে মানায় মাত্র ওকেই।

শেখাও না কেন?

মুখ নিচু করল নটরাজন, কেমন বিরস বিবর্ণ মুখে বললে, শিখতে চায় না।

কেন?

কে জানে! বলেই ফিরল আমার দিকে, তুমি ওকে কত ভালবাসো জানি, কিন্তু দেখো, ঐ অপরূপ দেহছন্দ যেন ভেঙে না পড়ে। স্বাস্থ্য না থাকলেও এ নাচ হয় না, প্রচুর দম না থাকলে এ নাচে সফল হওয়া যায় না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলাম, নটরাজন?

কী?

তুমি ওকে চাও, একথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করো কেন?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল নটরাজন, না ভাই, সেটা সত্য নয়। বিশ্বাস করো। উপভোগে আমার রুচি নেই, আমার রুচি শিল্প-সৃষ্টিতে।

বললাম, ভালও ওকে বাসো তুমি মনে মনে।

বললে, মনে মনেই যদি তা থেকে থাকে, বাহ্যিক প্রকাশ যদি তার না ঘটে থাকে, তাতে কি কোনও ক্ষতি হয়েছে?

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, কিছুমাত্র না। ঐ যে বীণা তুমি রাত্রে বাজাও, ও তোমার ভামতীরই প্রতীক।

বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল নটরাজন।

কী মনে করে নারায়ণের কাছে আর গেলাম না, গেলাম না ভামতীর বাসাতেও, দরজার কাছে গিয়েও ফিরে এলাম। কী এক প্রচ্ছন্ন অভিমান বুকে করে ফিরে এলাম নিজের বাসায়, রামদাসজী আর পাম্বলুর সংস্পর্শে।

দুজনে বোধহয় ঘনশ্যামদাসজীর সেই চাদর-পাতা গদিতেই বসে বৈষয়িক কথাবার্তায় মগ্ন। আমার আসাটা ওরা বোধহয় প্রথমটায় লক্ষ্য করেনি। আমি দোতলার সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠেও আবার নেমে গেলাম। ভঙ্গিতে একটা খুশির আমেজ এনে হাঁকডাক করে উঠলাম, কই, পাম্বলু এসেছ নাকি? রামদাসজী কোথায়?

বন্ধ হয়ে গেল ওদের কথাবার্তা, আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। রামদাসজী সমাদরে আহ্বান জানালেন, আসুন বাবুজী।

বললাম, তেমনি সতেজ আর উৎসাহপূর্ণ আমার কণ্ঠস্বর, রামদাসজী, আমার প্রস্‌পেক্‌টিংয়ের কাজ বহুদিন হল পড়ে আছে, আজ আমি বেরিয়ে পড়বই। জনাতিনেক কুলি তুমি জোগাড় করো তো পাম্বলু।

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন রামদাসজী, বললেন, যে হবে'খন। এই বোধহয় এলেন, আগে একটু বিশ্রাম করুন।

বিশ্রাম আমার হয়ে গেছে, আমি এখুনি বেরুতে চাই। চা খেয়েই।

রামদাসজী বললেন, তাহলে এখানেই চা খান। আমি ভজুয়াকে বলি।

বললাম, চা খান আপনি? আপনার বাবা কিন্তু খেতেন না।

হেসে উঠলেন রামদাসজী, বাবা সেকেলে মানুষ।

একটু পরেই রামদাসজীর খাস চাকর চা করে নিয়ে এল। সঙ্গে মাখন-মাখানো পাঁউরুটির টোস্ট আর কিছু বিস্কুট।

বললাম, সবই নব্য আয়োজন দেখছি।

রামদাসজী একটু হাসলেন শুধু, কিছু বললেন না।

খেতে খেতে বললাম, আপনার বাবার সেই পোষা ইঁদুর বাচ্চুর কথা মনে পড়ছে। এমনি সকালবেলা ডাকলেই সে আসত।

বাবুজী, রামদাসজী বললেন, গণেশজীর বাহন হিসাবে ইঁদুর পোষার সংস্কার আমার নেই। কিন্তু সেকথা থাক। প্রস্‌পেক্‌টিংয়ে যে যাবেন, তার আগে আপনার সঙ্গে আমার একটু জরুরি পরামর্শ আছে।

বলুন?

বলছিলাম কি, প্রস্‌পেক্‌টিং করে আর কী হবে? এখানকার ব্যবসা ফলাও করার ইচ্ছা আমার নেই।

ওঁর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালাম, তার মানে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির ব্যবসা করার ইচ্ছে আপনার নেই।

আছে। যে-কোয়ারিতে আপনি পরীক্ষা করেছেন, এই কোয়ারিই যথেষ্ট। কোয়ারি আর বাড়াতে চাই না।

কিন্তু আমার মন যা সেই মুহূর্তে চাইছিল, সে হল কাজ। যত সত্বর সম্ভব কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়া। কেন তা জানি না, কাজের নেশা আমায় তখন পেয়ে বসেছে। উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, বেশ। কিন্তু আমি প্রস্‌পেক্‌টিং বন্ধ করব না। এই পাহাড়-অঞ্চলটায় ভাল পারসেন্টের ম্যাঙ্গানিজ 'ওর' পাব বলে আমার বিশ্বাস। আমি আরও স্যাম্পল তুলে

আমার হেড-অফিসে পাঠাব, তারা অন্য পার্টি খুঁজবে। আপনি ও-অঞ্চলটা লীজ নিয়েছেন, একটা ট্যাক্স আপনি পাবেনই।

সেকথা ভাবছি না বাবুজী। বলতে বলতে রামদাসজীও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ব্যবসাতে টাকা ফেলতে কসুর করব না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অন্য কথা। ম্যাঙ্গানিজ 'ওর' আমাদের ন্যাশনাল ওয়েলথ, একথা মানেন তো?

নিশ্চয়ই।

বিদেশী সওদাগর এসব নির্বিচারে বাইরে চালান দিত, কিন্তু স্বাধীনতার পর আমরা তা করব কেন? 'ওর' চালান দিতে দিতে একসময় দেউলে হয়ে যাব না?

বললাম, হাসালেন আপনি। ভারতবর্ষ অঢেল দিতে পারে। কত নেবে নিক না ওরা।

একথা অনেক কাল আগে, যখন প্রথম আসতে লাগল বিদেশী সওদাগর, তখন ভেবেছিল সবাই। ভেবেছিল, কত নেবে, নিক না। ভারতবর্ষে মণি-মাণিক্যের অভাব আছে? অঢেল দিয়েও ফুরাবে না। কিন্তু ফুরিয়েছিল। আজ আমরা ভিখারি। নয় কি?

ওর মুখের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। একটু হেসে রামদাসজী বললেন, কী, ভূতের মুখে রাম নাম শুনে অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, ব্যবসায়ী লোকের মুখে এ কী কথা! হ্যাঁ বাবুজী, যুগটাও নতুন, আমি লোকটাও নতুন। আমার বাবার চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তা একেবারেই মিলবে না।

বুঝলাম। কিন্তু ডলার আর্নিংয়ের অন্যতম কমোডিটি এই ম্যাঙ্গানিজ, কমার্সের ছাত্র হয়ে এটা ভুলবেন না।

হাসলেন রামদাসজী, বললেন, সেটা গভর্নমেন্টের ভাববার কথা, আমার নয়। একবার তো গভর্নমেন্ট রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এক অচল অবস্থার। বিদেশ থেকে দরকারি জিনিসপত্রের আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। অতএব বাধ্য হয়ে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, কিন্তু সেসব কূট প্রশ্নে আমাদের দরকার কী? প্রস্‌পেক্‌টিং করেই দেখা যাক না, কোথায় কী সম্পদ আছে! সঙ্গে সঙ্গেই 'কোয়ারি' তৈরি করে মাল তুলে যে রপ্তানি করতে হবে, তার কী মানে আছে?

রামদাসজী বললেন, তাতে আপনার সঙ্গে হাত মেলাতে আমি রাজি। কোয়ারিও করব, যদি দেশী ফ্যাক্টরি মাল নেয়। আসল কথা, দেশের জিনিস দেশেই থাকুক। আমাদের কাঁচামাল নিয়ে বাইরের লোক যে সেটা দিয়েই অস্ত্র তৈরি করে আমাদের ওপর ফেলবে, এটা মেনে নিতে রাজি নই।

ব্রেভো! বললাম, একমত আপনাব সঙ্গে। তাহলে আমবা বেরিয়ে পড়ি এখন, কী বলেন?

রামদাসজী বললেন, দাঁড়ান, আমিও যাব।

অতএব পূর্ণোদ্যমেই কাজ আবার শুরু হল। যা চেয়েছিলাম।

সারাটা দিন খাটবার পর সন্ধ্যায় দু'চোখ ভরে জড়িয়ে এল ঘুম। ঘুমে টলতে টলতে বাড়ি এসে শুয়ে পড়লাম, উঠলাম যার নাম সেই বেলা আটটায় একবারে। রামদাসজীও সমানে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আবার বেরুলাম, আবার সন্ধ্যায় ফিরলাম শ্রান্ত হয়ে। এমনি করে পর পর তিনটি দিন। চতুর্থ দিন রামদাসজী বললেন, আজ একটু বিশ্রাম নিন।

পান্থলুও সমর্থন করল সেকথা। অস্বীকার করব না, মনে মনে একটু বিরতি

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এ ক'দিন কেউ আসেনি আমার খোঁজ করতে। নারায়ণও না, বিশ্বনাথমও না।

সন্ধ্যায় বললাম রামদাসজীকে, আমি একটু বেড়িয়ে আসছি। আজ রাত্রে নাও ফিরতে পারি। আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে রামদাসজী?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি, বললেন, না।

তারপর একটু থেমে থেকে আবার বললেন, বাবুজী, একটা কথা ভাবছি। ভাবছি দেবীপল্লী উঠিয়েই দেব। ও-বাড়িটাকে ধর্মশালা বানিয়ে দেব। আপনি কী বলেন?

বললাম, তা কেন? ওরা কী অপরাধ করল? কিছু করবেন না।

বেশ। আপনি যখন বলছেন, তখন—

হ্যাঁ, আমার কথাটা আপনাকে রাখতেই হবে।

বলে দ্রুতপায়ে চলে এলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে কিছুটা রাত হয়ে গেছে ততক্ষণে। সোজা গেলাম ভামতীর বাড়ি। হয়ত অভিমান করবে, রাগও করবে। আমি তা করব না। বলবও না কিছু। শুধু বলব, কাজের চাপ পড়তে পারে না? আমি কি কুঁড়ে, অকেজো লোক নাকি?

দরজা ভেজানোই ছিল। ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। বুড়ি ঝিটির পাশ কাটিয়ে একেবারে সরস্বতী আম্মার ঘরে। দেখলাম, অনেকটা সুস্থ তিনি। বালিশের পর বালিশ সাজিয়ে, তাতে ঠেস দিয়ে বসে আছেন জানলার দিকে মুখ করে। ঘরে আর কেউ নেই।

পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন, আমাকে দেখে স্নিগ্ধহাসিতে ভরে গেল তাঁর মুখ, বললেন, এ ক'দিন আসোনি কেন?

বললাম, ভামতী কোথায়?

ও-বাড়ি গেছে।

ও!

বসে বসে ওঁর সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম, আর প্রতিটি মুহূর্তেই আশা করতে লাগলাম তাকে। এখুনি ফিরে এসে আমাকে দেখে সে চমকে যাবে। প্রথমেই হয়ত কথা বলবে না, মুখ ভার করে থাকবে। কিন্তু সময় পার হতে লাগল। কোথায় সে? অবশেষে বলেই ফেললাম, এখনও আসছে না কেন?

কে? ভামতী? সে তো আসবে না। আজ থেকে ও-বাড়িতেই সে থাকবে।

মনে মনে চমকেই উঠলাম বলা যায়। মুখ দিয়ে আপনি বার হয়ে গেল, কয়েকটি দিন তার ছুটি ছিল না? এর মধ্যে ছুটি ফুরিয়ে গেল?

না। কিন্তু কী যে মেয়ের মতিগতি, অত করে তোমার নাম ধরে বললাম সে আসবে। তবু শুনল না, জোর করে চলে গেল। বললে, তুমি ভাল হয়ে গেছ মা, মিছিমিছি ছুটির দরকার নেই।

বললাম, দাঁড়ান, তাকে ধরে নিয়ে আসছি।

কিন্তু কাকে? নারায়ণ খাতার পাতায় দেখাল তার নাম, 'বেলফুল'—লালকালি দিয়ে কাটা।

ছুটে চলে এলাম। ভাবতে গেলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু মন সেটি আর সহজভাবে নিতে পারল না। ধাক্কা খেলাম, মিশ্র একটি অনুভূতি হল। রাগ,

অভিমান, বিতৃষ্ণা, সবই যেন পর্যায়ক্রমে ক্রিয়া করতে লাগল মনের মধ্যে। সরোজাব কথাগুলো মনে হতে লাগল, আর তার পাশাপাশি ওর চিন্তাধারা। সত্যি কথা বলতে কি, সে রাত্রিটা যেন একটি অশান্ত দুর্নিবার ঝড়ের মধ্যে দিয়েই আমার কেটেছিল।

কোনক্রমে নিদ্রাবিহীন রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালেই গেলাম সরস্বতী আম্মাব বাসায়। মাকে দেখতে নিশ্চয়ই একবার সে আসবে। মিথ্যা হল না আমার অনুমান, দেখা হল তার সঙ্গে। সরস্বতী আম্মার বাসায়। সরস্বতী আম্মা ধীরে ধীরে উঠে গেলেন পাশেব ঘরে, পুজোয় বসতে। আব ও দাঁড়িয়ে রইল অদূরে, জানলার কাছে দুটি লোহার শিক শক্ত করে দু-হাতে ধরে।

বললাম, তাড়াতাড়ি ও-বাড়িতে ঢুকলে কেন? আমায় এড়াতে? কী অপরাধ আমি করলাম?

উত্তর এল না। উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার করলাম আমার প্রশ্ন। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই! একটা হাত ধরতেই ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দিল, বললে, সে রাত্রে খেতে এলে না কেন?

তুমি তো জানোই।

আমার থেকে নটরাজনের বীণাই তোমার কাছে বেশি হল?

বললাম, সে বীণা যে তুমিই।

তার মানে?

বললাম, নটরাজনের কাছ থেকে সেদিন আমি সব শুনেছি, সব বুঝেছি।

কী বুঝেছ! বলে চট করে ফিরল আমার দিকে, তারপরে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, কিচ্ছু বোঝোনি। বোঝা অত সহজ নয়।

বলে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করতেই সম্ভবত ছুটে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। আমি পিছন পিছন অনুসরণ করে গিয়ে দেখলাম, রান্নাঘরের আগড়টা সে টেনে বন্ধ করে দিল। বুঝলাম, এখন আর সে বেরুবে না আমার সামনে। চলেই আসছিলাম, হঠাৎ কী মনে কবে ফিরে গেলাম আগড়ের কাছে। প্রশ্ন করলাম, নামটা জানতে পাবি কী? আজ কী নাম হবে তোমার?

বন্ধ আগড়টার ও-পাশ থেকে উত্তর এল, জানি না, যাও।

সরস্বতী আম্মা পুজোয় বসেছেন। গোলযোগ না বাড়িয়ে চলে এলাম চুপিচুপি। কিন্তু আশ্চর্য, কালরাত্রির ঝড় আর নেই, মনটা অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেছে। আর সেটা অনুভব করে নিজেও কম অবাক হয়নি।

সে সন্ধ্যায় একটু তাড়াতাড়িই গেছি। নিজেরই ব্যস্ততার জন্য প্রথমটায় চোখ পড়েনি। হাতবাক্সটার কাছে খাতা খুলে দুজনেই ওরা বসে থাকে, নারায়ণ আর বিশ্বনাথম। নারায়ণ আমাকে দেখামাত্রই কী যেন বলতে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিল বিশ্বনাথম, বললে, আজ তোমাকে অনিয়ম করতে দেব না। ফুলের নাম করুক বাবুজী! নবগ্রহ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা এভাবে ভাঙলে পাপ হবে না তোমার?

নারায়ণ তাকাল তার দিকে, বললে, কিন্তু তুমি তো ধর্ম মানো না?

বিশ্বনাথম বললে, ট্রেডের খাতিরে মানছি। এটা আমার ট্রেড। জীবিকাও বটে।

কী বললে!

বিশ্বনাথম সুর নামিয়ে বললে, যাই বলে থাকি, অনিয়ম তুমি করতে পারবে না। নাম করবেন বাবুজী? ফুলের?

করলাম কী যেন একটা ফুলের নাম। টাকাটা হাত পেতে নিয়ে বিশ্বনাথম বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

গেলাম ভিতরে। কিন্তু এ যে অন্য মেয়ে! বললাম, না। থাক।

না বাবুজী, তা হবে না।

তার সঙ্গে যে আমার দেখা হওয়া দরকার।

উপায় নেই।

বললাম, বেশ। এই মেয়েব সাহায্য নিয়েই তার সঙ্গে দেখা কবব।

পারবেন না। তাকে আমি নিজে গিয়ে সাবধান করে দিচ্ছি। তার ধর্মভয় আছে। সে সাহস করবে না। আর আপনি যদি জোর-জবরদস্তি করেন, এবং তাতে নারায়ণ যদি আমাকে সাহায্য না করে, তাহলে আমার যে লোকবল নেই, তা ভাববেন না।

অদ্ভুত রুক্ষ আর কঠিন দেখাচ্ছিল বিশ্বনাথমেব মুখ। বললে, আমিই এখন এখানকাব পুরোহিত, নাবায়ণ নয়।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, তার মানে!

মানে অনেক—

বিশ্বনাথম বললে, নারায়ণকে কতটুকু জানেন আপনি? ও যে ব্রাহ্মণ-সন্তান, তা জানেন? এখানকাব এই কাজটা করত বলে নিজেকে বৈশ্য বলে পবিচয় দিত। অথচ এব কোনও দরকার ছিল না। এ-ও এক ধরনের চীপ সেন্টিমেন্টালিটি।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছিলাম। নারায়ণ চবিত্রের যেন অন্য একটা দিক আমার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল। ব্রাহ্মণেব বৈশ্য অর্থাৎ বণিক সাজা, এ যেন এক সুগোপন কান্নারই রূপান্তর বলে মনে হচ্ছিল। সত্যিই তো, কতটুকু আমরা জানি মানুষের মনের আর জীবনের? কতটুকু জানতে পারি বাইরে থেকে?

বিশ্বনাথম বললে, আমার ওসব সেন্টিমেন্ট নেই। পিতৃপরিচয়হীন এক অভাগা মায়ের কোলে এসে জন্মেছিলাম। ঘা খেয়ে বড় হয়েছি। তবে এখানকার এসব মানতে হয়েছে ডিসিপ্লিনের জন্য। আপনাদের ওসব ভাবালুতাব অর্থ বুঝি না। প্রীতি, প্রেম—এসবই পরিবর্তনশীল। তবে অত কাতর হন কেন?

কে বললে! কাতর আমি হইনি।

না হলে খুবই ভাল।—বলে সে সরে গিয়ে দাঁড়াল অদূরে একটা থামের পাশে।

উদ্দিষ্ট এবং অপেক্ষমাণ মেয়েটি বোধহয় আমাকে চিনেছিল। বললে, কবি, আসুন। নাচ দেখাব।

তাই চলো।

কোনও কিছুতে কাতর যে হইনি, তা বোঝাবার জন্যই ওর সঙ্গে ওর ঘরের ভিতরে গিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু বসলে হবে কী, মন যেন কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না। কী যে সুর বাজাল যন্ত্রীরা, কী যে নাচ মেয়েটি নাচল, কে জানে! শুধু মনে পড়ছিল, নাচটা ছিল খুব দ্রুতলয়ের। অন্যমনস্ক চিত্তে নাচ দেখতে দেখতে একবার মনে হয়েছিল নটরাজনের কথা। কিন্তু তার ধ্যানভঙ্গ করেই বা লাভ কী?

অবসন্ন মন নিয়ে একসময় উঠে চলে এলাম বাইরে। নৃত্যশ্রমক্লান্তাকে যে ছুঁতে নেই,

এ নিয়মটা থাকায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। মেয়েটা কী যেন খাবার এনে রেখেছিল সামনে, বার বার অনুরোধ করেছিল খেতে। সামান্য একটু মুখে তুলেছিলাম মাত্র, খাওয়ার স্পৃহা ছিল না। নারায়ণ তেমনি বসেছিল তার আসনে, বললে, বিশ্বনাথম কই?

বললাম, কে জানে! ভিতরেই হবে। পাহারা দিচ্ছিল আমাকে। যাতে ভামতীর কাছে না যাই।

শুনে, কী আশ্চর্য, হঠাৎ ছলছল করে এল নারায়ণের দুটি চোখ। বললে, তোমার ব্যথা বুঝি! কিন্তু আমারও কিছু করবার নেই।

জানি।

সে বললে, বিশ্বনাথম গেছে সরোজার কাছে, তাকে বোঝাতে। অথচ সরোজা কি কিছু বুঝতে চাইবে? চাইবে না। সে চলে যাবেই।

কোথায়!

নারায়ণ বললে, কাশীতে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

তুমি!

হ্যাঁ। এখানকার সব ভাব ঐ বিশ্বনাথমের ওপর দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি কাল।

কেন?

আমার চোখের দিকে তাকাল, একটুক্ষণ নীরব থেকে তারপরে বললে, ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের কাজ করলাম না, বৈশ্যবৃত্তি করে কাটালাম।

কে না কাটাচ্ছে এ যুগে! বললাম, কিন্তু যাচ্ছ কেন হঠাৎ?

হঠাৎই একদিন যেতে হয়। বললে, যা ঘটতে একদিন তোমরা দেখ, সত্যিই কিন্তু একদিনে তা ঘটে না, তার পিছনে থাকে বহুদিনের অলক্ষ্য প্রস্তুতি। যা হয়, তা হবার জন্য অনেকদিন থেকেই নেপথ্যে আয়োজন গড়ে ওঠে। তবে ভাই, এ-ও জানি, যাচ্ছি বটে, কিন্তু ভয়ানক কষ্টেই কাটবে বাকিটা জীবন।

কেন?

বললে, অপরাধ করেছি নবগ্রহের কাছে। এঁরা বড় জাগ্রত দেবতা। নিস্তার নেই।

কিন্তু অপরাধটা কী?

উত্তরে যা বললে নারায়ণ, সে এক অপূর্ব কাহিনী। বললে, শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের সংলগ্নে যে ঝিলটি দেখছ, তাতে স্নান করে ওরা ফুল তুলে আনে বাগান থেকে সেই ভোরে। তারপরে মন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরে আসার সময় হয় একটা লটারি। নয়টি ফুলের নামে নামকরণ হয় মেয়েদের। আমিই পুরোহিত হতাম নিজে এ ব্যাপারে। কিন্তু—

কিন্তু কী?

কেমন যেন কেঁপে গেল ওর কণ্ঠস্বর, বললে, সরোজা আসবার পর পৌরোহিত্য আমার গেল। বিশ্বনাথমের ওপর এসব ভার দিয়ে আমিও হয়ে দাঁড়ালাম পথিকদের একজন। বিশ্বাস করবে? সেই যে তুমি গিয়েছিলে সেবন্তীর কাছে? তারপর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেরো-বাঁধানো খাতাটি খুলে নাম দেখে রাখতাম সরোজার। কিন্তু একবার মনে হল নবগ্রহের মূর্তি ছুঁয়ে এ কী মিথ্যাচরণ করে চলেছি আমি! আমারই নিয়মের অস্ত্র একদিন আমারই ওপর এসে পড়ল। সেইদিনই সত্যি করে বুঝলাম, এ অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা কতখানি। যার ওপর পড়ে, কী নিদারুণ যন্ত্রণাই না তাকে পেতে হয়!

বড় ক্লান্ত বড় বিষাদময় মনে হল নারায়ণের কণ্ঠস্বর, বললে, ঘটনাটা শুনতে চাও ভাই?

চাই।

বললে, একদিন সন্ধ্যায় নিজের পূজা শেষ করতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল মন্দিরে। এসে দেখি, সেদিন ওর নাম হয়েছে কৃষ্ণচূড়া। তার সেই নাম লাল-কালি দিয়ে কাটা। যন্ত্রণায় ছটফট করে মরেছি, সারারাত ঘুমোতে পারিনি। সে যে কী দাহ, সে যে কী মর্ম-বেদনা, তা ভাষায় তোমাকে আমি বোঝাব কতটুকু? সত্যি ভাই, সেদিনই বুঝলাম, কী মর্মান্তিক কষ্ট হয় তোমাদের, যেদিন দেখা পাও না তোমাদের মনোমত সঙ্গিনীর। কাছে আছে, অথচ নেই, এর থেকে দূরে থাকা অনেক—অনেক ভাল।

তুমি তো জানো, এখানকার নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে কতটা কঠোর ছিলাম। সেদিন নিজের মনে কিন্তু অনুশোচনার আর অন্ত ছিল না। বিশ্বনাথম শুনে পরিহাস করতে লাগল, বললে, তুমিও ভেঙে পড়লে শেষ পর্যন্ত? কথাটির উত্তর দিতে পারিনি। বিশ্বনাথম বললে, তোমার মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সরোজা যে তোমার মনের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে এটা বোঝো নি? এ যে দেখছি সরোজারই জয় হল। এবারও উত্তর দিতে পারিনি।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নারায়ণ আবার বললে, শেষ পর্যন্ত সরোজা নিজেই একদিন সামনে এসে দাঁড়াল প্রেতিনীর মতো। ওর সেই রূপকে আমি বরাবর বড় ভয় করি। বললাম, এমন করছ কেন?

দুঃখে ক্ষোভে ও যেন বিহ্বল হয়ে গেছে, বললে, এই জন্যে কি এখানে এসেছিলাম? আর সহ্য করব কত? আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ।

রক্তমাংসের মানুষ আমিও, বলতে আরম্ভ করে একে একে সবই ওকে খুলে বললাম। মন দিয়েই ও শুনল।

তারপরে একসময় অসহিষ্ণু হয়েই ও বলে উঠল, বুঝি না আমি সেসব। আমি সমস্ত ছেড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে পেরেছি, তুমি তা পারো না?

বললাম, পারতেই হবে।

তাই কাল আমরা দুজনে চলেই যাচ্ছি ভাই।

সত্যিই তাই হল। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়, পরদিন ওরা দুজনেই চলে গেল কাশীতে। সরোজা আর নারায়ণ।

বাড়িতে সেদিন রামদাসজী বললেন, আর প্রস্‌পেক্‌টিং করবেন না?

না। থাক না বন্ধ। যা করেছি তারই ফলাফলের খবরটা আসুক, তখন দেখা যাবে।

বেশ, তাই হবে।

মনের মধ্যে কিসের প্রতিক্রিয়া ঘটছিল কে জানে, হঠাৎ বলে ফেললাম, রামদাসজী, আপনি ওই দেবীপল্লী তুলে দেবার কথা বলছিলেন না? তাই করুন। তুলেই দিন।

রামদাসজী উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাকালেন, আপনি রাজি তো?

নিশ্চয়ই রাজি।

অবশ্য, ঘটনাটি যে এত সত্বর ঘটবে, ভাবতে পারিনি। রামদাসজী এক মাসের নোটিসে ওদের উঠে যেতে আদেশ জানালেন, ও বাড়িটাকে করবেন ধর্মশালা। তাছাড়া, নতুন আইনও তাঁর স্বপক্ষে।

বলা বাহুল্য, বিপুল আলোড়ন জাগল।

তারপরে, একদিন এল ডাক। বিশ্বনাথম নিজে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে এল একদিন সকালে, একেবারে সরস্বতী আম্মার বাসায়। শুনলাম, ভামতীও এসেছে মায়ের কাছে।

বোধহয় কথা বলছিলাম ওদের বাড়ির বারান্দায় বসে আমরা তিনজন—আমি, নটরাজন আর বিশ্বনাথম। কী হবে মেয়েদের? নটরাজন বললে, এদের আমি নাচ শেখাব। এদের শিল্পী করে তুলব 'ভরতনাট্যমে'র, বিশেষ করে 'কুচিপুড়ি' নৃত্যধারার।

বিশ্বনাথম বললে, এরা হচ্ছে ক্রিচার অব সারকামস্টান্সেস। শিল্পী-জীবন কাকে কতটা প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা।

এইসব আলোচনায় আমরা মগ্ন, হঠাৎ দেখি, ভিতর থেকে বাইরে এল ভামতী। সবুজ পাড়ের সাদা বুটিদার একটি শাড়ি পরনে, গাঢ় সবুজ রঙের ব্লাউজ। একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে চেহারায়। যে মেয়ে এ ক'দিন পালিয়ে বেড়িয়েছে আমার কাছ থেকে, আজ সবার সামনে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, শোনো।

আশ্চর্য হয়েই চেয়ে আছি ওর মুখের দিকে। আমাকে লক্ষ্য করে বললে, তোমাকেই বলছি। এসো আমার সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে যাব।

আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমার পাশাপাশি চলতে লাগল সে। না মন্দির নয়, ও বলল, অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারো এখন?

কোথায় বলো তো?

ওই পাহাড়টা পেরিয়ে—

উৎসাহিত হয়েই বলে উঠলাম, পারবে যেতে? সুন্দর একটা ঝরনা আছে। তোমাকে দেখিয়ে আনব।

সংক্ষেপে বললে, চলো।

সেই মেঘমলিন দিনটিতে পর্বতের সানুদেশে কী যে চমৎকার বর্ণ ধারণ করেছিল সেই ঝরনাধারাটি, তা বলবার নয়। ঈষৎ নীলাভ একটা কুয়াশার অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে লজ্জাশীলা নববধূর মতো। দুজনে সেই খয়েরি পাথরটার ওপরে বহুক্ষণ বসে রইলাম পাশাপাশি। চুপচাপ।

একসময় বললাম, খুব রাগ করেছিলে, না?

করবই তো! কাঁদিয়েছিলে তুমি আমাকে। ভীষণ দুঃখ হয়েছিল। অভিমানও।

ক্ষমা করো।

উত্তরে কিছু না বলে আমার একটা হাত টেনে নিয়ে নিশ্চুপে বসে রইল কিছুক্ষণ।

বলে উঠলাম, এই যে এভাবে চলে এলে, ওরা কেউ কিছু মনে করল না তো?

একথা তোমার মনে হল কেন?

এমনি।

বললে, নটরাজনের কথা তুমি শুনেছ, না?

অল্প একটু হেসে চুপ করে রইলাম। চুপচাপ চারিদিক। ঝিরঝির করে ঝরনার একটি ধারা বয়ে চলেছে আমাদের কাছ দিয়ে, সেই দিকে দুটো-একটা পাথরের নুড়ি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক সময় বলে উঠল, শোনো।

কী?

একটা রহস্য ভেদ করে দিতে পারো?

কী?

মনের মধ্যে এই আবেগের সৃষ্টি করে কে? কে হঠাৎ ভিতর থেকে বলতে থাকে—এই-ই সেই, যাকে তুমি খুঁজছ। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করি তাকে। তার চলার ভঙ্গি, বলার ভঙ্গি, তাকাবার ভঙ্গি—সব কিছু ভাল লাগতে থাকে।

একটু থেমে ধীর কণ্ঠে বললে, মিথ্যে বলব না, নটরাজনকে দেখেও একদিন আমার ওরকম হয়েছিল। একটি মুহূর্ত ওকে না দেখলে মনে হত বুঝি পাগল হয়ে যাব।

খুব ভালবাসো বুঝি?

দীর্ণকণ্ঠে বলে উঠল, কেমন করে তোমাকে বোঝাব। সেই লোক, যার কণ্ঠস্বরটুকু শুনলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, তার আজ কিছুই ভাল লাগে না আমার। তুমি বিশ্বাস করবে? তার সঙ্গও বিস্বাদ লাগে।

বললাম, এরকমটা হয় নাকি?

হয়। আশ্চর্য এক কণ্ঠে ও বলতে লাগল, আমাকে ঠিক তেমনি করে পাগল করেছ তুমি। তোমাকে একটি মুহূর্ত কাছে না পেলে বুকের ভিতরটা গুমরে গুমরে মরে। তুমি সারারাত বসে নটরাজনের বীণা শুনলে, আমার কাছে এলে না, তাতে এমন ভীষণ রাগ হল যে পরদিন—ছুটি ফুরোবার আগেই ও বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম তোমাকে জব্দ করবার জন্য। আর তার বদলে নিজেই হলাম জব্দ। কখনও মনে যে দ্বন্দ্ব ছিল না, সেই দ্বন্দ্ব দেখা দিল। মনে হল, পুরুষোত্তমই যে নিত্যনতুন রূপ ধরে আসেন, এ চিন্তাটা ভুল, মস্তবড় ফাঁকি!

বলতে বলতে দু'হাতে মুখ রেখে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওর মুখখানা তুলে ধরবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, এই দেখ, কী হল! কাঁদছ কেন অমন করে?

অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা নিজেই তুলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, তুমি চলে গেলে আমি কী করব বলো তো?

চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে ও একটু শান্ত হয়ে আসবার পর বললাম, আমাকে কি কাছে পেতে চাও অনুক্ষণ?

সেই নির্জন নিভৃত পার্বত্য-প্রদেশে আমাকে দুটি বাহু দিয়ে কাছে টেনে নিল সে, কেউ কোথায় দূরে-অদূরে আছে কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না, যেন প্রমত্ত হয়ে উঠল মুহূর্তে, ডেকে উঠল—কবি! ভামতীর কবি!

উচ্ছ্বাসের ঢেউ স্তিমিত হয়ে এলে আমি ওকে ধীরে ধীরে বলতে লাগলাম, এই ঝরনার ধারেই আমি এসে বসতাম অবসর পেলে। দেখে দেখে চোখ সত্যিই একসময় ভিজে উঠত। কী যে আনন্দ হত! কেন এমন হয় বলতে পারো?

খুশির তরঙ্গে যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল মুহূর্তে, আঁচলে চোখ মুছে ও বললে, আমি জানতাম।

কী?

তোমার মধ্যে এমনটি হবে। চোখ মেলে দেখতে জানে ক'জন গো? ক'জন আনন্দ-রসে মগ্ন হতে পারে? আমি জানি, তুমি তা পারবে।

বললাম, ঠিক বুঝি না তোমার কথা, তবে দিন দিন যে পরিবর্তনের মুখে এগিয়ে যাচ্ছি, তা বেশ বুঝতে পারছি।

হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা, তোমার কী হয় বলো না? আমাকে না দেখে থাকতে পারো?

বললাম, সত্যি বলব? আজ বলতে বাধা নেই, কষ্ট হয়।

সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন শিউরে উঠল, বললে, কী হবে!

কিসের কী?

তুমি যদি সত্যিই ভুলতে না পারো আমাকে?

একটু অবাকই হলাম ওর কথায়, বললাম, একথা আসছে কেন?

একটা আশ্চর্য কথাই শুনলাম এবার। ও বললে, মার কাছে শুনেছি, সহজে ধরা দাও না তোমরা। কিন্তু যদি একবার ধরা পড়ো তো, তোমাদের অবস্থা হয়ে পড়ে শিশুর মতো সেটাই চিন্তার।

কেন?

চোখ দুটি দেখতে দেখতে আবার সজল হয়ে উঠল, আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠ কোনক্রমে বলতে লাগল, তোমার ভালবাসা পাওয়া যে-কোনও মেয়ের পক্ষে ভাগ্যের কথা, জানো?

কেন?

গভীরতার জন্য।

সেদিন, সেই মুহূর্তে, সেই পরিবেশে, ওর একথার উত্তর দিতে পারিনি। বলতে পারিনি, তোমার কথা সত্যি নয়। ওর সৃষ্টি-করা 'কবি' আমার সত্তাকে সেদিন অতিক্রম করে গিয়েছিল বলা চলে। ওর 'কবি' আমাকে নির্বাক করে দিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে আসার পর নটরাজন একসময় আমাকে একা পেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল বললে, ওকে ভালবাসো তা জানি। থাকো না এখানে ওকে নিয়ে চিরজীবন? ও-ও সুখী হবে।

একটু হেসেই বললাম, কী করে জানলে?

বললে, মেয়েদের ভালবাসার দুটি প্রকৃতি আছে। এক, সংস্কার বা অঙ্গীকারের কাছে আত্মসমর্পণ। আর-একটি হচ্ছে, মুক্ত মনের বিকাশ। এই মুক্ত মন কখনও বাঁধা পড়ে না পড়লে, সে হয় অপার্থিব, অসামান্য এক কাব্যলীলা। ওর হয়েছে তা-ই। তোমাকে না পেলে ও মরে যাবে।

বললাম, তোমার কষ্ট হবে না এতে?

ছিঃ! তিরস্কারের সুরে বলে উঠল, বলছ কী তুমি! শুধু একটা কথা। নৃত্যশিক্ষার সুযোগটুকু দিয়ো। অমন ছন্দোময় দেহসৌষ্ঠব সহসা চোখে পড়ে না।

পরদিন সকালবেলা গিয়ে পৌঁছতে না-পৌঁছতেই হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। সরস্বতী আম্মা আমাকে কাছে বসিয়ে নানান গল্প করতে লাগলেন। তারপর বললেন, যাও পাশের ঘরে যাও। ওর পুজো সারা হয়েছে।

গেলাম। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটির মতোই ঝরঝর বর্ষণ শুরু হয়েছে গবাক্ষের বাইরে সেদিনের মতই চলেছে কৃষ্ণ-মেঘপুঞ্জের লীলা। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশে মেঘ-সঞ্চার লক্ষ্য করতে করতেই বলে উঠলাম, শুনছ? কী ঠিক করলাম জানো? যাব না। ঘর বাঁধব এখানে! তুমি আর আমি।

আমার পায়ের কাছে এসে বসল মাটিতে। তারপরে আমার পায়ের ওপর মাথা রেখে

চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। বাইরে চলেছে ঝরঝর—ঝমঝম বৃষ্টি। একটা ময়ূর কোথায় যেন ডাকছে প্রমত্তের মতো।

বললে, এত লোভ দেখাও কেন তুমি?

লোভ!

বললে, এর থেকে লোভের বস্তু আমার কী থাকতে পারে?

খাটিয়ার প্রান্তে বসে পড়ে, ওর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে ডেকে উঠলাম, ভামতী!

উঁ?

বললাম, দুজনে যেমন সেই ঝরনার কাছে গিয়েছিলাম, তেমনি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাব—দুজনে। কেমন?

তারপর? একদিন শুধু ওই ঝরনাই নয়, যাব দেশ-বিদেশে। যাব সমুদ্র দেখতে, তুমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠবে, কী সুন্দর!

আর তুমি?

আমি? আমি দু'চোখ ভরে দেখব তোমার সেই অবাক হওয়া দুটি চোখ।

থরথর করে কেঁপে উঠল ওর ঠোঁটদুটি, কান্নাভরা কণ্ঠে কোনক্রমে বলে উঠল, বোলো না এমন করে। ওগো, একটা কথা বলব?

বলো।

দুটি অশ্রুভরা চোখ আমার দিকে মেলে বলে উঠল, কালই তুমি চলে যাও এখান থেকে। দেরি কোরো না।

অবাক হয়ে বলে উঠলাম, কেন?

অস্থির, অসহিষ্ণু, অথচ দুঃখদীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ভামতী, রামচন্দ্র যেমন সীতাকে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন, আমাকে তেমনি করে ত্যাগ করতে পারবে না তুমি?

কী এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল আমার বুক, বললাম, কী হয়েছে বলো তো?

বললে, কী জানো? বিষাক্ত হয়ে গেছে আমার মন। তাই ভয় হয় গো, তাই ভয় হয়।

কিসের ভয়?

আমার পায়ে ঠোঁটের ছোঁয়া রেখে বার বার বলতে লাগল, সবই তো তুমি জানো, সবই তো বলেছি আমি তোমাকে।

তাতে হয়েছে কী? পিছিয়ে যাচ্ছ কেন? আমি দেশেই ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে, আমার দেশে আমার ঘরে।

ওগো, না গো না, বলে উঠল সে, সে কামনা কোরো না। আমি সব থেকে ভয় করি নিজেকে। আজ তোমাকে যেমন ভালবাসি, একদিন তো অন্যকেও ভালবেসেছিলাম? যদি আবার সেইরকম কিছু ঘটে। যদি পুরনো হয়ে যায় আমার প্রেম? যদি একদিন তোমারই সঙ্গ আমার কাছে অসহ্য লাগে?

সুকঠিন বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। সে দৃষ্টি লক্ষ্য করে আর্তনাদ করে উঠল ও। সহসা বললে, অমন করে আমার দিকে চেয়ো না। তুমি পুরুষ, তোমার এ দুঃখ দুঃখই থাকবে না একদিন। না না, তুমি বাঁধা পোড়ো না, তুমি চলে যাও।

প্রস্তরখণ্ডের মতো নিথর-নিশ্চুপ বসেছিলাম বহুক্ষণ, মনে আছে। একসময় বলে উঠেছিলাম, সরস্বতী আত্মার কথাও তো শুনেছি। কিন্তু তিনি তো—

বাধা দিয়ে বলে উঠল, মায়ের মনের দৃঢ়তা—মায়ের তপস্যার শক্তি, সে আমার নেই। আমি তাই ভরসা করি না তোমাকে কাছে রাখতে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, পারো তো আমাকে ঘৃণা কোরো, ভালবেসো না।

বৃষ্টিটা এতক্ষণে ধরেছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, জানি না সেটা সম্ভব হবে কিনা—। কিন্তু একটা কথা, যাওয়ার আগে একটিবারও দেখা হবে কী?

দুই পিপাসিত দৃষ্টি মেলে বললে, হবে গো হবে!

তারপরে মুখখানা নত করে ধরা গলায় বললে, আজ সন্ধ্যায় ও বাড়িতেই এসো না হয়। আজকাল তো আর ওসব ব্যাপার নেই। বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি এসো। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না।

বলেই প্রণাম করল পায়ে মাথা ঠেকিয়ে। বললে, হাতের আংটিটি কখনও কাছ-ছাড়া কোরো না, ঐ পোখরাজ মণিই তোমাকে রক্ষা করবে আমার মোহ থেকে।

ম্লান একটু হেসেছিলাম মাত্র, আর কিছু বলিনি। চলেই আসছি, বাইরের ঘরের চৌকাঠে পা দিতে না-দিতেই পিছন থেকে শুনতে পেলাম ওর ডাক, শোনো?

দাঁড়ালাম। এ ঘরেও তখন ধারেকাছে কেউ কোথাও নেই। আমার একটি হাত দু'হাতে ধরে দুটি জলভরা চোখে বললে, জানি আমার কথা অনেকদিন তোমার মনে পড়বে, কিন্তু তবু চেষ্টা কোরো, ভেবো না আমার কথা। আমাকে ঘৃণা করতে শেখো। আমি যে কত ছলনাময়ী, আমি যে কত নিষ্ঠুর, আমি যে কত মায়াবিনী, আমি যে কত—

শেষ করতে পারল না কথা, দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালাল, যেন আশ্রয় নিল গিয়ে কক্ষান্তরের নিভৃতে।

সারাটা দিন ঐ বৃষ্টিভরা আকাশটার মতোই থমথমে মন নিয়ে কাটিয়ে দিলাম। রামদাসজীকে বললাম, দেশে যাব ভাবছি, মনটা হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ছুটি নিলাম।

মুখে ওঁকে একথা বলেছি বটে, মনে মনে বেজেছে অন্য সুর। দুরন্ত অভিমানের কঠিন স্তর যতই দ্রবীভূত হয়েছে ততই কেবলই মনে হয়েছে, সন্ধ্যায় যখন দেখা হবে তখন ও নিশ্চয়ই বলবে, কী বলতে কী বলেছি, আমাকে নিয়ে চলো তুমি যেখানে খুশি—কিংবা, মাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, তুমিও থাকো এখানে, চিরদিনের মতো।

কিন্তু যা আশা করা যায়, তা-ই কি সবসময় ঘটে?

সেই বাড়িতে, সন্ধ্যাবেলা, ওর সেই ঘর খুঁজে খুঁজে বার করলাম, দেখি ঘর বন্ধ, প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে দরজায়।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ওই তালাটিকেই। ধারেকাছে কেউ কোথাও নেই। শুধু নটরাজনের ঘর থেকে ভেসে আসছে বীণার সুর, হাহাকারের মতো—কান্নার মতো!

ধীরে ধীরে ওর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা। আমাকে দেখতে পেয়েই একসময় ও থামিয়ে দিল বীণা। তারপরে খাট থেকে নেমে এসে দাঁড়াল আমার পাশে। নিশ্চুপেই একটা হাত তুলে দিল আমার কাঁধের ওপর। প্রশ্ন করতে গিয়ে গলাটা একটু কেঁপে গেল, বললাম, কোথায় ভামতী?

বললে, জানি না। তবে, আমার কাছে কাল এসেছিল। তুমি তো জানো, আজকাল আমি এ বাড়িতেই থাকি। ভামতী যা কোনদিন করে না, তাই করেছিল কাল। আমাব ঘবে ঢুকে হঠাৎ প্রণাম করেছিল আমার পায়ে। বলেছিল, আমাকে নাচ শেখাতে চাও না? শেখাও! কাল সন্ধ্যায় এসো আমার ঘরে। দিয়ো আমাকে তোমাব নাচের প্রথম পাঠ। আমার 'নট্টুভান' হিসাবে তোমাকেই বরণ করে নেব।

একটু থেমে তাবপর আবার নটরাজন বললে, কাল ঘরে এসে যখন কথা বলছিল, তখন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, ও প্রচণ্ড ভুল করেছে, ভেবেছে, আমাব কামনার বহ্নি বুঝি নেভেনি! ভেবেছে, আমি বুঝি আজও ওকে চাই! ভেবেছে, মনেব কোণে আজও বুঝি জেগে আছে ওকে কাছে পাবাব সূক্ষ্ম কামনা।

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, তারপর?

নটবাজন বললে, কিন্তু আমার মনেব ভাব আমি ওকে বুঝতে দিলাম না। জীবনের শ্রেষ্ঠপ্রাপ্তি যে আমার ঘটে গেছে, এটা বুঝতে পারলে ওর আত্মাভিমানে ঘা লাগতে পারে। মেয়েদের মন তো? ওসব ব্যাপারে ভয়ানক অভিমান থাকে ওদেব। তাই বললাম, বেশ। যাব।

নটবাজন থামল। আমি বললাম, গিয়েছিলে?

উত্তর এল, না। ও যে থাকবে না, এ-ও জানতাম।

ওর ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।

নটরাজন বললে, তাও শুনলাম। কিন্তু কখন থেকে ঝুলছে তা কেউ জানে না। দেখছ তো, বাড়ির অবস্থা? নিজের নিজের ইচ্ছামতো সব মেয়েই চলে গেছে কোথায় কোথায় যেন। আছে শুধু আমাব ছাত্রী ভারাহালু, আর অন্য দুটি মেয়ে। এরা ভালভাবে সত্যিকার নাচ শিখবে, শিল্পী হবে। আমি এদের নিয়ে যাব কুচিপুডি গ্রামে।

বললাম, আচ্ছা? ভামতীর খোঁজ করেছ তার বাড়িতে?

না।

এসো না, খুঁজি।

বেশ। চলো।

প্রথমেই গেলাম বিশ্বনাথমেব কাছে।

বিশ্বনাথম বললে, বেলা বারোটা নাগাদ ভামতী এসে ঘরের চাবি দিয়ে গেছে আমার হাতে, বলেছে, সে বাড়ি যাচ্ছে, মায়ের কাছে।

কিন্তু মায়ের কাছেই বা কোথায় ভামতী?

নটরাজন ধীরে ধীরে ফিরে গেল তার নিজের ঘরে, সরস্বতী আম্মা বসলেন গিয়ে পুজোয়। ডাকলেন শুধু আমাকে। বললেন, তুমি আমার কাছে এসো।

কাছে গিয়ে বসলাম। পুজোর আসনে বসেও স্থির থাকতে পারছেন না তিনি, বার

বার চোখে জল এসে পড়ছে, কথা বলতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে কথা, দেবতার ধ্যানের জন্যও আপন চিত্তকে স্থির রাখতে পারছেন না। বললেন, সে বিকেলের দিকেই রওনা হয়ে গেছে বাবা। বলেছে, কোনও মন্দিরে গিয়ে সে আশ্রয় নেবে। দূরের নিভৃত কোনও মন্দিরে।

কিন্তু কেন?

সরস্বতী আম্মা বললেন, মন্দিরই তো আমাদের শেষ আশ্রয় বাবা। কেউ ঘরে বসেই মনটাকে বাঁধতে পারে, তখন তার কাছে ঘরটাই হয়ে ওঠে মন্দির। আর তা যে না পারে তাকে ছুটতে হয় মন্দিরে। কাঁদতে হয়, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে হয়, বলতে হয়—ওগো প্রিয়তম, আমার মনটাকে তোমার মন্দির করে নাও। মন ধীর—মন্দির।

বললাম, কিন্তু মা, আমাকে সে শেষ পর্যন্ত ভয় করল?

তোমাকে নয় বাবা, সরস্বতী আম্মা বলতে লাগলেন, আমি তাকে জানি। তার ভয় শুধু নিজেকে। তাই সে পালাল। সব দেখেশুনে যেতে দিলাম, যাক ও যেখানে খুশি, শান্তি পাক। দুঃখ কোরো না, তোমাকে সে প্রাণ ঢেলেই ভালবাসে। এই প্রেমকে সে পেতে চায় ধ্যানের মধ্যে, স্মৃতির মধ্যে। প্রেমকে সে প্রদীপ করতে চায়। কথাটা তুমি হয়ত আজ বুঝবে না, বুঝবে অনেক পরে, যখন আমাদের মতন জীবনের সমস্ত ধূপ জ্বলে জ্বলে স্মৃতির ভস্মটুকু পড়ে থাকবে মাত্র মনের কোণে।

আমাকে ঘৃণা করতে শেখো। আমি যে কত ছলনাময়ী, আমি যে কত মায়াবিনী, আমি যে কত...!

আজও মাঝে মাঝে কানের কাছে অতর্কিতে বেজে ওঠে তার সেই কণ্ঠস্বর।

কতদিন, কত মাস, কত বছর কেটে গেছে, কত পরিবর্তন এসেছে আমার জীবনে। দুঃখ-সুখের কত পালার মধ্য দিয়ে পার হয়ে চলেছে আমার জীবন। কত নিষ্ঠুরতা কত হৃদয়হীনতার পরিচয় পাই দৈনন্দিনতার মধ্যে। কত মিথ্যা, কত হীনতা এসে আঘাত দেয় প্রাণের মধ্যে,—তবু মনের আকাশ সংশয়ের মেঘে ঢেকে যায় না। যখন চারিদিকে শুনি নৈরাশ্যের হাহাকার—কিছু হচ্ছে না, কিছু হয়নি, কিছু ভাল নয়, কেউ ভাল নয়, সব খারাপ—তখন অনুকম্পা জাগে। আমি যে জানি, নিশ্চয়ই আছে কোথাও আলোকের রাজ্য। অতীতেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আজও মানুষ মানুষকে ভালবাসছে দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে, আজও প্রকৃতির শোভা দেখে ভরে যায় দুটি চোখ! মনের কন্দরে আজও উঁকি দেয় কোনও ছলনাময়ী, আজও বুঝি মধুর কণ্ঠে ডেকে ওঠে কোনও মায়াবিনী—কবি!

না! তাকে ঘৃণা করতে পারিনি। আজও তার দেওয়া পোখরাজ মণিটির দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বিভ্রম ঘটে। মনে হয় ও বুঝি মণি নয়, কার একফোঁটা চোখের জল চিরকালের জন্য আমার কাছে বাঁধা পড়ে আছে।

তীরভূমি

উৎসর্গ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বললে যেমন শোনায়, ঠিক তেমনি কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি। শুধু শুনতে পাওয়া নয়, স্পষ্ট যেন দেখতেও পেলেন খুকিকে। খুকির মায়ের ইচ্ছে নয়, তবু প্রবল জেদ ধরে অনেক কান্নাকাটি করে রামস্বামী-বেযারাকে দিয়ে দোকান থেকে সে কিনে আনিয়েছিল একটা সাদা শাড়ি। সেবাব মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টায় টাউন হলে বুঝি হচ্ছিল সরস্বতী পুজো। সেই উপলক্ষে নিজে নিজেই বাসন্তী বঙে ছুপিয়েছিল সেই শাড়িখানা। কিন্তু শাড়ি-পরা কি ওর অভোস আছে? না, দশ বছরের কচি মেয়ে ওই শাড়ি সামলাতে পারে? সারাটা সকাল টাউন হল কিংবা বান্ধবীদের বাড়ি ঘোরাঘুরি করে এসেছে। একসময় আঁচলটা একহাতে সামলাতে সামলাতে ছুটে এল ওঁর কাছে, দুটি হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে কী মনে করে যেন চুপি চুপি কানে কানে বলে উঠল, বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

সেদিনটা ছুটি ছিল তাঁর। একা-একা ঘরে বসে কী একটা বই পড়ছিলেন তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে। চমকে উঠে, তারপরে মুখ তুলে একটু হেসে মেয়েকে একহাতে আরও কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, কেন মা, মিলি নামটা তোমার পছন্দ নয়?

ছাই!

হেসেছিলেন। কিন্তু সত্যিই 'মিলি' আর 'বাসন্তী' হয নি। অথবা অন্তরে ছিল যার 'বাসন্তী' হবার একান্ত বাসনা, তার মায়ের অদম্য প্রয়াসেও সে খাটো-চুল আর রঙানো-ঠোঁটের 'মিলি' হতে পাবল না। সে 'ছাই' হয়ে গেল। ওযালটেয়ার স্টেশনেব পরপাবে পশ্চিম কোণে সিং-দরজা-দেওয়া পাথরের-পর-পাথর-দিয়ে-গাঁথা যে শ্মশান-চত্বরটি রয়েছে, তার এক পাশে সে আর তার স্মৃতি ছাই হয়ে মিলিয়ে আছে আজ সাত বছর।

সাত বছর। বেঁচে থাকলে সতেরো বছরেরটি হত আজ। সেদিনকার আট বছরের গৌতমই তো আজ পনেরো বছরের। সেন্ট অ্যালইসাস থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে।

আশ্চর্য! সাত-সাতটি বছর কেটে গেছে খুকি চলে যাবার পর।

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন তিনি। পুবের জানালা দিয়ে রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে তাঁর গায়ে। পাশের খাটে শূন্য বিছানার পায়ের কাছে লাল মখমলের দামী কম্বলটা পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা।

ঠক্ ঠক্ করে কোথায় কাছেই কে যেন কাঠের ওপর পেরেক ঠুকছে। একটা নয়, দুটো নয—একের পর এক—অনেকগুলো পেরেক।

নরম কম্বলটা গা থেকে সরিয়ে উঠে বসতেও ইচ্ছে করছে না। বহুদিন পরে খুকিব কথা মনে পড়ল। বহুদিন পরে স্বপ্ন দেখলেন খুকিকে। একেবারে ভোরের স্বপ্ন।

সে চলে যাবার পব দু-তিন মাস পর্যন্ত বারকয়েক তার কথা হযত উঠেছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। গৌতম ছিল একেবারে নির্বাক, তার দিদির কথা অন্তত ওঁকে একবারও জিজ্ঞাসা করে নি। তার মায়ের কাছে করেছিল কি না, কিংবা আজও করে কি না, জানা নেই।

জানা নেই অনেক কিছু। খুকিকে স্মরণ করে আজও নীলিমা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে কি না, জানা নেই। নিজের মনটাকেই কি ভাল করে তাঁর জানা আছে? কত আদরের ছিল

খুকি, কিন্তু সে যাবার পর কতগুলি দিন তিনি স্মরণ করেছেন ওকে? দিনের পর দিন গেছে, রাত এসেছে, রাত গেছে, নিজের কাজ আর নিজের চিন্তা নিয়েই কেটে গেছে সমস্তক্ষণ। কোন্ ঘরের কোন্ দেয়ালে যে ফ্রক-পরা ছোট্ট একটি মেয়ের ছবি দিনের পর দিন বিবর্ণ হয়ে চলেছে, কে জানে!

অথবা, সে ছবি আজও আছে কি? এই সাত বছরের মধ্যে একদিনও কি রামস্বামীর অসতর্ক হাত লেগে মেঝেতে পরে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি তার কাচগুলো? কে জানে। হয়ত গেছে, হয়ত যায় নি।

খুকির মায়ের নাম নীলিমা। কিন্তু শাশুড়ির আদরের ডাকটিই সর্বত্র চল হয়ে গিয়েছিল—নেলী।

শুধু আদরের ডাকই নয়, তাঁর রুচি তাঁর চিন্তা সমস্তই যেন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাঁর কন্যাকে। কিন্তু কন্যার মধ্যে ছিল অদ্ভুত অনমনীয়তা। নেলী বলত, কী অবস্টিনেট! আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই মাথাটি খাচ্ছ!

হেসে মেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন, খাচ্ছি নাকি মা?

দশ বছরের কচি মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাত তাঁর দিকে, বলত, না বাবা।

হো-হো করে হেসে উঠতেন তিনি। নেলী রাগ করে চলে যেত ঘর থেকে, বলত, সিলি।

কন্যা বলত, বাবা!

কী মা?

দু-হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলত, কলকাতায় মেজো জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে তোমার মার যে ছবিখানা আছে, ওটা এখানে দেখি নি! খুব সুন্দর ছিলেন, না বাবা? ওই ছবির মত? আমি ওই রকম করে কাপড় পরব। আমি ওই রকম লম্বা চুল রাখব, শাড়ি পরব। ওই রকম চুলের গোছা নামিয়ে দেব কাঁধের ওপর দিয়ে। তুমি আমার ওই রকম একটা ছবি তুলবে তো বাবা?

কত রকম কত কী যে কথা বলত খুকি! অজস্র কথা। যা ওর ভাল লাগত, তা-ই ও হতে চাইত। কিন্তু আজ তা ভাবতে গেলে, ওর ওই সব-কিছু চাওয়ার মধ্যে একটা অপূর্ব সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। এক কথায়, ওইটুকু মেয়ে হতে চাইত ওর মা আর দিদিমার ঠিক বিপরীত।

আশ্চর্য! খুকির কথা আজ অত মনে পড়ছে কেন হঠাৎ?

নেলী বলেছিল, নিউমোনিয়ার তো কত ভাল চিকিৎসা হয়েছে। এখানে চিকিৎসারও তো কোন ত্রুটি হয় নি। তবু মিলি চলে গেল কেন?

এই 'কেন'-র উত্তর কে দেবে? ওর মায়ের গেছে মিলি, আর ওর বাবার গেছে বাসন্তী।

বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী!

না, উঠে পড়তে হচ্ছে এইবার। এখনও চা দিয়ে গেল না কেন? পেরেকের ঠুকঠুক এখনও চলেছে। প্যাকিং বাক্সগুলি পেরেক ঠুকে বন্ধ করছে বেয়ারারা। কিন্তু, যাওয়ার পালা তো কাল। আজ থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করল কেন নেলী?

আজ শেষ অফিস-যাওয়া। শেষ তো সবই হয়ে গেছে কাল। অর্থাৎ আজকের

ব্যাপারটা গতকালই শেষ করে রাখা হয়েছে। লেখালেখি—এখানে সই ওখানে সই—চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া—পোর্ট কনজারভেটর নিজেই বুঝে নিয়েছেন সব—গ্র্যাচুইটির ফর্মে সই—তার বন্দোবস্ত—প্রভিডেন্ট ফান্ড—বলতে গেলে কাল সারা অফিস তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল সমস্তটা দিন।

পেনশন নিলেন না কেন?

না, অপ্‌শন যখন পেয়েছি, তখন এককালীন টাকাটাই চাই। প্রচুর উপকারে আসবে।

সহকর্মী পাইলট ওয়াদেলকর হেসে বললেন, উনি যে বাড়ি করছেন কলকাতায়! বিরাট বাড়ি। জাহাজী প্যাটার্নের। আমি প্ল্যান দেখেছি।

সত্যি?

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে তিনি বলছিলেন, না না, বিরাট নয়। কুঁড়েঘর। জাহাজী প্যাটার্ন নয়। টাগ বলতে পারো, আমাদের টাগ মেঘাদ্রি।

কনজারভেটর ক্যাপ্টেন রডরিগ শুনছিলেন সমস্ত কথা মন দিয়ে। হেসে উঠলেন মেঘাদ্রির কথায়।

সস্নেহে বললেন, দ্যাট লিটল বেবী মেঘাদ্রি! যাচ্ছ যাও, অন্তত ওকে তুমি ভুলতে পারবে না মুখার্জি। ওর সেই শেকলছেঁড়ার গল্পটা মনে পড়ে?

হেসে উঠলেন সবাই। জাহাজ যখন বন্দরে প্রবেশ করে, তখন দু-পাশ দিয়ে দুটি মোটা লোহার তার নিজের নিজের শিকলে বেঁধে দু-পাশ দিয়ে ধরে জাহাজটাকে টেনে নিয়ে যায় দুটি টাগ। মোটর-বোটেরই বৃহত্তর সংস্করণ। আরও শক্ত—আরও মজবুত। ইঞ্জিনঘরটা কেবিন দিয়ে ঢাকা, তার ওপরে দোতলায় সারেঙের ঘর—অর্থাৎ হুইল হাউস। তার ঠিক পাশ ঘেঁষে মাথায় কালো ডোরা দেওয়া হলদে রঙের মোটা চিমনিটা ধূমোদ্‌গীরণ করছে। এরই একটির নাম—মেঘাদ্রি। একবার বুঝি কোন্ জাহাজটা টানতে গিয়ে শেকলটাই ছিঁড়ে ফেলেছিল। প্রায়ই মেরামতি লেগে আছে ওর। আজ এটা ভাঙছে, কাল ওটা ভাঙছে। বহুদিনের পুরনো। যেন চিরকালের দুষ্টু মেয়ে, খেলা করতে গিয়ে আজ হাত কেটে আসছে, কাল পা কেটে আসছে, মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে। ওকে নিয়ে পাইলটদের মধ্যে কৌতুকের আর অন্ত ছিল না, যত কৌতুক তত স্নেহ।

কে যেন তুলেছিল ফেয়ারওয়েলের কথাটা। প্রতিবাদ করেছিলেন মুখার্জি। ওসব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আদৌ পছন্দ করেন না তিনি। ওসবের দরকার নেই।

অফিসের সবার হাসিমুখই আমার ফেয়ার-ওয়েল।

দাঁড়াও।

ক্যাপ্টেন রডরিগ তাঁর খাকি শার্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবই বার করে তার কয়েকটা পাতা উলটে এক জায়গায় থামলেন, তারপর ঠোঁট থেকে পাইপটা নামিয়ে বলে উঠলেন, ব্যাড মেমারি। তাই সব টুকে রাখি। শোনো। 'There cannot be any farewell to thee, my mind is coloured by thy every hue!'...এটা আমারও কথা।

অজস্র ধন্যবাদ রডরিগ।

না। এ-কথা আজকে বলছি না। বলব কাল। কাল তুমি তোমার শেষ জাহাজ পাইলট করে আনবে—'স্টিল ম্যারিনার'। আজ আমি ওটা রিহার্স্যাল দিয়ে রাখলাম।

রিহার্স্যাল! হো-হো করে হেসে উঠলেন ওয়াদেলকর।

মুখার্জি বলেছিলেন, কিন্তু ভারি সুন্দর কোটেশন। কোথায় পড়েছিলে?

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন ক্যাপ্টেন রডরিগ, কেমন যেন স্বপ্নিল দুটি চোখ, বললেন, কাব্য পড়ার সময় কই? ব্যাঙ্ক-লাইনের একটা জাহাজ। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। তাব ক্যাপ্টেন। আহা, দেশের হাসপাতালে থ্রম্বসিসে সেদিন শুনলাম মারা গেছে। তার মুখে শুনেছিলাম। টুকে রেখেছিলাম নোটবুকে। এই নোটবুক নয়, সে আর একটা, বাড়িতে আছে। যেখানে যা কিছু ভাল শুনতাম, টুকে রাখতাম, মুখস্থ করতাম আজ আর মুখস্থ থাকে না, তাই অন্তত কিছু বাছা-বাছা মনের মত কথা এই ক্ষুদে নোটবইটাতে আবাব টুকে রাখছি। কেউ কাছে না থাকলে লুকিয়ে লুকিয়ে বার করি, আর মনে মনে আওড়াই।

ওয়াদেলকব বললেন, নোটবুক আমাবও আছে ক্যাপ্টেন। তবে, আমি তাতে জাহাজের নাম লিখে রাখি। যতগুলো জাহাজ আমি এ যাবৎ পাইলট করে এনেছি, সেই সব নাম। তা প্রায় শ-দুয়েক হবে।

এক জাহাজ চারবার পাঁচবার এনেছ তো?

হ্যাঁ, তার চেয়ে বেশিও হবে। সব ধরেই দুশো।

রডবিগ সস্নেহে বললেন, ইয়ংম্যান, আমাদের বহু দুশো পেরিয়ে গেছে। কী বলো মুখার্জি?

হ্যাঁ, তা হবে।

বডরিগ বললেন, আমরা সমবয়সী। অথচ সহপাঠী নই। মুখার্জি বোম্বে থেকে লন্ডন আর লন্ডন থেকে গ্লাসগো। আর আমি এবার্ডিন থেকে গ্লাসগো, আব গ্লাসগো থেকে লন্ডন। বিলেতে আমাদেব কখনও দেখা হয় নি। দেখা হল এদেশে এসে। তাও লেট লাইফে। এই ভাইজাগ পোর্টে। আমি পোর্ট কনজারভেটর হয়ে পাঁচ বছরের এক্সটেনশন পেলাম। মুখার্জিও এক্সটেনশন পেয়েছিল, কিন্তু নিল না। আমার মাথায় প্রকাণ্ড টাক, টুপি দিয়ে ঢেকে রাখি। মুখার্জির মাথাভর্তি চুল, কিন্তু সব সাদা। রাদার আন্‌টাইম্‌লি। কী বলো? পঞ্চান্ন বছরে মাথার সব চুল পেকে যায়, এ আমি কখনও দেখি নি।

ওয়াদেলকর বললে, আমি দিল্লিতে কিন্তু একজনকে দেখেছিলাম। তার বোধ হয় পঞ্চান্নও হয় নি।

নিজের চিন্তায় নিজেই মগ্ন হয়ে আছেন, এর মধ্যে সাদা-উর্দি-পরা রামস্বামী যেন কখন ঘরে ঢুকেছে চা নিয়ে। টিপয়টা বিছানার কাছে টেনে এনে চায়ের ট্রে-টা তার ওপরে সন্তর্পণে রাখল, বোধ হয় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েও রইল চুপচাপ। প্রতিদিনের অভ্যেসমত একবার নিম্নকণ্ঠে সসম্ভ্রমে 'সাব' বলে ডেকেও ছিল কি?

ফোন কি বেজে উঠল এই সময়? রামস্বামী যেন ছুটে গেল ফোনটার দিকে। রিসিভারটা উঠিয়ে কানের কাছে ধরে কী যেন শুনল, কী যেন বললও। তারপরে রিসিভারটা নামিয়ে টেবিলের ওপর রেখে ছুটে এল তাঁর কাছে। এবার কণ্ঠে একটু জোর এনেই সে ডেকে উঠল, সাব!

উঁ?

টেলিফোন।

পরিপূর্ণ চোখ মেললেন এবার মুখার্জি, বললেন, কৌন?

অফিস।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন মুখার্জি। বেশ বেলা হয়ে গেছে।

এগিয়ে গিয়ে উঠিয়ে নিলেন রিসিভারটা। সাড়াও দিলেন। তাঁরই কেরানিবাবুর কণ্ঠস্বর। 'তাঁর কেরানি'—কথাটা মনে হতেই হাসি এল ঠোঁটের কোণে। আজই শেষ। তারপরে কে কার!

স্যার, স্টিল ম্যারিনার এসে গেছে, লাইট হাউসের অবজারভেশন পোস্ট থেকে সিগন্যালাররা রিপোর্ট দিচ্ছে,—'জি ফ্ল্যাগ ইজ আপ।'

যথারীতি উত্তর দিয়ে রিসিভারটা রেখে দিলেন মুখার্জি।

রামস্বামী ততক্ষণে কাপে লিকার ঢেলে পরিমাণমত চিনি আর দুধ দিয়ে এক কাপ চা তৈরি করেছে।

চিনি কম দিয়েছিস তো?

এ ধরনের কথা বুঝবার মত দুটো তিনটে বাংলা কথা রামস্বামী শিখে ফেলেছে। বললে, জী হাঁ।

কত লোকের বাড়িতেই না কাজ করেছে এই রামস্বামী! ইংরেজিও বলতে-বুঝতে শিখেছে। একটু আধটু হিন্দিও। বাংলাও কিছু কিছু। এব পব মারাঠী কি গুজরাতী, কী শিখবে কে জানে? কে আসবে তার শূন্য কোয়ার্টারে? পরবর্তী পাইলট। কিন্তু, কে হবে সে? বাঙালী? না, মারাঠী? না, গুজরাতী? বোম্বে থেকে লোক পাঠাবে শোনা গেল। তা আসতে-আসতেও মাসখানেক অন্তত। এই একটি মাস মাত্র দুজন পাইলটে পোর্ট চালাতে হবে—মারাঠী ওয়াদেলকর, আর গোয়ানিজ ডি-সুজা। কিংবা 'পি সি' বা 'পোর্ট কনজারভেটর' (মুখে 'পি-সি' বললেও, আসলে পদবীতে কিন্তু 'ডি-পি-সি'—ডেপুটি পোর্ট কনজারভেটব) নিজেই পাইলটিং করবেন এই একমাস?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পুবের জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন মুখার্জি। রামস্বামী বোধ হয় ওঁর মনের ভাব বুঝেই জানলাটা পুরো খুলে দিয়ে পর্দাটা ভাল করে সবিয়ে দিয়েছে।

ওই তো দেখা যাচ্ছে। নোঙর ফেলার আয়োজনে ব্যস্ত 'স্টিল ম্যারিনার'। সামনের মাস্তুল থেকে মিড শিপের ধ্বজদণ্ড পর্যন্ত যে তার ঝুলে থাকে ফ্ল্যাগ-সিগন্যালিংয়ের জন্য—তাতে সত্যিই 'জি' ফ্ল্যাগ ঝুলছে। কালো চৌকো একটা কাপড়ের মধ্যেকার চৌকো একটা স্থান একেবারে সাদা।

মালবাহী এই আমেরিকান জাহাজগুলো খুব সুন্দর। ইস্থমিয়ান লাইনেব এই আধুনিক টাইপের জাহাজগুলো দশ হাজার টন মাল নিতে পারে, আবার জন বারো প্যাসেঞ্জারও নিতে পারে। কে যেন কাল বলছিল অফিসে, জাহাজ আসছে বিলেত ঘুরে। চারজন প্যাসেঞ্জারও বুঝি আছে, এখানেই নামবে তারা।

তা তারা নামুক, কোনও কৌতূহলই নেই তাঁর। কিন্তু এ জাহাজের ক্যাপ্টেন কে? তাঁর কি চেনা? ইস্থমিয়ানের বহু জাহাজ তিনি পাইলট করে বন্দরে এনেছেন, কিন্তু 'স্টিল ম্যারিনার' তাঁর কাছে নতুন। অবশ্য, ক্যাপ্টেন ওদের প্রায়ই বদলে যায়। সেই যাকে 'স্টিল নেভিগেটরে' একদিন দেখলেন, তাকেই পরবর্তীকালে হয়ত দেখা গেল 'স্টিল ফ্যাব্রিকেটরে'। কে জানে, হয়ত 'স্টিল ম্যারিনাবে' গিয়ে তিনি দেখবেন, 'ফ্যাব্রিকেটরে'র সেই বুড়ো ক্যাপ্টেন ব্যারি হাসিমুখে তাকে সম্ভাষণ করছে, হ্যালো মুকি!

মুখার্জিকে পালটে নিয়ে বহু ক্যাপ্টেন-বন্ধুই তাকে 'মুকি' বলে ডাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

চা খেয়ে, বাথরুম ঘুরে এসে, দাড়ি কামিয়ে, পোশাক-পরা শেষ করে আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন মুখার্জি।

দূরবীন দেব নাকি?

নেলী এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। পাড়-বিহীন সাদা একটা জর্জেট শাড়ি পরনে, সাদা সাটিনের ব্লাউজ, মাথার বব-করা অস্নাত চুল রুক্ষ আর এলোমেলো হয়ে আছে।

মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালেন মুখার্জি। পঁয়তাল্লিশ বোধহয় ছাড়িয়েছে ওর বয়স, তবু কেমন যত্ন এখনও স্বাস্থ্যের প্রতি। তেমন মোটা হয় নি নেলী, মাথার চুলেও তেমন পাক ধরে নি, পোশাকে-আশাকে এখনও ছিমছাম।

ওর দিকে তাকিয়ে মন প্রসন্নই হয়ে উঠল। বললেন, দাও। দূরবীনটা তো কাজের জন্যই কেনা হয়েছিল। কাল থেকে ওরও কাজ শেষ, হয়ত বাক্সে গিয়ে চিরতরে বন্দী হবে। আজ ওকে শেষবারের মত হাতে নেওয়া যাক।

শেষবারের জন্য তো বটেই। আর তিনি কখনও পাইলটিং করবেন না। চাকরিতে এক্সটেনশন পেয়েও যখন তিনি তা গ্রহণ করলেন না, নীলিমা তা ভাল মনে নিতে পারেন নি। আরও পাঁচ বছর চাকরি করলে কী ক্ষতিটা হত? মুখার্জি কোনদিন স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করেন নি, এবারেও হয়ত করতেন না! কিন্তু ডাক্তারের অভিমত ছিল অন্যরকম। ওঁর ব্লাডপ্রেসার বেশ বেশি, এ অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম আর-কতটা ওঁর পক্ষে সহনীয় হবে সেটা ভাববার বিষয়। এই যুক্তিতে নীলিমার হার হয়েছিল। বলেছিলেন, না, আর চাকরি তোমাকে করতে দেব না।

জানলার খুব কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দূরবীনটা ঠিক-ঠাক করে নিয়ে চোখের কাছে ধরলেন। পিছন থেকে নেলীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে. ওই তোমার শেষ জাহাজ বুঝি?

হ্যাঁ।

কী নাম?

বললেন।

নেলীর আর-কোনও প্রশ্ন নেই। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে জাহাজের ভিতরটা। পিছনের দিকে কালিঝুলি-মাখা খালি-গা একদল খালাসী উইন্চ ঘুরিয়ে ঘর্ঘর করে নোঙর ফেলতে ব্যস্ত। ওপরে জাহাজের ব্রিজে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে ক্যাপ্টেনকে।

মুখার্জি জাহাজে গিয়ে পৌঁছলে আবার নোঙর উঠবে।

দূরবীনটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন মুখার্জি। নেলী বললেন, সমুদ্র কিন্তু আজ খুব শান্ত।

হেসে বললেন, কবে না শান্ত থাকে?

ওরে বাবা! নেলী যেন কিছু চিন্তা করে নিজের মনেই শিউরে উঠলেন, মনসুনের কথা ভাবো তো? কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ! আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, আর ভয়ে মরছি। তোমার বোট যত এগোয়, আমার তত ভয় হয়—এই বুঝি ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে উলটে যায়!

হেসে উঠলেন মুখার্জি। নেলীর এই আকুলতাটুকু আজ কিন্তু ভালও লাগল। ওর

কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললেন, কলকাতায় গিয়ে তোমাকে নিয়ে খুব ঘুরব। আজ এখানে, কাল সেখানে, একেবারে আশ মিটিয়ে।

যাও!

যেন বহু বছর আগেকার নেলীর মতই মুখ ঘুরিয়ে একটু সরে দাঁড়াল নেলী। তারপরে একটুক্ষণ থেমে থেকে বললে, মনে আছে তো?

কী?

আজ সন্ধ্যায় ক্লাবে তোমার জন্য ফেয়ারওয়েল পার্টি!

মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল মুখার্জির মুখ : এসব আমি চাই না, তা তো জানো। অফিসে পর্যন্ত এড়িয়ে গেলাম।

বা রে, ওদের কার্ড পর্যন্ত বিলি হয়ে গেছে!

আচ্ছা, কেন এসব বলো তো! আমি তো বারণ করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু বারণ করবেই বা তুমি কেন? তুমি তো একাই ফেয়ারওয়েল পাচ্ছ না, আমিও পাচ্ছি। আমি রাজী হয়েছি। কথাও দিয়েছি।

সেই বহু বছর আগেকার নেলীর মতই দৃপ্ত ভঙ্গিতে কথাটি বলে ঘর থেকে ত্বরিত পায়ে বেরিয়ে গেল নেলী।

প্রতিবাদ করা বৃথা। তাই আর কোনও কথা বললেন না মুখার্জি, মুখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে দৃকপাত করলেন শুধু।

দেখতে দেখতে তাঁর নিজের ছেলেবেলাকার একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। খুবই ছেলেবেলাকার কথা। বাবা তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নোয়াখালিতে বদলি হয়ে গেছেন। বাবার সঙ্গে সেই গোয়ালন্দ হয়ে চাঁদপুর। সেখান থেকে ট্রেনে লাকসাম হয়ে তারপর নোয়াখালি।

চাঁদপুরের সেই দিগন্তবিস্তৃত বিপুল জলরাশি সেই বয়সে মনে একটা অদ্ভুত ছাপ এঁকে দিয়েছিল। জল আর জল। এপার-ওপার দেখা যায় না। শুধু দিগন্তে একটা কালো সরলরেখা। সেটা তীরের রেখা, না এই সমুদ্রের মতই জলের রেখা, তা আজ মনে করা অবশ্য যায় না। কিন্তু এই রকম জানলায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাতে তাকাতে কতদিন এই আজকের মত সেই চাঁদপুরের ছবিই স্মৃতির দিগন্তে ভেসে ভেসে উঠেছে।

গাড়ি তৈরি।

চমকে উঠলেন যেন মুখার্জি, তারপর বললেন, যাই।

নীলিমা বললে, ও কী! ব্রেকফাস্ট খেলে না?

খেয়েছি।

কিন্তু সবই যে পড়ে আছে!

থাক।

আর কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির পথ ধরলেন মুখার্জি। গ্যারেজের দরজাটা খুলে ক্লিনার মকবুল দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে।

দরজা খুলে উঠে বসলেন পুরনো হিলম্যান গাড়িটাতে। নিজেই ড্রাইভ করবেন। এটিও বহুদিনের সঙ্গী। বহু লোক এটি বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু না, এটা তিনি ছাড়বেন না। রেলওয়ে-বুকিংয়ে এটিও যাবে কলকাতা। তাঁদের সঙ্গে যাবে না, হয়ত

দেরি হবে কিছু। গোমানীজ ডি-সুজা এই ভারটা স্বেচ্ছায় নিয়েছে নিজে। বিচ রোডের নির্জন রাস্তা ধরে হু-হু করে ছুটে চলল তাঁর বিশ্বস্ত হিলম্যান।

একেবারে পাইলট-জেটি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সমুদ্রের জল ভিতরে ঢুকে এসে একটু দূরেই বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁক থেকে জলধারা কিছুটা এগিয়ে তিনটি শাখায় গেছে ভাগ হয়ে। এর একটি শাখায় জাহাজ-বাঁধার পাকা জেটি। মাত্র তিনটি জাহাজ বাঁধা যেতে পারে একত্রে। বাকি জাহাজ এলে থাকে ভাসমান বয়া অথবা কয়লা-জেটির গায়ে বাঁধা। কলকাতা বা বম্বের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র বন্দর।

সেলাম সাব।

সেলাম। সব ঠিক হৈ, রামলু?

জী হাঁ।

গাড়িটা অফিসের গ্যারেজে রেখে একটু হেঁটে এসেই কাঠের ছোট্ট জেটি পেরিয়ে বোটে উঠলেন মুখার্জি। সঙ্গে সঙ্গে ক্রি-রিং শব্দ। তারপরে বোট একটু পিছিয়ে এসে তারপরে মুখ সোজা করে এগিয়ে চলল বহির্সমুদ্রের দিকে।

ধবধবে সাদা রঙ বোটটার। ইঞ্জিন-রুমের গায়ে বড় করে লেখা: পাইলট। রুমের ওপরে বামলু-সারেঙের হুইল ঘোরাবার জায়গা।

রুমের সামনে কাঠের পাটাতনের ওপর চেয়ার পাতা থাকে, তার ওপরে বসে পড়লেন মুখার্জি। বোট যত অগ্রসর হতে লাগল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প্রয়োজনমত নির্দেশ দিতে লাগলেন তিনি, সেইমত চলতে লাগল বোট।

নীল-উর্দি-পরা একজন খালাসী দাঁড়িয়ে আছে বোটের গলুইয়ের কাছে। আর তাঁর ঠিক পাশে আর একজন খালাসী কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। লোকটির নাম পোলায়া, ওর ব্যাগে দরকারী সব কাগজপত্র। লোকটি তাঁরই সঙ্গে এখন উঠবে জাহাজে।

সবাই ওরা চুপচাপ। নিশ্চয়ই ওরা জেনেছে, চলে যাচ্ছেন মুখার্জি। এই-ই তাঁর শেষ জাহাজ। তবু ওদের মুখে কথা নেই। কী এক অব্যক্ত বেদনায় যেন থমথম করছে ওদের মুখ।

ডেকে ওদের কিছু বলবেন নাকি এ বিষয়ে? বলবেন নাকি মুখ ফুটে, আমি কালই চলে যাচ্ছি, জানিস?

কিন্তু বারকয়েক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কথাটা বলতে পারলেন না তিনি। আর কীই বা বলবেন? তার থেকে কাজ করতে করতে এমন করে হঠাৎ মুছে যাওয়াই ভাল।

বড় শান্ত আজ সমুদ্র। নিস্তরঙ্গ জলস্রোতের ওপর দিয়ে তরতর করে হাঁসের মত এগিয়ে যেতে লাগল বোট।

বন্দরের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজ। পাশ দিয়ে দিয়ে হালের কাছ পর্যন্ত চলে গেল বোট, তারপর মুখ ফিরিয়ে একেবারে কাছ ঘেঁষে চলতে লাগল গতি মন্থর করে।

কোন্ দিকে সিঁড়ি দিয়েছে রে, রামলু?

স্টারবোর্ড।

তা হলে ঠিক আছে। সিঁড়ির কাছে নিয়ে যা। পোলায়া, সিঁড়ি ধরিস।

জাহাজের সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিকটা হয় পোর্টসাইড, ডান দিকটা স্টারবোর্ড। আর পাইলট ওঠবার জন্য যে সিঁড়িটা ঝুলিয়ে দেয়, সেটা দড়ির। দুটো দড়ি

পাশাপাশি ঝোলানো—মাঝখানে শক্ত করে সিঁড়ির মত পর পর কাঠ লাগানো। দুহাতে দড়ি ধরে দোদুল্যমান সিঁড়ি দিয়ে সেই কাঠের ওপর পা রেখে রেখে ওপরে ওঠা। নতুন লোকের ভয় করবে, কিন্তু এঁদের এটা অভ্যেস।

উঠতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল চিফ অফিসার, বললে, মর্নিং পাইলট।

মর্নিং।

তরতর করে লোহার সিঁড়ি বেয়ে এবার ওপরে উঠলেন মুখার্জি, একেবারে তেতলায়, ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনেকার বারান্দায়, অর্থাৎ 'ব্রিজে'।

না, এ ক্যাপ্টেন তাঁর পরিচিত নয়। নাম বললে, উইলিয়ামস। মধ্যবয়সী, কিন্তু শক্ত-সমর্থ চেহারা। মুখার্জির সঙ্গে এক জায়গায় অদ্ভুত মিল—মাথার চুলগুলি ওরও ঘন আর বড় বড়। কিন্তু সব সাদা।

প্রাথমিক সম্ভাষণ শেষ করে কাজে লাগতে না লাগতেই দেখা গেল, লম্বা ত্রিকোণ নিশানের মত লাল একটা ফ্ল্যাগ উড়ছে, মাঝখানে সাদা লম্বা দাগ। পাইলট-ফ্ল্যাগ। তার মানে, যাবা জানবার তাবা জেনে রাখো—পাইলট জাহাজে উঠেছেন।

ওঁকে বেখে বোট ফিবে যাচ্ছে, আর বন্দরের মুখে দেখা যাচ্ছে, টাগ দুটোব চিমনিব ধোঁয়া, মেঘাদ্রিরা এসে পড়ল বলে।

ঘড় ঘড়—ঘড় ঘড় শব্দে জাহাজের নোঙর উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই টাগ এসে লাগল। শুরু হল কর্মব্যস্ততা। তাঁর নির্দেশমত মুখে চোঙা লাগিয়ে উচ্চকণ্ঠে ক্যাপ্টেন নিজেই চালনা করতে লাগলেন খালাসীদের।

এখান থেকে বন্দরে গিয়ে জাহাজ বাঁধা পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত, ক্যাপ্টেনের কোনও দায়িত্ব নেই, সব দায়িত্ব পাইলটের। তারই হাতে এখন জাহাজ-চালানোব সর্বময় কর্তৃত্ব।

জাহাজ যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মনে হচ্ছে, টাগ দুটো যেন এক নবাগত পথিকের হাত ধরে সমাদরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বন্দর-অভ্যন্তরে।

পিছন ফিরে তটরেখার দিকে একবার তাকালেন মুখার্জি। শহরের ঘন বসতি ছাড়িয়ে বেলাভূমি ধরে উত্তরে গিয়ে জনবিরল একটা দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বাসা কয়েকটা ঝাউগাছের অন্তরালে। একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলে তাঁর ঘরের সেই জানলাটিও দেখা যায়। লোক ঠিক চেনা যায় না, তবু কি মনে হয়—নীলিমা দাঁড়িয়ে আছে ওই জানলাব পাশে চুপচাপ? কে জানে।

কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই যেন সম্বিত ফিরে পেলেন মুখার্জি। বলে উঠলেন, স্ল্যাক ডাউন স্টারবোর্ড। ডাইনের টাগ, জাহাজের সঙ্গে বাঁধা তোমার লোহার টানা তারটা একটু ঢিলে করো।

ক্যাপ্টেন অমনি তাঁর হাতের চোঙাটায় মুখ বেখে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, স্ল্যাক ডাউন স্টারবোর্ড।

কিছুক্ষণ করে আবার অনুরূপ নির্দেশ, পুল অন স্টারবোর্ড।

চোঙায় জলদগম্ভীর স্বর তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হল, পুল অন স্টারবোর্ড। আবার টানো হে ডানদিকের টাগ।

এমনি করতে করতে ক্রমশ বন্দরের মুখ ছাড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করল জাহাজ।

কাজ করতে করতে একসময়ে হঠাৎ নজরে পড়ল সাদা-শাড়ি-পরা কে একটি মেয়ে বাঁ-দিককার দোতলায় রেলিং ধরে লাইফ-বোটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

শাড়ি-পরা মেয়ে কে এল এই জাহাজে? মুখখানা পাশ ফেরানো, ভাল করে দেখা যায় না, তবু মনে হল, অল্পবয়সী মেয়ে। অচেনা ক্যাপ্টেনকে সোজসুজি প্রশ্ন করাও অশোভন আর তা ছাড়া কে মেয়ে, কোথাকার মেয়ে, কোথা থেকে আসছে, তাঁরই বা অতশত জানবার প্রয়োজন কী?

শুধু বললেন, ক্যাপ্টেন, তোমার জাহাজে কিছু প্যাসেঞ্জার আছে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, চারজন। তার মধ্যে একজন লেডি। সবাই আসছে বিলেত থেকে।

বিলেত!—অকারণে হঠাৎই যেন চমকে উঠলেন মুখার্জি। পরক্ষণেই সামলে নিলেন একটু হাসিও এসে পড়ল তাঁর ঠোঁটের কোণে। বিলেত থেকে কত লোকই তো আসছে কত লোকই তো যাচ্ছে, এতে আজকাল আর চমকাবারই বা আছে কী, কৌতূহলেরও বা আছে কী!

সব কিছু চিন্তা মন থেকে মুহূর্তে সরিয়ে ফেলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মুখার্জি জাহাজ এবার বাঁক নিচ্ছে। ব্রিজের ওপর রীতিমত ছুটোছুটি শুরু হল তাঁর এবার হাঁকডাক আব ছুটোছুটি।

জেটিতে জাহাজ বাঁধতে বাঁধতে কেটে গেল আরও আধ ঘণ্টা।

এক নম্বর জেটিতেই জাহাজ লাগছে। জেটির সামনে আর পিছনে দুটো নৌকো দুটোতেই চারজন করে লোক। ওদের কাছে গুটিয়ে-রাখা লম্বা দড়ি আছে, দড়ির মাথায় গল্‌ফ বলের মত বল বাঁধা। তাক করে দড়ি তারা ছুঁড়ে দিল জাহাজের ডেকের দিকে অমনি খালাসীরা ধরে নিল সেই দড়ির প্রান্ত। তাবপরে, জাহাজের মোটা কাছির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল সেই দড়ি। বেঁধে, ধীরে ধীরে কাছিটা নামিয়ে দিল নিচে। নৌকোব লোকেরা এমনি করে কাছির প্রান্ত সংগ্রহ করে নৌকোর সাহায্যে তীরে এসে উঠে জেটিতে লোহার প্রকাণ্ড ক্যাপস্টানের সঙ্গে বেশ করে জড়িয়ে সেই কাছি বাঁধল। সামনে আর পিছনে দুটো কাছি। কাছি দুটোর অপর প্রান্ত রয়েছে জাহাজে। উইন্‌চের সাহায্যে খালাসীরা জাহাজের দড়ি যত গুটিয়ে আনবে, তত জেটির গা ঘেঁষে এসে লাগবে জাহাজ।

এ তো গেল জাহাজের বাঁ দিকের ব্যাপার। ডান দিকেও অমনি করে সামনে-পিছনে কাছি বাঁধা হল ভাসমান বয়ার সঙ্গে।

একে একে সমস্ত কাজ শেষ হবার পর মুখার্জি বললেন, ও-কে।

ধীরে ধীরে একটা কাঠের সিঁড়ি জেটি থেকে তুলে জাহাজে লাগাতে লাগল জেটিব ক্রেনটা।

এখুনি আসবে কাস্টমস আর পুলিশের লোক, এজেন্ট আর তার ঠিকাদারেরা।

ক্যাপ্টেন বললে, আসুন, একটু কফি খেয়ে যান।

চলুন।

কফি খেতে খেতেই দরকারী কাগজপত্রগুলো সব পোলায়ার ব্যাগ থেকে বার করে নিয়ে ক্যাপ্টেনকে দিয়ে যথারীতি সই করিয়ে নিলেন মুখার্জি।

জাহাজে ভিড় বাড়ছে। কাস্টমস তার কাজ করছে। পুলিস দিচ্ছে তার ছাড়পত্রাদি সই করে জাহাজের লোক বা প্যাসেঞ্জারদের নেমে যাবার জন্যে। আসছে এজেন্টের লোক জাহাজের প্রায় সমস্ত খালাসী সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে উন্মুখ হয়ে আছে। কাছে আসতেই ব্যাকুল আগ্রহে এক একজন প্রশ্ন করছে, এনি মেল ফর মি? আমার কোনও চিঠি আছে?

প্রচুর। কার কার, তা জানি না। ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

এজেন্টের লোক ক্যাপ্টেনের কাছে চিঠির গুচ্ছ নিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, বললেন, তা হলে এবার চলি ক্যাপ্টেন। গুডবাই।

গুডবাই। আবার দেখা হবে।

থেমে গেলেন মুখার্জি। বলতে গেলেন, না ক্যাপ্টেন, আর দেখা হবে না। আমি আজ রিটায়ার করছি।

কিন্তু বলা হল না। চিঠির গুচ্ছ হাতে নিয়ে সেই দিকেই মন দিয়েছে ক্যাপ্টেন, এখন অন্যের অন্য-কিছু শোনবার আগ্রহ তার নেই। আর ও-কথা ওকে বলে তাঁরই বা কী লাভ?

ধীরে ধীরে জাহাজ থেকে নেমে এলেন মুখার্জি। কেমন যেন হাতটা কাঁপছে অকারণ, চোখের দৃষ্টিও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। গলার কাছে কিসের এক অব্যক্ত আবেগ যেন মথিত হয়ে উঠেছে। কী এক অশ্রুত রাগিণী যেন বাণী চেয়ে ছটফট করে মরছে তাঁর মধ্যে।

কিন্তু না. তিনি আর-কিছুতেই ফিরে তাকাবেন না 'স্টিল ম্যারিনারে'র দিকে। জোর করে সেদিক থেকে মুখ ফিবিয়ে বোটে গিয়ে উঠে বসলেন। যাবেন সোজা একেবারে অফিসে।

ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন রডরিগ। 'স্টিল ম্যারিনারে'র কাগজপত্র তাঁর সামনে রেখে তাঁকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে তক্ষুনি চলে আসবেন মুখার্জি, হঠাৎ ভাল করে তাকিয়ে দেখেন, একদৃষ্টে তাঁরই দিকে চেয়ে আছেন রডরিগ।

একটু থেমে থেকে মুখার্জি বললেন, কী? কিছু বলবে আমাকে?

হ্যাঁ।—যেন অনেকদূর থেকে ভেসে আসতে লাগল রডরিগের কণ্ঠস্বর, এমনি ধীর শান্ত। বললেন, একসঙ্গে এত বছর কাটালাম, আজ তুমি যাচ্ছ। অনুষ্ঠান তুমি চাও নি, অফিসের লোকেরা তাই কোনও অনুষ্ঠান না করে সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে তোমাকে এই সামান্য জিনিসটি তৈরি করে উপহার দিয়েছে। এটি নাও।

রুপো দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটি টাগের মডেল। যেন ক্ষুদ্রকায় মেঘাদ্রি। রডরিগের ভাষায়, কচি খুকিটি যেন।

দুই হাতে ধরে মডেলটা একেবারে বুকের ওপর চেপে ধরলেন মুখার্জি, বললেন, কী চমৎকার!

তারপর, একে-একে অফিসের ছোট-বড় সবাই এল দেখা করতে। এক-একজন করে সামনে এল আর পরক্ষণেই সরে গেল। এ-ও এক সময় শেষ হয় গেল। মুখার্জি বললেন, এবার যাই?

একটু এগিয়েও আবার ফিরে দাঁড়ালেন মুখার্জি, ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললেন, তুমি কিন্তু সেই কথাটা আমাকে বললে না।

কোন্‌টা?

সেই যে কাল যেটা রিহার্স্যাল দিয়ে রেখেছিলে? There cannot be any fare-well...

সঙ্গে সঙ্গে রডরিগ এগিয়ে এসে উপহারসুদ্ধ ওঁর হাতদুটো ধরে কথা বলতে গিয়েও

কিছু বলতে পারলেন না, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর, চোখ দুটিও সজল হয়ে উঠল। একজন বাংলাব, অপরজন সেই সুদূর স্কটল্যান্ডের। কিন্তু স্পন্দিত দুটি হৃদয়েব ছোঁয়ায় কলকাতা আর এবার্ডিন ততক্ষণে একেবারে একাকার হয়ে গেছে।

আর কোনও কথা হল না কারও সঙ্গে। তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠেছেন, জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে সবাই তা দেখল। কেউ কথা বলল না, এমন কি হাতও তুলল না। না তুলে, এই বিদায়-মুহূর্তটিকে যেন আরও করুণ আরও মুহ্যমান করে দিল।

নির্জন বিচ রোড দিয়ে গাড়ি ফিবে চলেছে তাঁর বাসার দিকে। বেলাভূমির ওপবে কয়েকটি জেলে তাদেব লম্বা আর বিরাট জালগুলি শুকোতে দিয়েছে। কেউ কেউ এক এক জাযগায় বসে ছেঁড়া জালের টুকরোগুলো সেলাই করে চলেছে একমনে। দেখে মনে হয়, বিশ্বসংসাবে এই যে এত ওঠাপড়া চলেছে প্রতিটি মুহূর্তে,—ওদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কৌতূহলও নেই, ওরা নির্বিকার।

গাড়ি যথারীতি গ্যারেজে উঠিয়ে দিয়ে বারান্দা পার হয়ে সোজা নিজের ঘরেব দিকেই যাচ্ছিলেন মুখার্জি। বামস্বামী ছুটে আসতে থমকে থেমে প্রশ্ন করলেন, মেমসাব কোথায়?

হাত দিয়ে সে দেখিয়ে দিল, ঘরেই আছেন।

বোধ হয় স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। শোবাব ঘরে ড্রেসিং টেবিলে বসে হালকা প্রসাধনেই বুঝি ব্যস্ত ছিলেন নীলিমা।

মুখার্জি তাঁর সামনে রুপোর মডেল টাগটা রেখে বলে উঠলেন, দেখ এটা। অফিসেব লোকেরা দিয়েছে।

নীলিমা হাত দিয়ে উপহারটা একটু ছুঁয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, সুন্দর।

খাটের ওপর বসে পড়লেন মুখার্জি, বললেন, গৌতম ইস্কুলে বেরিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

কী ঠিক হল? পরীক্ষা ওর সামনে। সেন্ট অ্যালইসাস স্কুলের হস্টেলেই ও থাকবে তো?

হ্যাঁ। রেভারেন্ডকে আমি ফোন করে দিয়েছি। ওর বিছানা বাক্স বইপত্তরও আলাদা করা আছে। কাল সকালেই ও হস্টেলে চলে যাবে।

পরীক্ষার পর গৌতম একা একা কলকাতা যেতে পারবে তো?

খুব পারবে।

মুখার্জি বললেন, যাক, এদিকেও শেষ হয়ে গেল। এবার যাবার পালা।

যাবার পালাই তো। তবে, অনেক-কিছু গুছোতে আমাদের এখনও বাকি।

হয়ে যাবে।

নেলী বলল, ভাল কথা। কে একটি মেয়ে এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

মেয়ে!

হ্যাঁ।

কে মেয়ে?

দেখ না গিয়ে।

কোথায়?

বাইবে। বারান্দায়।

উঠলেন মুখার্জি। কাঠের জাফরি-কাটা বারান্দার এককোণে বেতের কতকগুলি চেয়ার আর টিপয় সাজানো। তারই একটি চেয়ারে চুপচাপ এতক্ষণ বসেছিল মেয়েটি, কালোপাড়ের সাদা একটা শাড়ি পরনে। ওকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নমস্কার জানাল।

কে?

আমি সোমা।

ধবধবে ফরসা ওর গায়ের রঙ, মুখের ভাবটি ভারি কোমল, ভারি মনোরম মনে হল। কত বয়স হবে? চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। কিন্তু, কে এ? সোমা নামের কোনও মেয়ের কথা তো মনে পড়ে না!

ঠিক চিনতে পারছি না তো!

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে একটি চিঠি তাঁর হাতে দিল। বলল, এই চিঠিখানা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

ফিকে নীল রঙের একটি খাম, গোটা-গোটা অক্ষরে তাঁর নাম লেখা—বাংলায়। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু বিদ্যুতের জ্বালা দিয়ে রচনা করা কয়েকটি অক্ষর যেন!

পড়া শেষ করেই মুখ তুলে তাকালেন মেয়েটির দিকে। যেন ঝাপসা দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ। ছোট্ট কপাল, ভুরু, দুটি চোখ, ঠোঁট, চিবুক—সব যেন ধীরে ধীরে ছায়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার চিঠির দিকে চোখ নামালেন, চিঠির কথাগুলোও যেন ঝাপসা—পড়া যায় না। আবার চাইলেন মেয়েটির দিকে, তারপরে আবার চিঠি।

কিন্তু কোথায় কে! সব যেন মুছে যাচ্ছে। সব যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। সন্ধ্যার কুলায় ফিরে-আসা একঝাঁক পাখি চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ক্রমাগত কলরব করে চলেছে না?

একটা চেয়ারের হাতল ধরে নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন মুখার্জি। বোধ হয় তিনি পড়েই যাচ্ছিলেন। অদৃশ্য কোন শক্তি মুহূর্তে তাঁকে প্রবল নাড়া দিয়ে নিচেই ফেলে দিচ্ছিল বুঝি।

কিছুক্ষণের মধ্যে শক্তি ফিরে পেলেন মনে হচ্ছে। পাখির কলরব নীরব হয়ে গেছে। অন্ধকার মুছে গিয়ে আলোও দেখা দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

চেয়ারে বসে পড়ে আবার মেলে ধরলেন চিঠিটা চোখের সামনে। বেশ পড়া যাচ্ছে এবারে। 'ইতি সুজাতা'—শব্দ দুটি ওই তো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

চিঠিখানা আবার বন্ধ করে মেয়েটির দিকে তাকালেন মুখার্জি। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে মেয়েটি। তাঁর অবস্থা দেখে কিছু একটা তার করা দরকার মনে হচ্ছে। কিন্তু কাছে আসবে কি আসবে না—বুঝতে পারছে না। কাছে এসে তাঁকে তার সাহায্য করা উচিত কিনা, তাও ঠিক বিচার করে উঠতে পারছে না।

মুখের ভাব দেখে সত্যিই মন কোমল হয়ে আসে, সত্যিই মায়া জাগে মেয়েটির ওপর। ওর পাশেই মেঝের ওপরে রাখা ওর সুটকেসটা,—তাতে জাহাজের ছাপ দেওয়া লেবেল লাগানো রয়েছে তখনও। সেইদিকে একবার তাকিয়ে আবার ওর চোখের দিকে তাকালেন মুখার্জি। বড় বড় টানা টানা দুটি চোখ—মণি দুটি কালো। কালো ওর মাথার চুল। একটি বেণীতে বাঁধা হয়ে পিঠের উপর দিয়ে ঝুলে আছে।

কত কী কথা একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মুখ দিয়ে মাত্র বেরিয়ে গেল একটি কথা: সোমা বুঝি তোমার নাম?

হ্যাঁ।

মেয়েটি সরে এসে একেবারে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে ওঁকে প্রণাম করল এবার।

অপ্রস্তুত বোধ করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, থাক থাক, হয়েছে। তুমি বোসো।

মেয়েটি তখনই কিন্তু বসল না।

মুখার্জি একটু সহজ হবার চেষ্টা করে বলে উঠলেন, 'স্টিল ম্যারিনারে'ই তো এলে, না?

হ্যাঁ। আপনিই তো পাইলটিং করে নিয়ে এলেন!

ঠিক। আমিই পাইলট। বলতে গেলে আমিই নিয়ে এসেছি তোমাকে। কিন্তু—তুমি বোসো।

অনেক দ্বিধার পর এতক্ষণে তার সামনের চেয়ারে এসে বসল মেয়েটি।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললেন মুখার্জি, জাহাজে আমাকে দেখেছিলে?

হ্যাঁ।

চিনলে কী করে?

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল, নিমেষে রাঙা হয়ে উঠল মুখখানা, তারপরে কোনক্রমে বললে, প্রথমে চিনতে পারি নি।

তারপর?

বললে, আপনি যে এখানে, তা তো জানতাম।

কী করে?

মা জানত। কীভাবে যেন খোঁজ পেয়েছিল।

সেটা সম্ভব হতে পারে।

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে, তারপরে একটু থেমে, বলতে লাগল, আপনাকে দেখিয়ে জাহাজের একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইনি পাইলট না? সে বলল, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিনতে পারলে?

না। মার কাছে যে ফোটো আছে, সে চেহারা থেকে অনেক তফাত হয়ে গেছে।

তবে?

মেয়েটি আবার একটু থামল, একটু দম নিয়ে বলল, যে কাস্টমস অফিসারটি আমার জিনিসপত্র দেখতে এসেছিলেন, তাঁকে বললাম আপনার নাম। তারপর দূর থেকে আপনাকে দেখিয়ে বললাম, উনি কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তারপর?

মুখ নিচু করেই প্রায়শ কথা বলছিল মেয়েটি, সেইভাবেই বলতে লাগল, তারপরেই আপনি নেমে গেলেন। জাহাজ থেকে আমার বেরুতে বেরুতে তার পরেও অনেক দেরি হল। বাইরে বেরিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে আপনার বাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

কষ্ট হয়েছে তো খুঁজে বার করতে?

না না, তেমন কষ্ট আর কী।

মেয়েটির আর কোনও কথা নেই। কিন্তু ওঁর তো আরও কিছু কথা বলা দরকার। কিছু না-বলাটা ভাল দেখায় না। নেলীই বা এসে পড়ছে না কেন এখনও? যা হয় একটা কিছু হয়ে যাক—ঝড়ঝঞ্ঝা, যা হোক কিছু।

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একসময়ে বলেই ফেললেন মুখার্জি, কিন্তু এমন ভাল বাংলা বলতে তুমি শিখলে কেমন করে?

লজ্জিত হয়ে আবার মুখ নিচু করল মেয়েটি, বলল, মা শিখিয়েছে।

চুপ করে রইলেন মুখার্জি। আর কী বলবেন? এরও পরে আর কী কী প্রসঙ্গ শুরু করা যেতে পারে? সব থেকে আশ্চর্য হচ্ছিলেন তিনি নিজের মনের অবস্থা দেখে। ভিতরটা দমকা ঝড়ের হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাইরে তার কিছুই প্রকাশ পেল না। বেশ স্বচ্ছন্দে সাধারণভাবে কথা বলে যাচ্ছেন তিনি, গলার স্বর একটুও কাঁপছে না, কথা একটুও আটকে যাচ্ছে না।

বিস্মিত হচ্ছেন তিনি মেয়েটিকে দেখে? না, নিজেকে দেখে?

এতক্ষণ পরে নীলিমাকে দেখা গেল বাইরের বারান্দায়। পায়ে পায়ে সে এবার এদিকেই আসছিল। কাছে এসে থামতেই তাকে দেখিয়ে মেয়েটিকে বলে উঠলেন মুখার্জি, এঁকে প্রণাম করো। তোমার মা।

মা!

কথাটা শুনে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল নীলিমা। মেয়েটি তার পায়ে হাত দিয়ে তাকে প্রণাম করল, সে যেন তখন অনুভবই করতে পারল না কিছু।

অনেকক্ষণ পরে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল সে। বলল, অ্যাঁ! কী বললে! কে ও?

সোমা। আমার মেয়ে।

মেয়ে!

হ্যাঁ। ওর মার নাম সুজাতা।

সুজাতা!

হ্যাঁ। সে অনেক কথা। পরে বলছি। মেয়েকে আগে কাছে টেনে নাও। অনেক দূর থেকে আসছে ও। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে।

॥ ২ ॥

নেলীর মস্ত গুণ, তাদের দুজনের মধ্যে চরম অশান্তি আর বিক্ষোভ ঘটে গেলেও তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কিছুতেই কিছু প্রকাশ করবে না সে। ভিতরের ঘরে দুজনে কতদিন কত কলহ করেছে চাপাকণ্ঠে, কত ভুল বোঝাবুঝি, কত মন কষাকষি। দুরন্ত ক্রোধে আর উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপেছে হয়ত নেলী, মনে হয় সংসারে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে আজ। কিন্তু বসবার ঘরে কোনও আগন্তুক এসেছে শুনলে পরক্ষণেই উপস্থিত হয়েছে তার সামনে হাসিমুখে। অতি শান্ত, অতি মৃদু ঝঙ্কার-তোলা তার কণ্ঠস্বর: এই যে মিসেস শান্তনম্। মাদ্রাজের মহিলা-সম্মেলন শেষ করে ফিরে এলেন কবে? কী চমৎকার লাগছে, আপনি এসেছেন! খু—ব খুশি হয়েছি।

এবারেও ঠিক তাই হল। সোমাকে যখন ডেকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল নীলিমা, তখন ওর মুখ দেখে বাইরের কারুর কি কিছু বোঝবার উপায় আছে যে, ওর মনের ভিতরে কিসের আলোড়ন চলেছে! বুঝলেন মুখার্জি নিজে। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলেন, ঈশ্বর কৃপা করেছেন যে প্রসাধনের সখটা প্রৌঢ়ত্বেও ওর বজায় আছে। স্নান-পরবর্তী প্রসাধন—অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে ওর মুখের ভাব। আর ভাগ্যিস গেছে! নইলে কী অসুবিধাই না বোধ করত সোমা!

যে-ক্লাবে যাওয়ার আগ্রহ নেলীর সর্বাধিক, রাত্রে সেই ক্লাবেই সে গেল না শেষ পর্যন্ত। বললে, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তুমি যাও। তোমার যাওয়া দরকার।

একা একা?

ঘরে মাত্র ওরা দুজনেই তখন। নীলিমা তার বিছানায় শুয়ে। মাথাটা বালিশের ওপরে ভাল করে উঠিয়ে ওঁর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে উঠল, কেন? তোমার মেয়ে—তাকে নিয়ে যাও না।

সারাটা দিন যতবারই ঘরে দুজন মাত্র থেকেছেন, ততবারই শুনতে হয়েছে এই ধরণের শ্লেষ। বিস্তৃত কিছু নয়, ছোট-ছোট কাটা-কাটা কথা। যেমন : রটনা বিয়ের আগেই শুনেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করি নি তখন।

কেন?

ইয়োরোপে গেলেই পুরুষদের নিয়ে ও-ধরনের রটনা হয়। একটু আধটু রোমান্সও হয়। ওসব গায়ে মাখার কথাই নয়।

তবে?

কী তবে? এতটা যে সব-কিছু সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, তা তো সত্যি-সত্যিই ভাবতে পারি নি।

ভাল করে খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল তখন।

তোমারও উচিত ছিল স্ত্রীকে সব-কিছু খুলে বলা।

কিন্তু বলব কী?

যা ঘটেছে।

কী ঘটেছে?

টের পাবে। টিটিক্কার পড়ে যাবে চারদিকে। স্ক্যান্ডালাস!

চুপ করে ছিলেন মুখার্জি।

নেলী আবার একসময় কথা তুলেছিল : কোথায় সেই মেম?

ম্লান হেসে বলেছিলেন মুখার্জি, তাকে আবার কেন? পঁচিশ বছর হল বিলেত থেকে এসেছি। তার প্রায় সাত বছর পরে তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। এই আঠেরো বছরে তার কোনও ছায়া তুমি দেখেছ? তার কোনও চিঠি?

তবে এটা কী? এই মেয়ে?

কী হবে কথা বাড়িয়ে? অনড় অচল নিরুত্তর ছিলেন মুখার্জি।

এবারে ক্লাবে যাওয়ার প্রশ্নে ইচ্ছে হল চিৎকার করে সবকিছু খুলে বলেন। ইচ্ছে হল, চিৎকার করে বলেন, অপরাধ কার, তা তুমিই বিচার করো, হে ঈশ্বর।

কিন্তু না, অতিকষ্টে সামলে নিলেন নিজেকে। শান্ত ধীরকণ্ঠে শুধু বললেন, মেয়েকে ক্লাবে নিয়ে যাবার কথা বলছ? যেতাম নিয়ে। ওর বাবার ফেয়ারওয়েলকে ও না হয় নিজের চোখে দেখত। কিন্তু, অতদূর থেকে এসেছে, ও শ্রান্ত। শুয়ে বিশ্রাম করছে।

বলেই আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দায় এসে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন। কাছের গির্জাটায় বোধ হয় ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল। না, আর দেরি করা চলে না। যেতে যখন হবে তখন এখুনি যাওয়া উচিত।

সিঁড়িতে পা দিয়েও বারান্দায় সেই জাফরি-কাটা কোণটার দিকে আপনিই চোখ চলে গেল। অমন অন্ধকারে আলো না জ্বালিয়ে কে ওখানে বসে? কে যেন বেতের একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে না?

কী মনে করে যেন ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন ওদিকে। বলে উঠলেন, কে?

বসে-থাকা মূর্তিটি ঈষৎ চমকে কেঁপে উঠল যেন। তারপরে মৃদুকণ্ঠে সাড়া দিল, আমি।

গৌতম?

হ্যাঁ।

এখানে এমন করে বসে?

এ কথার উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল গৌতম। পায়ে পায়ে ওঁর কিছুটা কাছে এসে থেমে গেল, বললে, ও কে?

কে? কার কথা বলছিস?

মেয়েটি?

এক মুহূর্ত থেমে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন মুখার্জি, তোর দিদি।

ও।

আর-কিছু বলবি?

না।

পনেরো বছরের ছেলে, নিজের পড়াশুনো নিয়ে যে মগ্ন, সন্ধেবেলা বাবাকে কাছে পেলে শেক্সপিয়ারের বহুল-প্রচলিত নাটকগুলো নিয়ে যে ছেলেমানুষি সব প্রশ্ন করতে আসে, সেই খোকা—সেই গৌতম যেন মুহূর্তে একেবারে প্রবীণ হয়ে গেছে।

কিন্তু কেন? সোমাকে ও নিশ্চয়ই দেখেছে, কিন্তু ও-ও কি সহ্য করতে পারছে না ওকে?

ক্লাবের কলরব থেকে শেষ বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় বারোটা। নিঝুম নিশুতি হয়ে গেছে বাড়ি। রামস্বামী যথারীতি দরজা খুলে খাবার ঘরের আলো জ্বালছিল। তাকে হাত নেড়ে বারণ করলেন মুখার্জি। রাত্রের খাবাব ক্লাবেই শেষ করে এসেছেন।

পোশাক-টোশাক বদলে শোবার ঘরে এসে দেখেন, তখনও প্রখর সাদা আলোটা জ্বলছে স্নিগ্ধ নীলাভ আলোর পরিবর্তে। নীলিমা তখনও জেগে, কী-একটা বই পড়ছে যেন শুয়ে শুয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাবার পর মুখার্জিই প্রশ্ন তুললেন, সোমা কোন্ ঘরে?

বইটা মাথার কাছের টেবিলে হাত বাড়িয়ে রেখে দিয়ে নীলিমা বলল, পশ্চিমের ঘরে।

ঘুমুচ্ছে?

হ্যাঁ।

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ। নীলিমা বলল, একটা কথা ভাবছি।

কী?

মুখটা ফিরিয়ে ওঁর দিকে সোজাসুজি তাকাল নীলিমা, বলল, এ বাড়িটা আরও মাসখানেক কি রাখা যায়?

তা কেন যাবে না? নতুন পাইলট এখন কেউ আসছে না। অফিসে একটা ফোন করে দিলেই হবে।

তাহলে আমি বলি কী, নীলিমা তাড়াতাড়ি বলল, আমি বরং থেকে যাই। মাসখানেকের মধ্যেই গৌতমের পরীক্ষা-টরীক্ষা হয়ে যাবে। একেবারে ওকে নিয়ে ফিরব।

মুখার্জি নিরুত্তর।

কয়েক মুহূর্ত ওঁর কথাব অপেক্ষায় চুপ করে থেকে তারপরে নীলিমা বলল, কী, অমত আছে নাকি?

বলেই ওঁকে কোনও সাড়া দেবার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বলে যেতে লাগল নীলিমা, অমতের কিন্তু কোনও মানে হয় না। গৌতম ছেলেমানুষ, আজ পর্যন্ত কখনও ছেড়ে থাকে নি আমাকে। হস্টেলে থেকে পরীক্ষা দিতে গেলে ওর কষ্ট হবে। আই মীন, মানসিক কষ্ট।

অলক্ষ্যে একটু হেসেই ফেললেন মুখার্জি। গৌতমের হস্টেলে থাকবার ব্যবস্থাপত্র সব নিজের মত অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিজেই করেছিল নীলিমা। এবং যখন করেছিল, তখন গৌতমের মানসিক কষ্টের কথা একবারও ভাবে নি সে। তখন একবারও বলে নি—আমি থাকি। তুমি যাও। মাসখানেক পরে কোয়ার্টারটা ছাড়লেই হবে।

মুখার্জি বললেন, আমাকে কিন্তু কালই যেতে হবে। সেই ভাবে চিঠি গেছে। তাছাড়া, নতুন বাড়ির ব্যাপার-ট্যাপাব—

সে তো বটেই, নীলিমা বলল, তুমি কালই যাবে। সঙ্গে তোমার মেয়েকেও নিয়ে যাও।

ঠিক এই কথাটাই আশা করছিলেন মুখার্জি। মনে মনে প্রতিক্ষণ এই ধরনের কথারই প্রতীক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ বাড়িয়ে লাভ নেই, কলহেরও প্রয়োজন নেই। সোমাকে নিয়ে যে প্রবল ঝড় উঠেছে সংসাবে, তার প্রকাশটা আর যাই হোক, শালীনতা আর শোভনতার সীমা অতিক্রম কবে না যায়। অন্তত, সোমা নিজে যেন বুঝতে না পারে। ভালই হল, ওকে নিয়ে কালই চলে যাবেন তিনি।

পাশ ফিবে অন্যদিকে মুখ করে শুয়ে পড়লেন মুখার্জি। শেষ জাহাজ বন্দরে নিয়ে এলেন তিনি, 'স্টিল ম্যারিনার'। আর এই জাহাজেই এল তাঁর মেয়ে সোমা!

আশ্চর্য, ঠিক এই মুহূর্তে সোমার মুখখানা ভাল করে মনে পড়ছে না। ধবধবে ফরসা ওর গায়ের রঙ—ঠিক ওর নিজের মায়ের মত। কিন্তু মুখ? মুখখানা কার মত? মনে করতে চেষ্টা করলেন মুখার্জি। ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে ভাল করে কথা বলারও অবকাশ হল না। কেমন যেন নির্জীব নিথর হয়ে গিয়েছিল তখন মনটা। কেমন দেখতে ওর মুখখানা? সেই তো বাইরে বসে ছিল বারান্দায় সাদা শাড়ি পরে। অমন করে শাড়ি পরাই বা শিখল কার কাছে? ওর মা তো শাড়ি পরত না। জানতও না শাড়ি পরতে। তবে?

জাহাজে রেলিং-ধরে-দাঁড়ানো একটি মেয়েকে তখন দেখেছিলেন, কিন্তু সে যে সোমা, তাঁরই মেয়ে—বলতে গেলে তাঁরই প্রথম সন্তান, শুধু তাঁরই সন্ধানে একেবারে একা বেরিয়ে পড়েছে সেই সুদূর দেশান্তর থেকে—কে জানত এ কথা!

কিন্তু কার মত দেখতে ওর মুখখানা? এখন মনে হচ্ছে, রঙের কথা বাদ দিলে, চোখ-নাক-চিবুক-কপাল সব মিলিয়ে একেবারে মিলি —তাঁরই হারানো মিলি।

বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

সেই বাসন্তীই যেন ফিরে এসেছে সোমা হয়ে।

এই কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে গায়ের কম্বল সরিয়ে বিছানা ছেড়ে মেঝেব ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি, স্মরণ নেই, হঠাৎ চমক ভাঙল খোলা দরজাটার কাছে এসে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছিলেন তিনি? পশ্চিমের ঘরে? সোমাকে দেখতে? দেখতে তাঁর বাসন্তীকে?

না, ঘুমুচ্ছে সে—ঘুমুক। দরজাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালেন মুখার্জি। ঘরের জোরালো সাদা আলোটা তখনও জ্বলছে,—মাথার কাছে বইটা খোলা। নীলিমা কখন যেন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে, আলোটা নেবাতেও পারে নি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন মুখার্জি। মাথাটা বালিশ থেকে সরে গিয়ে কাত হয়ে গেছে। সন্তর্পণে বালিশটা সরিয়ে দিলেন, ঘুম না ভেঙে যায় ওর।

ঘুম অবশ্য ভাঙল না, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলেন তিনি, চোখের কোণ বেয়ে গালের অনেকটা দূর পর্যন্ত চোখের জলের একটি ধারা বিশুষ্ক মরুনদীর মত রেখায়িত হয়ে আছে।

কিন্তু কেন এ কান্না! জীবনের মূল্যবান আঠেরোটি বছর তোমাকেই তো দিয়েছি নেলী! নিছক তোমাকেই।—মনে মনে বলে উঠলেন মুখার্জি—কোনদিন তোমার কোনও ইচ্ছায় বাধা দিই নি। যেখানে নিয়ে গেছ, গেছি। পার্টি, ভোজসভা, তোমার আত্মীয়মণ্ডলী —কাউকেই অবজ্ঞা করি নি। তোমার রুচিমত ঘর সাজিয়েছি, পোশাক পরেছি। এই আঠেরোটি বছর কেউ ছিল না, শুধু তুমি আর তুমি। ভয় নেই। ওই অতটুকু মেয়ে কিছুই করতে পারবে না তোমার। ও আসছে, কিন্তু ওর মা আসবে না। আসবার হলে অনেক আগেই আসত।

আলোটা নিবিয়ে দিলেন মুখার্জি। ঘর অন্ধকার।

সারাদিন যখনই সময় পেয়েছেন, সুজাতার চিঠিটা পড়েছেন। প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে। কোথায় আছে চিঠিটা? সোমার কাছ থেকে চেয়ে তো নিজের কাছেই রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। বোধ হয় পকেটে আছে। ছোটই চিঠি।

—তোমার মেয়ে, সোমা। এ পৃথিবীর আলো-বাতাসকে ও অনুভব করবার আগেই তুমি চলে গিয়েছিলে। তোমার দোষ নেই, আমিই বলেছিলাম চলে যেতে। সে আজ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। এই পঁচিশ বছর ধরে তোমার মেয়েকে আমি মানুষ করার চেষ্টা করেছি। বলেছি, তুমি ভারতবর্ষের মেয়ে। ও তাই হতে চেয়েছে। আজ বলে, ও যাবে ভারতবর্ষে। ভারতকে দেখবে। ভারতকে জানবে। বুঝলাম, ওকে আর বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ও যাবেই।

অবশ্য, ও বড় হয়েছে, ভাবনার কিছু নেই। তবু আমার মায়ের মন তো?

তাই এ-যাবৎ যা করিনি, তাই করলাম। মেয়ে জানত তার বাবা ভারতীয়, কিন্তু নাম-ধাম জানত না। আমার মুখ চেয়েই বোধ হয় কোনদিন কোনও জেদ ধরে নি। বলে দিলাম ওকে তোমার নাম আর ধাম। তুমি কোথায় আছ তা জানা আমার পক্ষে কঠিন নয়। তুমি যে ইন্ডিয়ান পাইলটিং সার্ভিসে তা তো জানতামই। মাস্টার টিকিট পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা। একদিন মেরিন বুলেটিনে দেখলাম তোমার নাম। বাঙালী পাইলট তোমাদের দেশে মাত্র জনকয়েক তোমরা আছ, তাই বছরের পর বছর বুলেটিনের খোঁজ রাখলে তোমার গতিবিধি জানা কঠিন হয় না। মেয়েকে বললাম, ভাইজাগেই যাও। সবার আগে দেখা করো তোমার বাবার সঙ্গে। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে তারপরে যা হয় কোরো।

মেয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝেছিল কে জানে, বলল, মা, বাবার কাছে গিয়ে ওঁর সংসারে অশান্তির ঝড় তুলতে চাই না, আমি তাঁকে একবার দেখব শুধু।

আর আমার কিছু বলার নেই। বিয়ে নিশ্চয়ই করেছ। ছেলেমেয়েদের আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি—সুজাতা।

সব-কিছুর ওপর একদিন চমৎকারই 'ইতি' করে দিয়েছিল সে। কিন্তু তার পরেও তো 'পুনশ্চ' বলে কিছু থাকে কখনও-সখনও। সোমা কি এসেছে সেই 'পুনশ্চ'র বাণী বহন করে?

জীবন তো সায়াহ্নের দিকে ঢলে পড়েছে। কর্মচক্র থেকেও আজ নিচ্ছেন বিদায়। ভেবেছিলেন, বুঝি শেষ হল সমস্ত অধ্যায়, এবার বিরাম। কিন্তু সমগ্র জীবন-তরণীর যিনি কর্ণধার, তাঁর অভিলাষ বোধ হয় ভিন্নরূপ। যেখানে সমাপ্তির রেখা টানার কথা, সেখান থেকে শুরু হল নতুন এক অধ্যায়। তাই, 'ইতি—সুজাতা'র পরেও জীবন-লিপিকায় অদৃশ্য কালি দিয়ে রচিত হল পুনশ্চের কথা—সোমা।

সোমা নয়, মিলি। মিলি নয়, বাসন্তী। কী দেখতে এসেছ মা তুমি? ভারতবর্ষ? কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষ?

সেও একদিন বলেছিল ঠিক এমনি কথা। গ্লাসগোর ছাত্রজীবন। ল্যান্ডলেডির বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করতে আসত সে। কীভাবে যে প্রথম পরিচয়, কীভাবে যে তার পরিণতি —স্মৃতির পৃষ্ঠায় তা অক্ষয় হয়ে আছে। কতটুকু আজ তার প্রকাশ করা যেতে পারে? কতটুকু তার বোঝাতে পারা যাবে অপরকে? কী খেয়াল যে তার হয়েছিল, বাংলা শিখতে শুরু করল তাঁর কাছে। বাংলা শিখেও ছিল। মুখার্জি তার নাম দিয়েছিলেন— সুজাতা। ডাকতেনও সুজাতা বলে। একদিন বলেছিলেন, সুজাতা, তোমাকে আমি বিয়ে করব।

না। আনুষ্ঠানিক বিয়েতে আমার বিশ্বাস নেই।

আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে চলো।

না।

কিন্তু, যে-সন্তান তোমার কোলে আসছে?

তার কথা তোমায় ভাবতে হবে না।

কিন্তু, আমারও তো একটা কর্তব্য আছে?

সুজাতা বলেছিল, সে কর্তব্য যদি করতে চাও তো কোনও দিকে না তাকিয়ে নিজেকে গঠন করো। উন্নতি করো জীবনে। আমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে পদক্ষেপ করে তোমার নিজস্ব জীবনকে জটিল করতে চাই না।

জটিল করবে কেন?

ভেবে দেখ।

মুখার্জি বলেছিলেন, ভাববার কী আছে? কত লোকই তো আমাদের দেশে ইয়োরোপীয়ান বিয়ে করেছে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে দেশে।

জানি। অনেক গল্পও পড়েছি, শুনেছি।

তবে?

হেসে বলেছিল, ওই 'তবে'র উত্তর দেওয়া শক্ত। শুধু এটুকু বলব বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি কোরো না। আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অন্য। ঘরের বউ হতে চাই না।

তবে?

হেসে বলেছিল, দেখলে তো! ঘুরে-ফিরে ওই 'তবে'তেই এসে দাঁড়াচ্ছ। কী কাজ অত 'তবে' 'তবে' করে? তোমার তো কোনও দোষ নেই। আমি নিজে চেয়েছিলাম মা হতে না না, কোনও দায়িত্ব তোমার ওপর চাপাব না আমি।

কিন্তু তোমার প্রেম?

বলেছিল, প্রেম আমার জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে থাকবে। ত্যাগ করেই তো ভোগ, তোমাদের দর্শনে বলে না?

না। অত করেও সেদিন টলানো যায় নি সুজাতাকে। বলেছিল, দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে কোরো। আমার জন্য ভেবো না।

সে এক অদ্ভুত বিপর্যয় গিয়েছিল জীবন ও মনের ওপর দিয়ে। এত কথা, এত অনুনয়-বিনয়। তবু এক বিন্দুও টলে নি সুজাতা। বলল, যে দিন থেকে পরের বাড়ি রাঁধুনিগিরি করতে ঢুকেছিলাম, সেদিন থেকেই আমার জীবনেব লক্ষ্য আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম। মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ১৯১৮তে। কিন্তু আজ ১৯৩২ সাল পর্যন্তও ইয়োরোপের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘুচল না। আরও কত দুর্যোগ যে সামনে আসছে, কে জানে!

তোমার-আমার বিয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী?

একটু হেসে বলেছিল, সম্বন্ধ একটা অবশাই আছে, নইলে এ-কথা উঠছে কেন? কিন্তু, থাক ওসব। তুমি একটা রাঁধুনিকে বিয়ে করে দেশে ফিরবে, এও তো কোনও কাজের কথা নয়!

ভালবাসতে পারলাম, আব বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যেতে দোষ?

একটু ম্লান হেসে বলেছিল, ভালবাসার কাহিনী এদেশের তুমি কটা জানো? কত ভালবেসে কত মেয়ের সর্বনাশ করে কত পুরুষ যে কত দিকে গা-ঢাকা দিচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। কে তার প্রতিকার করছে? আর চাইছেই বা কত মেয়ে তার প্রতিকার?

ওর দুটি হাত ধরে মুখার্জি বলেছিলেন, আমাকে কি সেই পুরুষদের একজন মনে করো তুমি?

দুটি কোমল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, একেবারেই না। তুমি ভিন্ন। ভিন্ন না হলে আমাকে পেতে না। আমি সামান্য কাজ করি, আমি গরিব, কিন্তু আমার মনটা আমি জানি। যা করেছি, খেলাচ্ছলে করি নি।

এত কথা বলেছে, এত অনুরাগ জানিয়েছে, তবু শেষ পর্যন্ত সে আসে নি জীবনে।

রুদ্ধ এক অভিমান বুকে নিয়েই একদিন তিনি ভেসে পড়লেন জাহাজে কাজ নিয়ে।

মাস্টার-টিকিট তাঁর দরকার। নইলে, পাইলটিং সার্ভিসে যাওয়া যাবে না।

সাত বছর কেটে গেল। সাত বছর পরে দেশে ফিরে হঠাৎই বিয়ে কবলেন। বেশ বযস তখন। সাঁইত্রিশ। জাহাজ থেকে কত চিঠি লিখেছিলেন গ্লাসগোতে, একটারও উত্তর নেই। অবশেষে ল্যান্ডলেডিকে চিঠি লিখতে সেই বৃদ্ধা সাড়া দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন—তুমি যাবার পরেই রোজি কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কোথায়, তা জানি না।

অর্থাৎ সুজাতা কোথায়, জানা নেই।

সে ছিল না তাঁর জীবনে দীর্ঘদিন। সাঁইত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন—এই আঠেরো বছর কেটে গেল। মিলি এল, গৌতম এল। একদিন মিলিও চলে গেল। কত কী ঘটল ওঠাপড়া—এর মধ্যে সুজাতাকে কি একদিনের জন্যও মনে পড়েছিল? একমুহূর্তের জন্যও?

না। মনে পড়ার মত করে একদিনও মনে পড়ে নি। যেন এক বিচিত্র আর তীব্র

প্রবাহের স্রোতে ভেসে চলেছিলেন এই আঠেরো বছর। কত বন্দর ঘুরলেন—কত জাহাজ আনলেন বন্দরে, কত জাহাজ বিদায় দিলেন। কাজ আর কাজ, আর ক্লাব, আর পার্টি। ছুটিতে ছুটিতে সপরিবারে কলকাতায় যাওয়া। ক্রমে একদিন কলকাতায় জমি কেনা। অবশেষে বাড়ি করা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ক্রমাগত যেন ছুটে চলেছেন তিনি, একবারও থামেন নি।

সন্তানসম্ভবা ছিল রোজি। কিন্তু, তার কোলে যে সন্তান এসেছিল, সে সন্তান যে বেঁচেও আছে, এত বড় হয়েছে,—কোনও সংবাদই সে দেয় নি কোনদিন। কিন্তু কেন দেয় নি? সন্তানেব দায়িত্ব পিতার—এ দায়িত্ব এমন কবে একাই সে বহন করেছে কেন এতদিন? তাকে তার অদেয় তো কিছুই ছিল না! সে কথাও বলেছিলেন মুখার্জি। বলেছিলেন, না হয় দেশে ফিরব না। এখানেই কোনও কাজ নিয়ে ঘর বাঁধব। তুমি রাজী হও সুজাতা।

অদ্ভুত হাসি তার মুখে, বলেছিল, না, তা-ও হয় না। দেশে তোমাকে ফিরতেই হবে।

কিন্তু তাবপর? সে কি পরে বিয়ে করেছিল? এখন সে কী করছে? তার মত মেয়েব পক্ষে এখন কী কবা সম্ভব?

ইস্পাত দিয়ে গড়া যেন এক মেয়ে, যে ভাঙে না, বরং চারপাশের বাধাবিঘ্ন চুবমাব করে নিজের পথ করে নেয়। আর তাঁদেব প্রেম? সেও এক অদ্ভুত, অচিন্তনীয় ঘটনা। যেমন মধুর তার স্মৃতি, তেমনি সংঘাতসঙ্কুল সেই প্রেম।

সে-সূত্রে সেই বিধবা ল্যান্ডলেডি মিসেস পার্কারকে মনে পড়ে। সংস্কারাচ্ছন্ন, বিচিত্র এক জীব। বাংলাদেশের কোনও বর্ধিষ্ণু গ্রামের বালবিধবা এক মুখরা পিসি বা মাসি-জাতীয়া কাউকে যেন লালচে রঙ করে গাউন পবিয়ে সেই সুদূব স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের এক প্রান্তের এক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থূলকায়া প্রৌঢ়া মহিলাটির এক ভাইঝি থাকে লন্ডনে, কোন ছেলেমেয়েদের স্কুলে বুঝি শিক্ষকতা করে। সে ছাড়া মিসেস পার্কাবের আর কেউ নেই ইহজগতে।

এই প্রৌঢ়া নিয়েছিল তাঁকে পেয়িংগেস্ট হিসাবে। তাঁর প্রতি স্নেহ যে না ছিল এমন নয়, আবার গজগজ করতেও ছাড়ত না। কোনও ব্যাপার তার মনোমত না হলেই বলত, এই ব্ল্যাককে নিয়ে হয়েছে এক মহা জ্বালা! মন ভাল থাকলে বলত মুখার্জি। আব মেজাজ বিগড়ে গেলে বলত ব্ল্যাকি।

তার রাঁধুনি ছিল বোজি। রোজি তা শুনে হেসে বলত ব্ল্যাকি ব্ল্যাকি যে করছ, মিস্টাব মুখার্জি কি সত্যিই ব্ল্যাক? আমি তো দেখি রীতিমত ফেয়ার।

এর উত্তরে মুখঝামটা দিয়ে প্রৌঢ়া যা বলত তা আমাদের গ্রাম্য মুখরা মাসি-পিসিদের নিজস্ব ভাষার ঢঙে সাজালে এই দাঁড়ায়—আ মলো যা! তোর অত দরদ কিসের লা ছুঁড়ি! জোয়ান পুরুষমানুষ দেখেছে আর অমনি ঘাড় মটকাবার তালে ছুঁকছুঁক করে বেড়াচ্ছে!

তখনও তেমন অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে নি দুজনের মধ্যে, তাই লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি মিসেস পার্কারের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল রোজি।

সেদিনের মত সরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু বুড়ির ওই অসতর্ক কথাটা যেন তার মনে মধ্যে তীরের মত বিঁধে গিয়েছিল। এক এক ধরনের কথা হয় সংসারে, যা উচ্চারিত হ অত্যন্ত সহজে। কিন্তু যার উদ্দেশে বলা হয়—তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় তা মারাত্মক রোজিরও হয়েছিল তাই। নিদারুণ প্রতিক্রিয়া। সে ভাবত, আমি কি সত্যিই একজনে

বিপথে টেনে নেবার তপস্যা করছি, আমি রাঁধুনির কাজ করি বলে কি বিপথগামিনী মেয়ে? ছি ছি!

কিন্তু, কী হবে আর ভেবে সেই সব পুরনো কথা? প্রৌঢ়া আজও বেঁচে আছে কি না কে জানে! আর সেই রোজি অর্থাৎ সুজাতা? তার কথাও আজ থাক।

সোমা কিন্তু কোনও কথা বলে নি। কিছু জিজ্ঞাসাও করে নি। ওঁদের ইচ্ছামত ট্রেনে উঠে বসল। পরদিন একটা রিজার্ভ-করা প্রথম শ্রেণীর কামরাতে। রওনা হবার দিন নলীও বলে নি আর কিছু, গৌতমও না। সারাটা দিন ধরে ওরা জিনিসপত্র গুছিয়েছে, এটা ওটা করেছে। লাগেজও বহু। সঙ্গে যাচ্ছে বামস্বামী। সে কলকাতা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসবে। অ্যাটেন্ডডেন্ট কামরায় সে থাকবে, দেখাশোনা করবে সে ওঁদের। বহু লোক এসেছিলেন স্টেশনে, সে এক রীতিমত সমারোহ। ট্রেন বেশ লেট ছিল, ছাড়তে-ছাড়তে প্রায় সন্ধ্যা।

জানলার বাইরে মুখ করে বসেছিল সোমা। বাসন্তী রঙের একটা শাড়ি পরেছে সে। এরই মেয়ে, কিন্তু আপন বলে ভাবতে পারছে কি তাঁকে এতক্ষণে?

ব্যাকুল আগ্রহে সে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এ দেশের প্রতিটি লতাপাতাও যেন তার পিপাসিত মন দিয়ে সে গ্রহণ করতে চায়।

কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন, ওর মুখখানা বোধ হয় মিলির মত। এখন ভাল করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে, মত নয়, একেবারে মিলি—হুবহু মিলির মুখখানা। সেইরকম নাক চোখ চিবুক আর কপাল। ওর বয়স পঁচিশ হবে, কিন্তু দেখায় যেন আরও ছোট, আরও কচি।

কলকাতায় বউদিরা মিলিকে দেখে বলত, মেয়ে সুখী হবে। বাপ-মুখী মেয়ে যে!

ওঁর মুখের আদল কি মিলির মত সোমাও পেয়েছে? চোখের তারা দুটি কিন্তু খুব কালো, ভ্রূ দুটিও সুগঠিত। শাড়ি-পরা অবস্থায় ওকে দেখে ভাবা শক্ত যে, ও ইয়োরোপীয়ান মায়ের মেয়ে। এক কেবল গায়ের রঙটা ওর মায়ের মতই ধবধবে ফরসা।

ওর মা সুজাতা এইরকম চব্বিশ-পঁচিশ বছরের তরুণীই ছিল সেদিন। এইরকম তন্বী। যাকে বলে, ব্রুনেৎ। অত্যন্ত সাদাসিধে। রাঁধুনির কাজ করে, কিন্তু ওদিকে কলেজে পড়ে। উচ্চশিক্ষার দিকে ঝোঁক। কিন্তু সেটা কি সহজেই জানতে পেরেছিলেন তিনি?

সকালে চা নিয়ে আসে, ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে, প্রতিদিনই দেখা হয়। আর সুযোগ বুঝে ওর সঙ্গে আবোল-তাবোল গল্প করে কথা ইংরেজিটা অভ্যেস করে নেন মুখার্জি। কত বিষয়ের অবতারণা করেন, মেয়েটি 'হুঁ' 'হাঁ' করে সাড়া দেয়। আর মিসেস পার্কারের সাড়া পেলে ভীরু বালিকার মতই সরে যায়। সাধারণ রাঁধুনি শ্রেণীর মেয়ে, কীই বা ওর জ্ঞানগম্যি! ওর সম্বন্ধে প্রথম প্রথম একটা তাচ্ছিল্যের ভাবই ছিল। তাই যেদিন এক বাসস্টপে দাঁড়িয়ে হঠাৎই লক্ষ্য করলেন ওকে একমনে 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে'র এক বিশেষ সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধ নিমগ্নচিত্তে পড়তে, সেদিন সত্যি সত্যি চমকে গিয়েছিলেন। পরদিন বলেওছিলেন কথাটা। মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বলেছিল, অনাথা মেয়ে। বাপ মহাযুদ্ধের সৈনিক, মারা গেছেন। মা অন্যত্র বিয়ে করে চলে গেছেন। একা একা করি কী? পেট চালাই আর পড়াশুনা করার চেষ্টা করি।

কী পড়ো?

ভারতীয় ভাষা আমার স্পেশাল সাবজেক্ট।

এরও দিন দুয়েক পরে। মুখার্জি বলেছিলেন, তোমার কোনও উপকার করতে পারি রোজি?

মুখ তুলে বলেছিল, পারেন।

কী?

আমাকে বাংলা ভাষা শেখাবেন?

বাংলা ভাষা!

হ্যাঁ।

কেন?

এমনি।

বলে সেদিন আর দাঁড়ায় নি, মুখ ফিরিয়ে চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন। মুখার্জি বলেছিলেন, শেখাব।

এখানে নয়।

তবে?

আমার বাড়িতে। প্রতি সন্ধ্যায়, এক ঘণ্টা করে।

রোজির বাড়ি মানে বস্তি বললেই চলে। অনেক লোক একটা বাড়িতে। যে যার ধান্দায় ব্যস্ত। একটি মাত্র ঘর নিয়ে রোজি থাকে।

রোজির সেই ঘর। কত ছুটির দিন কত গল্প করেই না কেটেছে! ওর এক বান্ধবী ছিল, রোগামতন। কী যেন নাম ছিল? হ্যাঁ, ম্যাগি। সেও আসত মাঝে মাঝে গল্প করতে। একদিন কিসের মাংস নিয়ে এল কিনে। বললে, দু দিনের খাবার হল।

কিসের মাংস ম্যাগি?

একটু হেসে বললে, হেয়ার-পিগ।

হেয়ার-পিগ! হেয়ার-পিগ মানে?

ও চলে যেতে রোজি বললে, শীতের দেশ, মাংস না খেলে চলে না। গরিবেরা খরগোশের মাংস খেতে পায় না, শুয়োরের মাংসও খেতে পায় না, ওরা অল্প-স্বল্প যা খেতে পায়, তা হচ্ছে 'খরগোস-শুয়োর'—হেয়ার-পিগ।

কিন্তু মানেটা কী হল?

বললে, আসলে ওটা কিসের মাংস জানো? বেড়ালের মাংস। কিন্তু তা কি মুখ ফুটে বলা যায়? তাই ওরা নাম দিয়েছে, হেয়ার-পিগ। এইরকম আরও আছে। ঘোড়ার মাংসও খেতে হয়, মুখে বলতে হয়—র‍্যাস্! কী, ঘেন্না পাচ্ছে তো? ঘেন্না, যারা খায় তাদেরও হয়। কিন্তু উপায় নেই। এই শীতে শরীর ঠিক রাখতে হবে তো? অবাক হবেন না, গরিব এদেশেও আছে, এবং তাদের অবস্থাও কম শোচনীয় নয়।

একদিন নয়, দিনের পর দিন ধরে রোজিকে আবিষ্কার করেছিলেন মুখার্জি। চিঠি লিখে লিখে দেশ থেকে বাংলা বই আনিয়েছিলেন, আর কী আগ্রহে সেসব যে সে পড়বার চেষ্টা করত তা বলবার নয়। তার তখনকার প্রিয় বই ছিল,—বিশ্বকবির 'গীতাঞ্জলি', বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক', আর জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত'। বার বার বই তিনটি পড়ত আর অর্থ বোঝবার চেষ্টা করত। তাঁকে এক-একদিন বলত, আমি যেন নবজন্ম লাভ করেছি।

কী রকম?

বলত, কী মনে হয় জানেন? যাকে আমরা সচরাচর 'দেশ' বলি, সে-রকম 'দেশ'টা বড় কথা নয়। আমাদের আসল দেশটা মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী। মনের মধ্যে তার নিজস্ব রূপ নিয়ে এক-একজনের গড়ে উঠে এক-একটা দেশ। আমি যেন সেই দেশের সন্ধান পেয়েছি।

উনি বলতেন, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তোমার অত কথা আমি বুঝব না। আমি বুঝেছি অন্য এক কথা।

কী?

সোজাসুজি বলতে পারেন নি কথাটা। রোজি কিন্তু বুদ্ধিমতী, ওঁর মন বুঝতে তার দেরি হয় নি সেদিন মোটেই। নতমুখে, গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল, মিসেস পার্কারের সন্দেহই বুঝি সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি,—আমি ল্যান্ডলেডির ভাষায় তোমার 'ঘাড় মটকাতে' চাইনি, আমি যা করেছি তা অন্তরের তাগিদে। আমার মন বহুদিন থেকেই তোমাকে চেয়েছে। নিজেকে লক্ষ্য করে নিজেই সেদিন অবাক হয়ে গেছি। তারপর মনে মনে বলেছি—আরও জানতে হবে তোমাকে। তোমাকে জানতে হলে তোমার দেশকে জানা দরকার, তোমাব ভাষাও জানা দরকার। জানতে গিয়ে আজ আমার মন ভরপুর হয়ে গেছে।

বলতে বলতে চোখে ওর জল এসে গিয়েছিল।

সেদিন সর্বপ্রথম ওর হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন মুখার্জি, কিছু বলেন নি। সেও বাধা দেয় নি।

এর অনেক পরে, যেদিন প্রথম উনি ওর নাম দিয়েছিলেন—সুজাতা, সেদিনও ওই রকম চোখের জলের মধ্য দিয়ে ও তাকে বলেছিল, নিজের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছিলাম, কিন্তু জিততে পারি না। প্রেম এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি, এ যখন আসে ঝড়ের মত আসে, বন্যার মত আসে, একে কোনো বুদ্ধি দিয়ে, কোনো সংস্কার দিয়েই বুঝি প্রতিরোধ করা যায় না।

॥ ৩ ॥

কী-এক বড় স্টেশনে এসে গাড়ি থামল এবার। চমক ভাঙল রামস্বামীর কণ্ঠস্বরে : খানা রেডি সাব।

নিশ্চুপে দুজনে বসে রাতের খাওয়াও শেষ করলেন, রামস্বামী বাসন-কোসন নিয়ে চলে গেল। ট্রেনও ছেড়ে দিল। মুখার্জি বললেন, এইবার শুয়ে পড়ো, কেমন?

মুখ তুলে ওব দিকে তাকাল সোমা, তারপরে একটু অনুনয়ের সুরেই বললে, আর-একটু দেখি।

সস্নেহে বললেন, দেখতে ভাল লাগছে বুঝি খুব?

মাথা নেড়ে মেয়ে জানাল, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পরে।

শোনো।

সোমা চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল ওঁর দিকে।

তোমার মা এখন যেন কোথায় বলেছিলে?

লন্ডনে।

কী করছে?

ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল খুলেছেন।

তুমি চিঠি দাও নি?

কলকাতায় পৌঁছে তারপরে দেবো।

ও।

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণের জন্য।

শোনো। তোমার মায়ের ঠিকানাটা—না থাক, তুমি চিঠিতে লিখে দিয়ো আমার কথা লিখো, আমি ভাল আছি।

মাথাটা কাত করে মেয়ে জানাল, আচ্ছা।

মুখার্জি বললেন, তুমি যে আজ কলকাতায় যাবে, ভাবতে পেরেছিলে?

মৃদুকণ্ঠে মেয়ে বললে, হ্যাঁ। কলকাতায় আমায় যেতে হতই।

একটু আশ্চর্য হয়েই বলে উঠলেন মুখার্জি, আমি যে রিটায়ার করছি, তোমরা জানতে না।

তবে কলকাতা যাবার কথা ভাবতে কেমন করে?

মেয়ে মুখ তুলে ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামাল, বললে, একটা থাকার জায়গা তো আমাকে ঠিক করতে হবেই। ইন্ডিয়া হাউসে আমার অনেক জানাশোনা ছিল। একজনের চিঠি এনেছি কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুকে দেবার জন্যে। তিনি একটা জায়গা ঠিক করে দেবেন।

কার চিঠি? কিন্তু, সেকথা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। স্থাণুর মত নিশ্চল নিথর বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপরে বললেন মুখার্জি, তুমি ভাইজাগ পোর্টে নামলে, সে কি মাত্র আমাকে দেখবার জন্য?

হ্যাঁ। আর মায়ের ওই চিঠিটা—

ও।

আর কিছু বললেন না তিনি। বলতে পারলেন না। কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব-কিছু। কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে সব-কিছু। জোর করে দুটি চোখ বুজে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন তাঁর বার্থটার দেয়ালে। তাও তো বটে। ও থাকতে আসে নি তাঁর কাছে। ও যেন অন্য জগতের অন্য এক মেয়ে। ও তাঁর মিলি নয়। ও নয় সেই ফুটফুটে কিশোরী মেয়েটি, যে তার শাড়ির আঁচলটা সামলাতে সামলাতে ছুটে এসেছিল তাঁর কাছে, গলাটা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

চোখের কোণদুটি বুঝি ভিজে উঠেছে। প্রাণপণে চোখ দুটি বুজে রইলেন তিনি, চোখ ছাপিয়ে জলবিন্দু যেন না গড়িয়ে পড়ে!

তা হলে সত্যি? সত্যিই তাঁর কাছে থাকতে আসে নি মেয়ে? ওর মায়ের চিঠিটা মনে পড়ল : তোমার সংসারে ও অশান্তির ঝড় তুলতে চায় না।

কিন্তু এ যদি তিনি না হতে দেন? যদি তিনি বলেন, তোমাকে যেতে দেব না, আমার কাছেই থাকবে তুমি? মেয়ে কি তার কথা রাখবে?

যদি না রাখে! কারুর ওপর কোনদিন জোর করেন নি তিনি। সেই পঁচিশ বছর আগে সুজাতা যেদিন তাঁর কোনও কথা কোনও অনুনয়ই শুনল না, সেদিন থেকেই তাঁর মন তাঁর অজ্ঞাতসারে অন্যপথ ধরেছে। কোনও কিছুর ওপর কোনও দাবি করা, কারুর ওপর

কোনও জোর করা, জিদ ধরে কোন-কিছু করতে যাওয়া—মনের এই স্বাভাবিক স্রোতোধারা কোন্ নিষ্করুণ মরুপথে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একদিন বুঝি শুকিয়ে গেছে!

গ্লাসগোর পর জাহাজের চাকরি। সাত বছর সে চাকরির পর পাইলটিং সার্ভিসে যোগ দিয়ে দেশে ফিরলেন, বয়স তখন তাঁর সাঁইত্রিশ। বাবা তখন বেঁচে। বললেন, বিয়ে করো।

মা নেই। দাদাদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত অচিরেই তার বিয়ে দিয়ে দিলেন বাবা, মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারেন নি তিনি, কোনও প্রতিবাদও করেন নি। বড়দা পণ্ডিত মানুষ, সারা জীবন সরকারী কলেজের অধ্যাপনা করে অবশেষে গিরিডিতে বাসা করে বৃদ্ধবয়সে অবসর যাপন করছেন। দুটি তাঁর ছেলে। দুটিই কৃতী, সরকারী চাকুরে, দিল্লির বাসিন্দা। একটি মেয়ে তাঁর, তাঁরও খুব ভাল বিয়ে হয়েছে কলকাতাতেই কোথায় যেন। বড়দা অবশ্য পড়ানোর কাজ থেকে অবসর নিলেও কাজ ওঁকে ছাড়েনি, বাড়ি বসে আজও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। কত কী পড়েন, কত কী লেখাপড়া করেন। বুদ্ধদেব আর বৌদ্ধধর্ম নিয়ে তাঁর তো বিরাট এক গবেষণা-গ্রন্থ রয়েছে। একবার ছুটিতে গিরিডিতে গিয়েছিলেন মুখার্জি। বড়দা বললেন, সুধীর, তুই এক কাজ কর। পালি পড়। প্রাচীন এক পালিগ্রন্থে সেকালের নেভিগেশন সম্পর্কে অনেক খবরাখবর আছে। তোর পড়তে খুব ইনটারেস্টিং লাগবে।

আর একবার ভাইজাগে। গৌতম সবে কোলে এসেছে ওর মায়ের। বড়দা সংবাদ পেয়ে কী খেয়ালে একেবারে টেলিগ্রামই পাঠিয়ে বসলেন, 'সুধীর, তোর ছেলেটির নাম রাখলাম—গৌতম।'

সেই থেকে ওর নাম গৌতমই রয়ে গেল। নেলী ও নেলীর মার অজস্র খুঁতখুঁতনিতেও সে নাম মুছে গেল না। বড়দার ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে ততটা নয়, যতটা ওঁর দুই ছেলের সরকারী পদমর্যাদার জোরে। মিসেস বাটাসারিয়া অর্থাৎ নেলীর মা নিজে দিল্লির বাসিন্দা হয়ে তা পরিহার করেন কী করে?

মেজদা কিন্তু সাহেব মানুষ। ঠিক বাবার মত হয়েছে মেজদা। রায়বাহাদুর বাপের উপযুক্ত ছেলে। দীর্ঘদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে অর্থ-দপ্তরের কোনও উচ্চপদে বসে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজকার্য চালিয়ে আজ অবসরপ্রাপ্তির পরও কোন বিরাট ফার্মের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, না কী হয়েছেন যেন! মেজদার ছেলে নেই, দুটি মেয়ে। চারটি বুঝি হয়েছিল, মাঝের দুটি নেই। বড় আর ছোট। বড়টির বিয়ে হয়েছে খুবই ভাল। জামাইটি অবস্থাপন্ন, সরকারী বড় অফিসার—কলকাতাতেই। ছোটটি সুমনা, সোমারই বয়সী, কিংবা দু-এক বছরের ছোট হবে হয়ত, পড়াশুনো শেষ করেছে, এখনও বিয়ে হয়নি।

কলকাতায় পৌঁছে কোনরকমে বাড়ির একটু বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়েই মুখার্জি ছুটলেন মেজদার বাড়ি সেই ওল্ড বালিগঞ্জে, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সুমনাকে। বললেন, আয়, তোকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

বাড়িটা কিন্তু পুরো তৈরি হয় নি, কোথাও-কোথাও মিস্ত্রিরা তখনও কাজ করছে আলিপুরের একেবারে এক প্রান্তে। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা ক্যানেল, ক্যানেলের পরই সারি সারি রেল লাইন, কলকাতা-বজবজের গাড়ি যায় আসে, তার ওপারে আবার সব বাড়ি, নতুন-নতুন নানান ফ্যাশানের। অনেক হয়েছে, আরও হচ্ছে। ওটাও নাকি আলিপুর। নিউ আলিপুর।

প্রথম পরিচয়ের সমস্ত জড়তা কেটে যাবার পর, জাহাজের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ডেকের মত দোতলার যে বারান্দাটা, সেইখানে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সোমা প্রশ্ন করল সুমনাকে, নিউ আলিপুর কেন? 'নতুন আলিপুর'ও তো নাম দিতে পারত?

সুমনা হেসে বললে, ইংরেজী-বাংলায় মিশিয়ে নাম হয়েছে বলে আপত্তি করছ? নিজে ইংরেজী-বাংলায় মেশানো মানুষটি হয়েও?

কিসের লজ্জায় উচ্ছ্বাসে যেন টকটকে লাল হয়ে উঠল সোমার মুখখানা।

সুমনা বললে, তোমার সঙ্গে আমার খুব ভাব রইল, বুঝলে? আশ্চর্য সুন্দর মানুষ কিন্তু তুমি। রাস্তায় হাঁটতে বেরুলে, লোকজনদের পথচলা বন্ধ হয়ে যাবে।

কেন!

তারা তোমায় দেখবে, না হাঁটবে?

আরও লজ্জা পেয়ে মুখখানা নিচু করল সোমা। তারপরে একসময় মৃদুকণ্ঠে বললে, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

মাত্র একটা? একশোটা নয়?

হেসে ফেলল সোমা। তারপরে বললে, শোনো, একটা ঠিকানা বলতে পারো? ত্রিভোলি পার্ক। বালিগঞ্জ সারকুলার রোড। কোন্‌দিকে হবে সেটা?

সুমনা বললে, মার কাছে মাসির গল্প করছ যে! ও তো আমাদের বাড়ির কাছেই! কত নম্বর ফ্ল্যাট বলো তো?

সে আমার কাছে লেখা আছে।

পাশের দরজার কাছে ওদের গলা শুনেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন মুখার্জি, ওদের অলক্ষ্যে ওদের সব কথা না শুনেও পারেন নি, কিন্তু আর পারলেন না শুনতে, দ্রুতপায়ে চুপি চুপি সরে এলেন ওদের কাছ থেকে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। নব-নিযুক্ত বাবুর্চি-বেয়ারা আর আয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘোরাঘুরি করছে, রাজমিস্ত্রি-মজুররা আজকের মত চলে গেছে। পাশের বাড়ির মিস্টার সিনা, অ্যাডভোকেট এবং তাঁর বন্ধু, যিনি তাঁর এখানকার এই জমিটুকু কেনার মূলে ছিলেন, যিনি ঝি-চাকর ঠিক করা থেকে যাবতীয় কাজ নিজে থেকে করে রেখেছিলেন, তিনি এসে দেখা করে আবার চলেও গেলেন। ধীরে ধীরে সব অন্ধকার হয়ে গেল, কাছের সেই রাস্তার ধারের প্রকাণ্ড শিরীষগাছে কুলায় ফিরে আসা পাখিদের কলরবও হয়ে গেল শান্ত। তাঁর বাড়ির ডানদিকে রাস্তাটা বাড়ির পিছন থেকে শুরু করে পাশ দিয়ে দিয়ে সামনে এসে ক্যানেলটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর পথ না পেয়ে দুটি বাহু বিস্তার করেছে দুই দিকে, ডানদিকে মিস্টার সিনার বাড়ি ছুঁয়ে অগ্রসর হয়ে গেছে। আর বাম বাহুটি তাঁর বাড়ির গেট পেরিয়ে বাড়ির এলাকা পর্যন্ত গেছে, আর রাস্তা নেই। তাঁর বাড়ি ওই এলাকার একেবারে ও-প্রান্তে বলা চলে। তাঁর বাড়ির বাঁ পাশটি অন্য কোনও অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, অন্য গলিপথ দিয়ে ঘুরে-টুরে যেতে হয় সম্ভবত। ভাল দেখা হয় নি, একতলা একটা ব্যারাকের মত পুরানো বাড়ি চোখে পড়ে, আর সব টিনের বাড়ি, ঘেঁষাঘেঁষি। ওইসব অঞ্চল থেকে উত্থিত নানান সুরের কোলাহল শোনা যায় মাঝে মাঝে। এখন এই মুহূর্তেও শোনা যাচ্ছে। ঠিক কী কী ধরনের লোকজন থাকে ওখানে কে জানে, সিনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

কাকু!

নিজের চিন্তার আচ্ছন্নতা থেকে হঠাৎই যেন জেগে উঠলেন। দেখলেন, তাঁর ঘরে, তাঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুমনা আর সোমা।

সস্নেহে বললেন, আয়, ভিতরে আয়।

এল ওরা। সুমনা বললে, কাকু, আমি সোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কোথায়?

কোথায় আবার? সুমনা বললে, আমাদের বাড়িতে।

কেন!

সুমনা হাসল, কেন কী? মেয়েকে ছেড়ে থাকতে মন চায় না বুঝি? না না, কোনও কথা শুনব না। ও আমার কাছে গিয়ে থাকবে। এখানে কাকিমা নেই, কেউ নেই, তুমি তো থাকবে তোমার বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ও বেচারা একা একা এখানে করবে কী? আমার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে।

মুখ তুলে সোজা তাকালেন ওদের দিকে, তারপরে বললেন, তাব চেয়ে তুই এখানে এসে থাক না।

তা কি হয় নাকি? সুমনা বললে, মার অসুবিধা হবে না! আজকাল ঘরের কত কাজ করি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে, তা জানো?

বলেই ওঁর আরও কাছে সরে এসে সুর নামিয়ে বললে, বেশিদিন নয় কাকু। মাত্র তিন দিন। তিন দিন পরে তোমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তুমি কিন্তু রোজই যাবে আমাদের বাড়ি। রোজই খাবে।

হেসে ফেললেন মুখার্জি, তারপরে বললেন, আচ্ছা, যা। সোমার মত আছে তো? কী বলো সোমা?

সোমা অল্প একটু হেসে মাথা নিচু করল। সুমনা বললে, তা ছাড়া, তোমার বাড়ি-টাড়ি এর মধ্যে গুছিয়ে তোলো, ও নতুন এসেছে, ওর অসুবিধাও তো হতে পারে। কী বলো?

তা বটে।

তা হলে ওকে নিয়ে যাই! ওর সুটকেস এখানেই রইল।

ওর কাপড়-চোপড়?

সুমনা মুখ ঘুরিয়ে বলল, সে সব তোমায় ভাবতে হবে না। বাপের মত মেয়েও ঠিক ওই কথা বলছিল। ঠিক যেন পরের বাড়ি যাচ্ছে! সেখানে যেন কিছু পাওয়া যায় না। সেখানে যেন কিছু নেই।

তারপরে সোমার দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলে উঠল, দাঁড়াও না, মার কাছে গিয়ে আগে মীমাংসা হোক—কে বড়—আমি, না, তুমি। তারপরে দেখা যাবে, শাসন কাকে বলে?

বেশ লাগছিল ওর এই অন্তরঙ্গ কথা বলার সুর। একটু হেসে মুখার্জি বললেন, ওই বড় হবে বোধ হয়।

ইস, ঠোঁট উলটে সুমনা বললে, এই যে দাঁড়িয়েছি। কাকে বড় দেখায় বলো তো? আমাকেই। তুমি দেখো আমাকেই ওর দিদি বলতে হবে। চলি তা হলে?

দাঁড়া, ট্যাকসি আনিয়ে দিই।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সোমা সত্যিই চলে গেল সুমনার সঙ্গে। তিন দিন থাকবে। তা থাকুক তিন দিন ওখানে। একদিক থেকে বড় নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে। সুমনার

কথায় যা বোঝা গেল, সোমা যে চলে যাবে, তার বাবার কাছে সে যে থাকবে না, সে কথাটা সুমনাকে সে জানায় নি। বুদ্ধিমতীই মনে হচ্ছে ওকে। কিন্তু তিন দিন পরে ফিরে এসে, যদি দু-একদিন পরেই সে চলে যেতে চায়? কী হবে তা হলে?

কী আবার হবে! কারুর কিছু হবে না। রোজ যেমন সূর্য ওঠে তেমনি উঠবে, দিন হবে, বাত আসবে। শুধু, নিজের মনটাকে শক্ত করতে হবে। সত্যিই তো, যা অপ্রতিরোধ্য, তাকে ঠেকানো যায় কি? কখনও যায় নি, আজও যাবে না। যা ঘটবার ঠিক তা ঘটবে।

রামস্বামী বোধ হয় চা নিয়ে এসে দাঁড়াল। তাঁর অভ্যস্ত দ্বিতীয়বারের চা।

রামস্বামী!

জী সাব?

তুই তো কালই চলে যাচ্ছিস, না?

জী।

যা চলে। মাকে বলিস, আমরা ভালই আছি।

সন্ধ্যা পেরিয়ে বাত এল। কিন্তু রাতটা যেন আর কাটতে চায় না। কত কী টুকিটাকি কাজ করার ছিল, কিছুই করতে ইচ্ছা করছে না। সিনা আবার এসে কিছুক্ষণ গল্প করে গেল, সঙ্গে ওর স্ত্রীও ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই যেন মনঃসংযোগ করতে পারছেন না তিনি। ওদের কথার পিঠে 'হুঁ' 'হাঁ' করে গেছেন শুধু। সিনা বললে, তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম করো।

মিসেস সিনা বললেন, কোনও অসুবিধা হলে বলবেন।

চলে গেল ওরা। সিনা তার ছেলেবেলাকার বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী। দেখাসাক্ষাৎ বহুদিন ছিল না, চিঠিপত্রে কিন্তু নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গেছে সে। তাঁর জন্য জমি কিনে রাখা, তারপর সুযোগ বুঝে একদিন বাড়ির প্ল্যান অনুমোদন করিয়ে নেওয়া, ক্রমশ ঠিকাদার রেখে বাড়ির কাজ শুরু করে দেওয়া। এমন বন্ধু সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু একেও তো কোনদিন মুখ ফুটে বলতে পারেন নি সুজাতার কথা। আজ ওরা এটুকু জেনেছে, সোমা তারই মেয়ে। অথচ কোন্ মায়ের মেয়ে, সে কথা ওরা জিজ্ঞাসা করছে না। এমন কি, সুমনাকে বলে ফেলা সত্ত্বেও সে আর কিছু প্রশ্ন করল না। এ যেন তার কাছে কোনও বিশেষ ঘটনাই নয়।

অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা এ। তার চেয়ে ওরা প্রশ্ন করুক, চারিদিক থেকে এসে তীব্রকণ্ঠে ওরা কোলাহল তুলুক, হিংস্র ভঙ্গিমায় দাবি জানাক, কেন তুমি জানাও নি এ খবর? কেন অমন করে ফেলে রেখে এসেছিলে সুজাতাকে?

কেন---কেন—কেন!

বড় একা—বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে আজ। কত রাত এখন কে জানে! খাওয়া-দাওয়া করে বাবুর্চি-বেয়ারা-রামস্বামীও শুয়ে পড়েছে বহুক্ষণ। নীরব, নিশুতি হয়ে গেছে চারিদিক। পাশের সেই বস্তি-মতন ঘরগুলি থেকেও কোন কলরব শোনা যাচ্ছে না, একটিমাত্র কণ্ঠস্বরও নয়।

ঢেউ—ঢেউ আর ঢেউ! ঝড় উঠেছে সমুদ্রে। সেই বিক্ষুব্ধ আর উত্তাল তরঙ্গ পার হয়ে তার ক্ষুদ্র পাইলট-বোটটি চলেছে, সেইরকম বসে আছেন তিনি চেয়ারটিতে, তেমনি রামলু সারেং হুইল ঘোরাচ্ছে। কিন্তু কোথায় জাহাজ? কাকে হাত ধরে বন্দরে নিয়ে যাবার জন্য তিনি বার হয়েছেন! কেউ নেই—কিছু নেই—দিক্‌চক্রবালে একটি বিন্দুও দৃশ্যমান হচ্ছে না, সমস্ত দিগন্ত জুড়ে নিঃসীম শূন্যতা।

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানায়। ইস! বেলা হয়ে গেছে বেশ! কিন্তু এ কী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি! ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে-দেওয়া। বেয়ারা এসে বোধ হয় জানলাগুলোর পর্দা সরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, একমাত্র তার শিয়রেরটা ছাড়া। আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন-রং-করা মেঝের ওপর। নতুন তো সবই, এই ঘরের চারটে দেয়ালই নতুন। পাশের বস্তি-মতন বাড়িটা থেকে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। খুব স্পষ্ট নয়। একটা কথাও বোঝা যায় না।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ঘরে ঢুকতেই চোখ পড়ল টিপয়ের ওপর। চা-জলখাবারের ট্রে-টা নামানো, আর তার একটু দূরে জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রামস্বামী নয়, নতুন বেয়ারাও নয়, আয়াটিও নয়, কে ও?

মুখ ফেরাল সে।

অতর্কিত বিস্ময়ে মুহূর্তকালের জন্য নির্বাক হয়ে গেলেন মুখার্জি, তারপরে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, সোমা!

হ্যাঁ।

ওখান থেকে চলে এলে যে?

জানলার কাছ থেকে সরে এল সোমা, মুখখানা নিচু করে ট্রের দিকে হাত বাড়াল, বোধ হয় নিজের হাতে চা তৈরি করে দিতে চায়। ধীরকণ্ঠে বললে, আপনি বসুন।

বসলেন মুখার্জি। বললেন, ওখানে তোমার কোনও কষ্ট হয়নি তো?

না বাবা। তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে, জ্যেঠামশাই কত খুশি হলেন, জ্যেঠাইমা কত আদর করলেন, আর তা ছাড়া সুমনার তো কথাই নেই। ভারি সুন্দর মেয়ে!

ভাল করে চেয়ে দেখলেন, দামী গোলাপী রঙের একটা শাড়ি পরনে, হাত আর নিরাভরণ নয়, দুগাছা করে চুড়ি পরা, গলায় ওর নিজের সেই সরু হারের ওপর একটা নেকলেস ঝলমল করছে!

ওঁর দিকে চা এগিয়ে দিয়ে সোমা বললে, সুমনা নিজেরগুলো সব পরিয়ে দিয়েছে আমাকে।

চমৎকার লাগছে ওকে, সুমনার কথা শুনে ওর প্রতিও অদ্ভুত এক স্নেহ অনুভব করতে লাগলেন তিনি। নেলী মা হয়ে যা করে নি, সুমনা অবলীলায় তাই করেছে। অবশ্য এসব গহনা তো ফেরত দিতে হবেই। তার ওপরে যখনই সোমাকে তিনি কিনে দেবেন গয়নাপত্র, সুমনাকেও দেবেন, তার কাকুর স্নেহ-উপহার। কখনও তো দেন নি ওদের তেমন কিছু।

কোথায় সে? সুমনা?

ওঁর মুখের দিকে তাকাল সোমা, সুমনা? আর দাঁড়াল না, আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল। আপনি তখনও ওঠেন নি।

ও। তুমি বসো। চা খাবে না?

ওঁর সামনের চেয়ারটাতে বসল সোমা। মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি অনেক খেয়ে এসেছি বাবা। সেই অত ভোরে উঠে জ্যেঠাইমা কত কী খাবার আনিয়ে নিজের হাতে যত্ন করে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন।

মুখার্জি বলে উঠলেন, এত যত্ন পেয়েছ, তবু চলে এলে কেন?

কী যেন বলতে গিয়ে চোখ দুটি ছলছল করে এল সোমার, নিরুত্তরে মুখখানা নিচু করল সে।

সোমা, একটা সত্যি কথা বলবে?

একটু আশ্চর্য বোধ করেই মুখখানা তুলল। চোখে তার সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

মুখার্জি বললেন, তোমার মায়ের কথা উল্লেখ করে ওরা কি কিছু বলেছে?

না বাবা, না। সোমা বলে উঠল, মার কথা একেবারেই জিজ্ঞাসা করেন নি ওঁরা কেউ।

তবে?

বুদ্ধিমতী মেয়ে বোধ হয় বুঝতে পারছে প্রশ্নের তাৎপর্যটা. কিন্তু কিছু বলল না. আগের মত তেমনই বসে রইল নতমুখে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল সুকঠিন নীরবতার মধ্য দিয়ে। কী একটা সন্দেহ করে উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, মেয়ের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওর চিবুকে হাত দিয়ে জোর করে উঁচু করে ধরলেন মুখখানা, এ কী, কাঁদছ তুমি!

মুখটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে, তারপর একটু বোধ হয় নিজের আবেগটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল সোমা। তাবপরে বললে, এই একটা মাস এখানে থাকব বাবা?

মানে?

ততক্ষণে আরও একটু সহজ হয়ে এসেছে সে, বললে, মা তো এখানে আসবেন মাসখানেক পরে, না?

কার মা?

একটু যেন বিব্রত বোধ করল সোমা, তাবপরে একটু ইতস্তত কবে বললে, আমার মা। আমার এখানকার মা।

কথাটার প্রতিধ্বনি করে উঠলেন মুখার্জি সঙ্গে সঙ্গে, হ্যাঁ, তোমার এখানকার মা!

তারপরে, পায়চারি করতে করতে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলাটার কাছে। একটুক্ষণ পরে আবার ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে, বসলেন। বললেন, তিনি আসবেন মাসখানেক পরেই বটে। কিন্তু তুমি ওসব কী ভাবছ?

দুটি বড় বড় চোখ তুলে বড় করুণ দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকাল মেয়ে, তারপরে বলে উঠল, সুমনা নিয়ে গেল। কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না বাবা।

বলতে বলতে আবার তার অভ্যাসমত মুখখানা নিচু করল সে। কথা বলল। গলা তার কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে, বললে, মনে হচ্ছিল, ওরা যা ভাবে ভাবুক, আমি এখ্খুনি ছুটে চলে আসি এখানে।

হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত তাড়াতাড়ি চেপে ধরলেন মুখার্জি, বললেন, তবু তুমি বলছ তুমি এখানে থাকবে মাত্র একটি মাস! আমি তোমার অপরাধী বাবা, কিন্তু ক্ষমাও তো মানুষে করে। দয়াও তো মানুষের ধর্ম।

আপনি অমন করে বলবেন না বাবা।

উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাটা বলে ফেলে আর দাঁড়াতে পারল না। মেয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

চলে গেল রামস্বামী। রাজমিস্ত্রিরা কাজে এসে লাগল। আউটহাউসগুলোই বাকি, আর বাকি বাড়ির চারধারের দেয়ালের কিছু অংশ। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখাই ঠিক করলেন মুখার্জি, চুপচাপ বসে থেকে কী লাভ!

তারপরে, বিকেল হতে না হতেই একটা ট্যাকসি ডেকে বেরিয়ে পড়লেন মুখার্জি সোমাকে নিয়ে। প্রথমে মেজদার বাড়ি। সুমনাকে তুলে নেওয়া। তারপরে গহনার দোকান। সেখান থেকে বাড়ি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সুমনা বললে, আমায় ফিরতে হবে যে তাড়াতাড়ি!

মুখার্জি সস্নেহে বললেন, দুই বোনে তোদের গয়নাগাঁটি সব পরে আয় দেখি।

তুমি কি সত্যিই আমাকে অত গয়না দিলে নাকি কাকু?

হ্যাঁ রে। তোর আর ওর। দুজনের দুই সেট।

একটু পরেই এল দুজনে ওরা সাজসজ্জা করে। এসে প্রণাম করল। সুমনা বললে, এসব পরে একা আমি ফিরতে পারব না কিন্তু।

চল, আমি নিজেই তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। সোমা একটু একলা থাক।

তা হলেই হয়েছে!

কী হয়েছে?

সুমনা বললে, তুমি নেই, ও কেঁদে ফেলবে। আমাদের বাড়ি গিয়ে কাল লুকিয়ে লুকিয়ে সে কী কান্না! তোমাকে ছেড়ে ও থাকতে পারবে না।

মুখখানি ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে সোমার। লাল বেনারসী পরেছে, আর পরেছে চারগাছা করে চুড়ি, গলায় দামী হার। অপরূপ দেখাচ্ছিল ওকে।

এগিয়ে গিয়ে ওর হাতটা ধরলেন তাড়াতাড়ি মুখার্জি, বললেন, চল, আমরা দুজনে মিলেই ওকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসি।

সুমনা বললে, সেই ভাল।

পরদিন বহু কাজের ভিড়। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার-এর ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু কাজ। সঙ্গে যে টাকা এনেছিলেন, সে তো প্রায় সবই গেল গয়নাগাঁটি কেনার ব্যাপারে। ভগবৎকৃপায় জীবনে আয় করেছেন প্রচুর, এবং খানিকটা হিসেব করে চলবার চেষ্টা করেছেন বলে সমগ্র অবসর-জীবনকালটা, আর যাই হোক, প্রচণ্ড অভাবের মধ্য দিয়ে কাটবে না। ইন্সিওরেন্স, বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, এসবও আছে। কিন্তু আপাতত সংসার পরিচালনার কী হবে? দ্বিতীয়ত, মেয়ে এল। ওর ভবিষ্যতও ভাবতে হবে। তবে কি মেজদার মত কোন প্রাইভেট ফার্মে তাঁকে চাকরি নিতে হবে নাকি? এইসব নানান চিন্তা, আর নানান ছুটোছুটির মধ্য দিয়ে কেমন করে যে কোথা দিয়ে সারাটা দিন কেটে গেল, তা টেরও পেলেন না। যখন অবসর পেলেন, তখন ক্লান্তিতে সারাটা শরীর ভরে গেছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সোমা, তাঁকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল। এ-ও এক নতুন স্বাদ। ওর হাসি-হাসি মুখখানা দেখে সব ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। কিন্তু তখন অনেক বিস্ময় প্রত্যক্ষ করা বাকি। নিজের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন মুখার্জি। এমন চমৎকার করে সাজাল কে ঘরখানা? এমন রুচিসম্মতভাবে? স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করানো—কাচের ঢাকায় রাখা সেই উপহার পাওয়া রুপোর টাগটাই তাঁর মনটাকে খুশিতে ভরিয়ে দিল সব থেকে বেশি।

বাঃ! এত কাজের মেয়ে তুমি!—লজ্জায় মুখ নিচু করল মেয়ে।

কিন্তু তুমি এখনই এত খাটতে গেলে কেন? কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে—

তাড়াতাড়ি বলে উঠল সোমা, আমি আর খাটলাম কোথায় বাবা? আয়া আর বেয়ারাই সব করেছে।

সে তো বোঝাই যায়। মুখার্জি বললেন, চলো দেখি, নিজের ঘরখানা কেমন গুছিয়েছ।

একেবারে পিছনের কোনাব ঘরখানা বেছে নিয়েছে ও। জানলায় দরজায় সাধারণ পর্দা। ঘরে একটা খাট আর বিছানা। আর একটা টেবিল আর চেয়ার।

কোনও সমারোহ নেই, কোনও উজ্জ্বলতা নেই।

মেয়ে বললে, আসুন বাবা, মায়ের ঘরটা দেখুন, আর গৌতমের ঘরটা।

আগের বারে যখন ছুটিতে এসেছিলেন, তখনই আসবাবপত্র পছন্দ করে কেনাব বাবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সিনা সবই আনিয়ে রেখেছিল যথাসময়ে।

ঘুবে ঘুরে সব-কিছু দেখে তারপব নিজেব ঘরে এসে বসলেন।

বাড়ল বাত। খাওয়া-দাওয়াও একসময় হযে গেল।

বাবা!

কিছু বলবে সোমা?

হ্যাঁ। কাল একবাব সুমনাব কাছে যাব?

কেন? কোনও দবকার আছে? না, এমনিই দেখা করতে চাও?

সোমা একটুক্ষণ থেমে তাবপর বললে, দরকার আছে বাবা। আমি তো কলকাতাব কিছু চিনি না। ওকে নিয়ে একটু বেরুব।

বলতে গেলেন, শহর ঘুরতে চাও, সঙ্গে সুমনা কেন, আমিই তো আছি। আমিই না হয় বেরুব তোমাকে নিয়ে। কিন্তু কেন যেন মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, বেশ।

সোমা তখনি অবশ্য উঠে পড়ল না, বসে রইল আরও কিছুক্ষণ।

বাবা!

কী মা?

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবেই সোমা বললে, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। আপনার কাছে রেখে দেবেন বাবা?

টাকা, না, পাউন্ড?

না। টাকাই। এখান থেকেই স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ওপরে ড্রাফ্‌ট করে এনেছি। আপনার অ্যাকাউন্টে কবে নেবেন?

তা কেন? তুমি নিজের নামে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারো।

না না। আমি টাকা নিয়ে কী করব?

সস্নেহে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন মুখার্জি। তারপব বললেন, সে কথা পবে হবে। আগে বলো তো কত টাকা?

খুব সামান্য। একেবারে কিছুই নয়।

তবু?

ছ হাজার।

কিন্তু কোথায় পেলে এ টাকা? মা দিয়েছে?

না।

তবে?

সোমা মুখ নিচু করে বললে, আমি যে চাকরি করতাম বাবা। ইন্ডিয়া হাউসে।

চাকরি করতে! মুখার্জি কথাটা বলে চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপরে বললেন, ড্রাফ্‌ট ভাঙিয়ে তোমার নামেই অ্যাকাউন্ট খুলে দেব। যাও, আজ রাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড়ো গিয়ে।

পরদিন।

গিয়েছিলে সুমনার ওখানে?

হ্যাঁ।

চিনে যেতে পারলে?

তা পারলাম।

বেরুলে ওকে নিয়ে?

হ্যাঁ।

কোথায় কোথায় ঘুরলে?

ত্রিভোলি পার্ক। ভদ্রলোকের নাম শ্রীবীরেশ্বর বোস। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ইন্ডিয়া হাউসের এক পরিচিত ভদ্রলোকের যে চিঠিখানা এনেছিলাম, সেটি ওঁরই নামের।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকালেন মুখার্জি। মেয়ে বললে, এ চিঠির কথা তো আপনাকে বলেছিলাম বাবা।

হ্যাঁ, তা বলেছিলে। দেখা হল?

না। তিনি বাইরে গেছেন। ওঁর ছেলে এসে আলাপ করলেন। বললেন, আমাদের বাড়িতে এসে আপনি থাকতে পারেন। আমি বললাম, থাকার ব্যাপার নিয়ে কিছু ভাববেন না। থাকার জায়গা আমি পেয়ে গেছি। একজনের চিঠি নিয়ে এসেছি, তাই কর্তব্য হিসাবে দেখা করে গেলাম। ভদ্রলোক শুনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর?

আমরা চলে এলাম বাবা। ভদ্রলোক ঠিকানা চেয়ে রাখলেন কিন্তু।

কেন?

ওঁর বাবাকে বলবেন আর কী, আমার কথা।

তারও পরদিন।

সোমা, এই নাও ব্যাঙ্কের ফর্ম। সই করে দিয়ো। কাল তোমার অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে তুমিও যাবে।

কত কথাই তো হয়, কিন্তু যার নাম আশ্চর্যজনকভাবে কথাপ্রসঙ্গে এসে পড়ে না, সে হচ্ছে সুজাতা। প্রতিদিন ঘুমোবার আগে তার কথা মনে পড়ে, হয়ত মেয়েও বলতে চায় মায়ের কথা, কিন্তু দুজনেই দুজনের কাছ থেকে বুঝি লুকিয়ে রাখতে চায় তাকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ। কোথায় যে সব ভেসে গেল। গ্লাসগোর শহরতলির সেই ঘরখানা। সুজাতার ঘরখানা। ওঁর দেখাদেখি ম্যাগিও বোধ হয় ওকে একদিন ডাকতে আরম্ভ করল—সু-জা-টা!

ওঁরা দুজনে কত হাসাহাসি করেছেন সেদিন ম্যাগির ওই নাম ধরে ডাকার ধরন লক্ষ্য করে।

সেই নিভৃত ক্ষুদ্র ঘরখানিতে বসে একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন দুজনে, ভারতের আত্ম-সাধনাকে প্রতিফলিত করবেন জীবনে। কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষার সোনালি দিনগুলি!

পরদিন ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের কাজ সব শেষ করে ফেলা গেল। মনের মধ্যে যেন গুঞ্জন করে উঠল, ছুটি—ছুটি—ছুটি! মানসিক পরিশ্রমের মাঝখানে যেন এসে হঠাৎ লাগল একটুখানি ছুটির হাওয়া, খুশির হাওয়া।

সোমা!

কী বাবা?

চিঠি লিখেছ তোমার মাকে?

হ্যাঁ বাবা। রামস্বামীর হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছি।

মুখ তুলে তাকালেন ওর দিকে। তারপর বললেন, ভাল করেছ। কিন্তু, আমি তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করি নি।

মেয়েও বোধ হয় বুঝতে পারল কথাটা। মুখ নিচু করে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিমায় বলে উঠল, লিখেছি বাবা, কিন্তু আজও উত্তর আসে নি।

ধীর, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলেন মুখার্জি, আসবে। ব্যস্ত হোয়ো না।

না।

আর-কোনও কথা হল না সুজাতাকে নিয়ে।

পরদিন।

কি-একটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরলেন বিকেলের দিকে। ড্রয়িংরুমে বসে ছিল কে এক ভদ্রলোক। বয়সে তরুণ। সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। পরনে পরিচ্ছন্ন স্যুট। তাঁকে দেখে অভিবাদন জানিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, আমি অভিজিৎ বোস। আমার বাবার নাম বীরেশ্বর বোস।

ওর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে বলে উঠলেন মুখার্জি, ঠিক চিনলাম না তো!

অভিজিৎ বললে, মিস মুখার্জি চিনবেন। লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউসে মিস্টার সিদ্ধান্ত আছেন, আমার বাবার খুব বন্ধু। তাঁরই চিঠি নিয়ে—

ও, এইবার বুঝেছি। মুখার্জি বললেন, আপনাদের বাড়ি গিয়েছিল সোমা। তা ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সঙ্গেও দেখাটা হয়ে গেল। বড় খুশি হলাম পরিচিত হয়ে।

আমিও কম খুশি নই। এমনি আসবেন মাঝে মাঝে।

আসব।

আচ্ছা, আজ তা হলে—

ছেলেটি তাড়াতাড়ি করজোড়ে বলল, নমস্কার।

তারপর চলে গেল। ওপরে সোমা অপেক্ষা করেই ছিল ওঁর জন্যে। মুখার্জি বললেন, ছেলেটিকে চা-টা খাইয়েছিলে তো সোমা?

হ্যাঁ বাবা।

আর একটুক্ষণ গল্প করলে না কেন? চুপচাপ একা বসেছিল। মুখ নিচু করল সোমা। কোনও উত্তর দিল না।

খাওয়াদাওয়ার পর।

হ্যাঁ মা, ইন্ডিয়া হাউসের মিস্টার সিদ্ধান্ত কে?

উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বড় ভাল লোক। ঠিক আপনার মত। আমাকে কত শিখিয়েছেন। গীতা-উপনিষদের কথা কত শুনেছি ওঁর মুখে।

গীতা-উপনিষদ! জানো তুমি?

লজ্জিত হয়ে মেয়ে বললে, আমি কিছু জানি না বাবা। তবে মা খুব পড়েছেন।

মুখার্জি প্রায় আপনমনেই বলে উঠলেন, মিস্টার সিদ্ধান্ত—নামটা যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে। পুরো নামটা কী বলো তো?

সোমা উৎসাহিত হয়েই বললে, শ্রীরাজকুমার সিদ্ধান্ত। খুব পণ্ডিত। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন লন্ডনের দু-একটি পত্রিকায়।

তাই হবে। মুখার্জি বললেন, ওঁর প্রবন্ধই হয়ত পড়েছি। ভদ্রলোকটিকে চিনি না, তবে নামটির সঙ্গে পরিচয় আছে বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে খুব স্নেহ করেন তো?

সোমা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, খুব স্নেহ করেন বাবা। কত কী জানতে চেয়েছি, কখনও বিরক্ত হন নি, চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

চুপ করে রইলেন মুখার্জি, তারপর একসময় হঠাৎই প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা, তোমার মাও কি তোমার মতন শাড়ি পরেন?

বাড়িতে মাঝে মাঝে পরেন।

লন্ডনে তো বাড়ি বলেছিলে, না?

হ্যাঁ।

একাই থাকেন?

না। অনেক ছেলেপিলে। কিন্ডারগার্টেন স্কুল করেছেন যে মা!

তোমার ভাইবোনেরা সব কোথায় থাকেন?

ভাইবোন!

কথাটা হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে মুখার্জির। ঠিক এভাবে এসব কথা ওর কাছে তোলার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না তাঁর। কিন্তু আর তো থেমে থাকার উপায় নেই, সে আরও বিশ্রী দেখাবে। বললেন, বলছি, তোমার সৎভাইবোনদের কথা।

সৎভাইবোন!

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে বুঝতে সোমার মুখখানা প্রথমে লাল, তারপরে একেবারে সাদা হয়ে গেল। রাত্রের আলো-অন্ধকারে বাইরে থেকে ততটা বোঝা গেল না। কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সোমা, ঘর ছাড়বার আগে একটি কথাই শুধু অস্ফুট কণ্ঠে সে বলে গেল, আমার মা আজও মিসেস মুখার্জিই আছেন।

আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন মুখার্জি। মনে মনে কেমন যেন একবার বিশ্বাস হয়েছিল, সুজাতা বিয়ে করেছে। হয়ত রাজকুমার সিদ্ধান্তকেই। কিন্তু এ কী শুনলেন তিনি! এ কী হল! মনে হল মুহূর্তে ঘরের সমস্ত আলো গেল নিভে। তাঁর দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে যেন কারা অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে নিয়ে চলেছে!

অন্ধকার—আরও অন্ধকার!

অপারিসীম আতঙ্কে আর্ত চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল, কেউ এসে তখুনি তাঁর হাত ধরুক। তাঁকে বাঁচাক।

॥ ৪ ॥

ধীরে ধীরে একসময় চোখ খুললেন মুখার্জি। দেখলেন, শুয়ে আছেন তাঁর বিছানায় দু পাশে বাবুর্চি বেয়ারা আয়া। বাবুর্চি মুসলমান নয়, উৎকলবাসী হিন্দু, কিন্তু সাহেব-ঘেঁষ বহু বাড়িতে কাজ করেছে, সাহেবী-খানা প্রস্তুতে সিদ্ধহস্ত, তাই বলতে হয় বাবুর্চি। কি ওর মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল, ছেলেবেলায় ওঁর মা যেমন তাঁদের রান্না লোকটিকে ডাকতেন, তেমনি ঠাকুর বলে ডাকলে কেমন হয়? 'ঠাকুর, লুচি ভাজো দো খানকয়েক, খোকন খাবে।' ঠিক মায়ের গলা বহু যুগ পরে যেন শু- তে পেলেন কানে কাছে। মায়ের তিনি ছিলেন ছোট ছেলে, খোকন ছিল তাঁর নাম।

কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলেন সারা শরীরে, মাথার একটা পাশ যেন ব্যথা একেবারে অবশ হয়ে আছে মনে হল। কে বসে তাঁর শিয়রের কাছে? অমন করে মুখখা মুখের কাছে এনে কে তাকে ডাকছে, বাবা?

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে যেন চিনতে পারলেন সোমাকে। সোমাই তাকে আগ্রহের সঙ্গে ডাকছে, বাবা!

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলেন মুখার্জি, কী হয়েছিল আমার?

অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

কেন?

তৎক্ষণাৎই কোনও উত্তর এল না। নিজের প্রশ্ন নিজেরই কানে কেমন যেন বেসুরে শোনাল, অল্প একটু হেসে বললেন, ও কিছু নয়। বোধ হয়, আজ একটু বেশি খাটুনি গেছে সেইজন্যই—

সোমা বললে, কাল একবার আপনি ডাক্তার দেখান বাবা। প্রেসারটা একবার দেখ দরকার।

প্রেসার!

ম্লান একটু হাসলেন। সোমার কথায় মনে মনে একটু অবাকও হলেন। তাঁর ব্লাডপ্রেসার আছে, বুদ্ধিমতী মেয়ে সেটারও খোঁজ রেখেছে। কার কাছ থেকে? নীলিমা সঙ্গে কতটুকু কথা আর হয়েছিল ওর? রামস্বামীর কাছ থেকে জেনে থাকবে তবে রামস্বামী তাঁর সব জানত। দেশে তার স্ত্রীপুত্র, নইলে ওঁদের সঙ্গে কলকাতায় চিরতরে চলে আসতে সে দ্বিধা করত না।

ধীরে ধীরে বিছানার ওপরে একসময় উঠে বসলেন মুখার্জি। বেয়ারারা ঘর ছেড়ে চলে গেল। সিনা-নিয়োজিত লোকজন, আদবকায়দায় ওদের ত্রুটি হবে না।

মাকে টেলিগ্রাম করব বাবা?

চমকে উঠলেন মুখার্জি, কাকে? সুজাতাকে?

একেবারে অতর্কিত প্রশ্ন বলা যায়। মেয়ে মুখ নিচু করল, তারপরে প্রায় অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললে, তিনি আসবেন না। আমি বলছিলাম এখানকার মায়ের কথা।

উত্তর দিলেন না মুখার্জি। সোমাও বলল না কোনও কথা। দুজনে চুপচাপ বসে রই কাছাকাছি মুখ নিচু করে, যেন কিছু আর বলার নেই, কিছু আর শোনার নেই।

কিন্তু চিঠি বা টেলিগ্রাম কিছুই করতে হল না, পরদিন হঠাৎই নীলিমা এসে উপস্থিত, সঙ্গে রামস্বামী। বেলা মধ্যাহ্নের কাছাকাছি। এ-ঘর সে-ঘর একবার ঘুরে এসে ওঁর কাছের চেয়ারটায় বসল নীলিমা। বলল, ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, গিয়ে অথৈ জলে পড়ব। নতুন বাড়ি, জিনিসপত্রও আছে কি নেই—সব গোছগাছ করে তুলতে একটা সপ্তাহই বুঝি কাটবে। কিন্তু এসে দেখছি, সংসারটি তো বেশ গুছিয়ে নিয়েছ তোমরা!

প্রশংসা করছ তো?

নীলিমার মুখে বিচিত্র হাসি। বলল, নিশ্চয়ই। বাপ মেয়ে—দুজনেরই প্রশংসা করছি। ফার্নিচারগুলো ভালই কেনা হয়েছে। কার টেস্ট কাজ করেছে বেশি? বাপ, না মেয়ের?

মুখার্জি একটু হেসে বললেন, সিনার। সব তারই কেনা। বন্ধুপ্রীতি কাকে বলে, একবার চোখ মেলে দেখ।

সত্যিই অবাক হল নীলিমা। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে বলল, এ ফ্রেন্ড ইনডিড! মিস্টার সিনা না উঠে-পড়ে লাগলে তোমার জায়গা-জমি বাড়ি-ঘর কিছুই হত না!

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল নীলিমা, বলল যাই, একবার দেখা করে আসি।

তা বলে এখুনি? বোসো। জিরিয়ে নাও।

আমি কি দূরে কোথাও যাচ্ছি নাকি? এই তো পাশের বাড়ি বলতে গেলে। আর তা ছাড়া, আমি মোটেই টায়ার্ড ফিল করছি না।

বেশ তো, না হয় একটু পরেই যেয়ো'খন।

না, এখুনি যাই। নীলিমা উৎসাহে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছে : থ্যাঙ্কস দিয়ে আসব। মালবিকা কেমন আছে?

মালবিকা সিনার স্ত্রীর নাম। মুখার্জি বললেন, ভালই আছেন। অনলও ভাল আছে।

অনল!

একটু হাসলেন মুখার্জি, বললেন, সিনাকে 'সিনা' 'সিনা' করে ডাকতে ডাকতে ওর আসল নামটা আমরা ভুলে যাই। ওর আসল নাম, অনলকুমার। স্কুলে সংস্কৃতের মাস্টারমশাই ওকে ঠাট্টা করে ডাকতেন—

বাধা দিয়ে নীলিমা বলে উঠল, থাক ওসব ঠাট্টার কথা। আমি চললাম। যাব আর আসব।

ত্বরিতপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল নীলিমা। ওর অপসৃয়মাণ মূর্তিটির দিকে তাকাতে তাকাতে একটু অবাকই হচ্ছিলেন মুখার্জি মনে মনে। অনল সিংহ তাঁর বাল্যবন্ধু, কিন্তু নীলিমার কোনও দিনই কোন আগ্রহ ছিল না ওদের প্রতি। ওরা যে জমির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, বাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, এসব ব্যাপারে মানুষের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত, কিন্তু নীলিমা যেন কেন তেমন সন্তুষ্ট ছিল না ওদের ওপরে! ওর ভাব দেখে মনে হত সিনা যেন ওর অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ করছে। প্রত্যক্ষে কোন বাধা অবশ্য দেয় নি নীলিমা, দিলে এই বাড়ি-ঘরদোর হত না, কিন্তু পরোক্ষে একটা অসন্তোষের বহ্নি কোথায় যেন ধিকিধিকি জ্বলছিল। নীলিমার মা বা ভাই, ওদের কারুর হাতে এসব ভার দিলে নীলিমা হয়ত খুশি হত, কিন্তু তাঁরা তো দিল্লির লোক, কলকাতায় এসে এসব কাজ করে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল কি? ছিল না। তা ছাড়া এ জমি কি সিনা তাকে নতুন বন্দোবস্ত করে দিয়েছে? বহু আগে। যখন এদিককার জমির দর

ছিল রীতিমত সস্তা। নিজের জন্য কিনতে গিয়ে বন্ধুর কথাও ভোলে নি অনল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি, চলে এসো।

সেই অনলদের প্রতি নীলিমার হঠাৎ-জাগা এই উচ্ছ্বসিত প্রীতি লক্ষ্য করে মনটা সত্যিই আনন্দে ভরে গেল। ওরা তো অবাক হয়ে যাবে নীলিমাকে হঠাৎ ও-ভাবে দেখে! মালবিকা দেবীর চোখে-মুখে যে অভাবিত বিস্ময় ফুটে উঠবে তা যেন এখান থেকেই নিরীক্ষণ করতে পারছেন তিনি। আর অনল? ভাবতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির একটা রেখাই ফুটে ওঠে।

পায়ে পায়ে ততক্ষণে সোমা এসে দাঁড়িয়েছে ওঁর কাছে, তার অভ্যস্ত মৃদুকণ্ঠে সে ডাকল, বাবা!

একটু যেন চমকেই উঠলেন মুখার্জি, বললেন, কী?

সামান্য ইতস্তত করে তারপরে বলে উঠল সোমা, মা হঠাৎ আবার কোথায় গেলেন?

হো-হো করে এবারে হেসেই উঠলেন মুখার্জি, বললেন, খুশি হয়ে সিনাকে ধন্যবাদ জানাতে গেছে। ওরা যা অবাক হবে না! ডিয়ার ওল্ড বয়! ওর নাম অনলকুমার। স্কুলে এক মাস্টারমশাই ঠাট্টা করে ডাকতেন অগ্নিমিত্র বলে। আমরাও বহুদিন অগ্নিমিত্র বলে ডাকতাম। শেষ পর্যন্ত বিধাতাও ঠাট্টা করলেন। ওর স্ত্রীর নাম মালবিকা। হয়ে দাঁড়াল মালবিকাগ্নিমিত্র।

অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সোমা। এমন উচ্ছ্বসিতভাবে কথা বলতে ওঁকে এর আগে কখনও দেখে নি সে।

কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সামলে নিলেন মুখার্জি, মনে হল, এসব কথা সোমার সামনে উত্থাপিত না করলেই ভাল ছিল। একটু থেমে অস্বস্তিকর মানসিকতাটাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যই স্বাভাবিক স্বরে বলে উঠলেন মুখার্জি, বুঝলে না তো? মালবিকাগ্নিমিত্র মহাকবি কালিদাসের একটি নাটকের নাম। তারই উপমা দিচ্ছিলাম। শুনেছ কখনও কালিদাসের নাম?

মাথা হেলিয়ে উত্তর দিল সোমা।

শুনেছ! মুখার্জি সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, বাঃ!

মুখ নত করল সোমা, তারপর টিপয়ের ওপর হাত রেখে, ঢাকা কাপড়টার কোণে যে ফুল আঁকা আছে, সেই ফুলে হাত বুলোতে লাগল। মুখার্জিও স্তব্ধ হয়ে গেছেন। চেয়ারে মাথা হেলিয়ে অন্যমনস্কচিত্তে কী যেন ভাবতে চেষ্টা করছেন তিনি, হয়ত ওঁর বাল্যবন্ধুকে জড়িয়ে অতীত দিনের কোন সুখকর স্মৃতি।

ধীর পায়ে নিজের ঘরে ফিরে এল সোমা। কালিদাস! কালিদাসের নাম সে শুনেছে। লন্ডনে ইন্ডিয়া-হাউসে ছেলে-মেয়েরা একবার 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' অভিনয় করেছিল। মিস্টার সিদ্ধান্তই ছিলেন সব-কিছুর মূলে। মা-ও এসেছিলেন। মায়ের পাশে বসে 'শকুন্তলা' দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সোমা। তারপরে, বাড়ি ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে 'শকুন্তলা'র আলোচনা করেছিল, মনে পড়ে। 'শকুন্তলা'র সঙ্গে মায়ের স্মৃতি এমনভাবে জড়িয়ে আছে! মায়ের কথা মনে পড়তে আজ কেন যেন হঠাৎ চোখের পাতা দুটি ভিজে উঠল, বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হল আর নয় এখুনি সে ছুটে যাবে তার মায়ের কাছে। তার অভাগিনী মা—তাঁর সর্বংসহা মা।

একটুক্ষণ নয়, বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল নীলিমা, বলল, মিষ্টি খেয়ে এলাম। না খাইয়ে ছাড়ল না। জানো, বেশ বাড়ি! ওঁদের সত্যিই টেস্ট আছে। মালবিকা জিজ্ঞাসা করল, সোমার খবর কী? কেমন আছে? বললাম, পাশের বাড়ি থেকে তোমরা তা জানো না? বললে, বড্ড লাজুক। মিশতে চায় না। তা হ্যাঁ গো, কোথায় সে? সেই একবার এসে প্রণাম করে কোথায় লুকোল?

ঘরেই আছে। ডাকো না?

না থাক। নীলিমা বললে, বেলা যথেষ্ট হয়ে গেছে। স্নান সেরে খেয়ে নেওয়া যাক। তোমার স্নান হয়েছে?

কখন!

বেশ। খেয়ে দেয়ে এক ঘুম দিয়ে একটু বেরুবে নাকি?

মুখার্জি বললেন, আমাকে তো বেরতে হবেই। টুকিটাকি অনেক কাজ আছে। একবার ব্যাঙ্কে যাব–

নীলিমা বলল, ভাল কথা। তোমার গাড়িটা বুক করা হয়ে গেছে, দিনকয়েকের মধ্যেই এসে পৌঁছবে। ইনভয়েস সঙ্গে এনেছি।

ভাল। গৌতম কী করল?

ও হস্টেলে আছে।

আর কোন কথা হল না। চেয়ার ছেড়ে যে যার উঠে পড়লেন।

মুখার্জির সারা দিনমান কেটে গেল সত্যিই নানান কাজে। একবার মেজদার বাড়িতে যাব যাব করেও যেতে পারলেন না। শ্রান্ত বোধ করে ফিরে এলেন সন্ধ্যার পরেই। কিছুক্ষণ পরে শোবার ঘরে এসে যখন ঢুকলেন, দেখা গেল, তাঁর খাটের পাশে পড়েছে আর-একটা খাট।

ঘরে চায়ের তদারক করতে আর কেউ ছিল না, নীলিমা ছাড়া। সাংসারিক এ-কথা সে-কথার পর অবশেষে সরাসরি কাজের কথায় এল সে : মা আসছেন, জানো?

চকিতে ওঁর মুখের দিকে তাকালেন মুখার্জি, তারপরে মুখ নামিয়ে বললেন, কবে?

দু-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন।

মা মানে—নীলিমার মা, মিসেস বাটাসারিয়া, যিনি তাঁর ছেলেদুটির কাছে দিল্লিতে থাকেন।

চায়ের কাপে পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন মুখার্জি, তা হঠাৎ অতদূর থেকে কলকাতা আসছেন যে?

বাঃ রে, মেয়ে-জামাইয়ের নতুন বাড়ি দেখতে আসবেন না! আমিই চিঠি দিয়েছিলাম।

তা ভালই তো।

নীলিমা ওঁর সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে ওঁর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত স্থাপন করে ঈষৎ চাপাকণ্ঠে বলে উঠল, জানো, কী হয়েছে?

কী?

নীলিমা বলল, সারা ভাইজাগে একটা স্ক্যান্ড্যালই ছড়িয়ে গেছে।

স্ক্যান্ড্যাল!

তা ছাড়া আর কী। নীলিমা বলল, মিসেস ওয়াটকিন্স থেকে শুরু করে সবাই জিজ্ঞাসা করছে, ওই মেয়েটি কে? কম লোক তো আর তোমাকে সি-অফ করতে স্টেশনে আসে নি! সবাই দেখেছে তোমাকে রিজার্ভড কামরায় উঠতে একটি অচেনা মেয়েকে নিয়ে। সেই জন্যে মুখ ফুটে আমাকেই বলতে হল ওর সব কথা। কী লজ্জা!

উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, তারপরে খোলা জানলাটার দিকে ধীর পায়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন, কেন! লজ্জা কেন?

লজ্জা নয়! নীলিমাও উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, ওঁর কাছে আসতে আসতে বলতে লাগল, ওরা জিজ্ঞাসা করল বেঁচে আছেন কি তিনি, সেই লেডিটি? বললাম, আছে নিশ্চয়ই। নইলে চিঠি পাঠায় কী করে মেয়ের হাত দিয়ে! সবাই অবাক হয়ে গালে হাত দিল, বললে, এক স্ত্রী থাকতে আর-একবার বিয়ে করলেন কী করে মিস্টার মুখার্জি!

মুখার্জি জানলা ছেড়ে তাঁর খাটের দিকে সরে আসতে আসতে প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন, তারপর?

তারপর শুরু হল জল্পনা-কল্পনা। নীলিমা বলল, যেখানেই যাই, এই আলোচনা। শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। কেউ বলে, সেই বউকে এবার ফিরিয়ে আনবেন মিস্টার মুখার্জি। আর কেউ বলে, সে মেমসাহেবটি কি এতদিন চুপ করে বসে আছেন? অন্য বিয়ে করেছেন এতদিনে, ছেলেপিলেও হয়ে গেছে, তোমরা দেখে নিয়ো। আমি ভেবে দেখলাম, সেটাই সম্ভব। নইলে পঁচিশ বছর ধরে কি কেউ—

ততক্ষণে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে কথাগুলি শুনেই যাচ্ছিলেন মুখার্জি, হঠাৎ কী ভেবে এইখানে বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, না।

একটু থেমে, একটু অবাক হয়েই মিসেস বলল, কী, না?

উত্তর দিলেন মুখার্জি, দ্বিধাহীন অকম্পিত কণ্ঠে, সে বিয়ে করে নি। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আজও পর্যন্ত সে মিসেস মুখার্জিই আছে।

মিসেস মুখার্জি!

হ্যাঁ।

ঠোঁট টিপে ঈষৎ চাপাকণ্ঠে প্রশ্ন করল নীলিমা, বিয়ে হয়েছিল তা হলে সত্যিই?

উত্তর কি পাও নি? আইনমত না হলেও, যেখানে আইন চলে না, সেই হৃদয়ের ধর্ম বলেও তো একটা কথা আছে।

আছে নাকি!

কিন্তু আর কোনও কথা বললেন না মুখার্জি, চোখ বুজে পড়ে রইলেন বিছানায়। নীলিমাও মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল, আর একটি কথাও উচ্চারিত হল না তার মুখ থেকে।

পরদিন কিন্তু ভিন্নরূপ। নীলিমা যা কোনও দিন করে না, তাই করে বসল। সোমা বোধহয় কী করতে এসেছিল ঘরে, তার সামনেই বলে উঠল মুখার্জিকে, আর কী, এবার বিলেত থেকে চিঠি লিখে আনিয়ে নাও তোমার সুজাতাকে, আমি বিদেয় হই।

সোমা বোধহয় ঈষৎ চমকেই উঠেছিল, তারপরে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আশ্চর্য ঘটনা, আজ পঁচিশ বছর যার কথা কেউ জানত না সংসারে, তার কথা প্রতিটি দিন উচ্চারিত হতে লাগল এই বাড়িতে, কোন-কোনদিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন

মুখার্জি, চারিদিক থেকে বেয়ারা আয়া সব ছুটে আসত। সে এক নাটকীয় দৃশ্যেরই অবতারণা ঘটত বটে! মুখার্জি চিৎকার করে বলছেন, তার নাম কখনও নেবে না তুমি।

একশোবার নেব। সাপিনীর মত ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ স্বরে নীলিমা বলত, নেকী! সে আমার সব শান্তি হরণ করছে। আমি তাকে অভিসম্পাত করব, রোজ রোজ, প্রতিদিন—খোঁজ নাও চারদিকে, যারা জেনেছে, তারাই ছি-ছি করছে।

শুরু হল এই কলহের তীব্রতা। প্রায় প্রতিদিন। সোমা যে ঠিক ওই সময় কোথায় লুকিয়ে পড়ত তার সন্ধান কেউ রাখত না। যে রাখত, সে অন্য লোক, একেবারে অন্য জাতের অন্য জগতের লোক।

পুবের জানলা দিয়ে ভোরের প্রথম সূর্যকে প্রণাম জানাতে শিখিয়েছিলেন তার মা। বলতেন, হিন্দুদের কাছে সূর্য পবিত্র দেবতা। প্রকৃতি যে মানুষের দেহ আর মন দুই-ই সঞ্জীবিত করে তোলে, এটা হিন্দুদর্শন যতটা বুঝেছে, আর-কেউ তা বোঝে নি। সূর্য তোমার দেহও ভাল রাখবে, মনও ভাল রাখবে।

মনেপ্রাণে হিন্দু হতে চেষ্টা করেছে সোমা। তার মায়ের একান্ত তপস্যাতেই ওটা সম্ভব হয়েছে। বিলেতে ইন্ডিয়া-হাউসে যাদের যাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে সোমা, তারা বাংলা কথা বলে বটে, কিন্তু আচারে-ব্যবহারে তারা বিলেতকে অনুসরণ করতে চায়।

ভাল লাগত না। এক, মিস্টার সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি কাজের মানুষ। তাঁর সঙ্গ কতটা পাওয়া সম্ভব সোমার পক্ষে? এখানে বাবার আচার-বিচারেও সাহেবিয়ানা, খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে পর্যন্ত তাই। কিন্তু তবু মনে হয়, বাবার মধ্যেকার লোকটি প্রাচীন ভারতের সেই তপোবনের কোনও ঋষি, অরণ্যে না থেকে সংসারে বাস করছেন ছদ্মবেশ ধারণ করে। কিন্তু মা আসার পর থেকে বাবাকে কাছে পাওয়া দুষ্কর হয়েছে। দূর থেকে বাবার কণ্ঠস্বর কানে আসে, আর যেন সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই বিছানা ছেড়ে এসে জানলায় দাঁড়ায় সোমা। পুবের আকাশে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যদেবের উদয়ের প্রতীক্ষা করে। উঁচু উঁচু বাড়ি নেই পুবদিকে, অনেকটা দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়।

এক একদিন হঠাৎই চোখ পড়ে নিচের দিকে। তাদের বাড়ির প্রায় গা ঘেঁষে একটা একতলা ছোট্ট বাড়ি। সবটাই দেখা যায় উঠোনের, অনেক লোক। ছেলে মেয়ে। হৈ-চৈ। একটা জানলা দিয়ে একটা টেবিল নজরে পড়ল একদিন। অনেক বই টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো। কী কী বই কে জানে! একটি লোককেও দেখা যায়, সেই টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বই টেনে নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ছে, কখনও বা কী সব লিখছে। বাড়ির মধ্যে এত হট্টগোল, লোকটির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, একমনে নিজের কাজ করে চলেছে! বেশ লাগল কিন্তু অধ্যয়নের এই রূপ দেখে। সূর্যপ্রণামের পর লোকটির দিকে অলস দৃষ্টি ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখা এ যেন তার নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কদিন ধরে।

কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে একদিন যে তার হঠাৎই আলাপ হয়ে যাবে, এটা সে ভাবতে পারে নি।

বিকেলের দিকে বাবা যখন বাড়ি থাকেন না, মাও ভাইজাগ-থেকে-আসা তাদের